জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১৫
বর্ষ ৫১ □ সংখ্যা ৭-৮
প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক : দীপংকর চক্রবর্তী

লেখা, চিঠিপত্র ও টাকা-পয়সা পাঠাবার ঠিকানা :
প্রযত্নে : পিপলস বুক সোসাইটি
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯
দূরভাষ : ৯৪৩৩৭২৪৪৬২/৮৯০২১০৪৯৮৭
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : ১৫০ টাকা
ই-মেল : aneek.bm@gmail.com
ব্লগ : aneekpotrika.wordpress.com

কার্যালয় :
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯
(মঙ্গল ও শুক্র : সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা)
সম্পাদকমণ্ডলী : **রতন খাসনবিশ**
সুমিতা সিদ্ধার্থ শুভাশিস প্রণব

সম্পাদকীয়

ধনতন্ত্র : ফিরে দেখা ❑ ৩
ভারত বিক্রি আছে ❑ ৪

ঘটনাপ্রবাহ

মহাভারত নীতিকথা নয় ❑ সুমন্ত ব্যানার্জী ❑ ৫
মানবাধিকার : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাল-হকিকত ❑ সুদীপ্ত সেন ❑ ৭

কবিতা

সময় ❑ রাণা চট্টোপাধ্যায় ❑ ১২
দাহনপর্ব ❑ বিশ্বনাথ গড়াই ❑ ১২
বিচ্ছিন্নতা ❑ কোয়েল সাহা ❑ ১২
প্রতিস্পর্ধী ❑ অজয় সেন ❑ ১২

প্রবন্ধ

উনিশ শতকের একটি বিস্মৃতপ্রায় ছাত্র আন্দোলন ❑ অশোক চট্টোপাধ্যায় ❑ ১৩
গুরু একজন নয়, গণসমষ্টি : হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও গানের বাহিরানা ❑ আনু মুহাম্মদ ❑ ১৭

ধনতন্ত্র : ফিরে দেখা

একুশ শতকের পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র ❑ রতন খাসনবিশ ❑ ২৩
ধনতন্ত্র, হেজিমনি ও নৈতিকতা : গ্রামশি ও আলথুসার ❑ শোভনলাল দত্তগুপ্ত ❑ ৩১
বিস্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়ন সম্পর্কিত একটি আলোচনা ❑ অমিত ভাদুড়ি ❑ ৩৫
মার্কসবাদ ও দারিদ্র্যের রাজনীতি : দু-একটা জরুরি কথা ❑ রাজেশ ভট্টাচার্য ❑ ৩৯
ক্যাপিটাল-এর ভিন্ন পাঠ ❑ প্রণব কান্তি বসু ❑ ৪৯
ধনতন্ত্রে অসাম্য : থমাস পিকেটির মার্ক্সীয় পাঠ ❑ মানস ❑ ৫৯
ধনতন্ত্র ও আদি সঞ্চয় ❑ মিতা দত্ত ❑ ৬১
ধনতন্ত্র ও পরিবেশ ❑ অরিজিৎ ❑ ৬৭
যুদ্ধ, ধনতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ এবং আজকের পৃথিবী ❑ সমরেশ মিত্র ❑ ৭১

নকশালবাড়ি

নকশালবাড়ি এখন যেমন ❑ পার্থ সারথি ❑ ৭৭
বজ্র-নির্ঘোষ— সেনাপতি ও পদাতিকের দৃষ্টিতে ❑ সহদেব মন্ডল ❑ ৮১

সম্পাদকীয়

ধনতন্ত্র : ফিরে দেখা

সত্তরের দশকে সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ও প্রয়োগের চাপে, বিক্ষোভ-বিদ্রোহ-বিপ্লবের চাপে ন্যুব্জ ধনতন্ত্র বাধ্য হয়েছিল মেহনতি মানুষকে কিছুটা 'কনসেশন' দিতে। প্রবলপ্রতাপশালী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামে পরাজয় স্বীকার করে ফিরে গেছে। দিকে দিকে বিভিন্ন ঘরানার বামপন্থী আন্দোলনের ঢেউ। এমতাবস্থায় ধনতন্ত্র তার কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের মুখোশটি ভালভাবে মুখে এঁটে নিতে বাধ্য হয়েছিল। এমন একটা বিভ্রান্তি ছড়াতে সক্ষম হয়েছিল যেন এই 'কল্যাণমূলক রাষ্ট্র' একটা স্থায়ী ব্যাপার। ওদিকে আফগানিস্থানে তখন যে বিদেশি বাহিনী দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তারা 'সমাজতান্ত্রিক' রাশিয়া-র সেনা। বামপন্থী মহলের অ্যাক্টিভিস্ট থেকে শুরু করে অ্যাকাডেমিকরা বেশি চিন্তিত 'সমাজতন্ত্রের সমস্যা' নিয়ে।

আশির দশক থেকেই কিন্তু মুখোশ ভেদ করে ধনতন্ত্রের আসল রূপটি দেখা গিতে লাগল। পুঁজিবাদী সংকটের মোকাবিলায় যুক্তরাজ্যে থ্যাচার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রেগান-এর নেতৃত্বে রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক কর্মসূচির ওপর আক্রমণ নামানো হলো। সাধারণ মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান খাতে খরচ কমানো-র মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের ব্যয় কমানো ও দায় অস্বীকার করা, রাষ্ট্রের সম্পত্তি বেচে পয়সার সংস্থান করাই শুধু নয়, নামানো হলো বৌদ্ধিক আক্রমণ, মতাদর্শগত আক্রমণও।

সেই আক্রমণ দারুণ সাফল্য পেল বিংশ শতকের শেষ দশকের শেষাশেষি। বার্লিন প্রাচীরের পতন থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন। বৌদ্ধিক জগতের আক্রমণ এবার বিজয়- উল্লাসে পরিণত। ধনতন্ত্র ছাড়া কোনও পথ নেই। সমাজতন্ত্র বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ব্যর্থ। গরিবরা গরিব তাদের ব্যর্থতার জন্য, তাদের জন্য 'ফ্রি মিল'-এর ব্যবস্থা করার কোনও দায় নেই রাষ্ট্রের।

এইসব বাক্যবন্ধ শুধু সাধারণ মানুষের মনে নয়, আক্রমণ হানে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের মধ্যেও। ধনতন্ত্র যে খুব ভালো ব্যবস্থা তা নয়, তবে সেটি দক্ষ, সমাজতন্ত্র অদক্ষ এবং হয়ত অসম্ভব একটি প্রচেষ্টা। ধনতন্ত্রের বিজয়যাত্রা প্রতিহত করার জন্য যে মতাদর্শগত জোর লাগে সেটাই হারিয়ে ফেলল সমাজতান্ত্রিক শিবির।

এবার একচ্ছত্র ধনতন্ত্রের রাজত্ব। এবার আর মুখোশ নয়, মুখ। সে মুখ দেখে মানুষ আঁতকে উঠতে লাগল। একের পর এক যুদ্ধ, আঘাত, লুণ্ঠন ও অন্যের ধন অপহরণের চেষ্টা। এর একটা রূপ দেখা গেল সোভিয়েত-উত্তর রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে। 'দক্ষ' ধনতন্ত্র অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দেশগুলিকে সর্বস্বান্ত করে, সেখানকার মানুষদের আক্ষরিক অর্থে সর্বহারা করতে সক্ষম হলো। আমাদের দেশের মতো 'উন্নয়নশীল' দেশে আবার আঘাত নামল অন্য ভাবে। কাঠামোগত সংস্কার, গ্যাট, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, নতুন পেটেন্ট আইন প্রণয়নের চাপ - বিশ্বায়নের চাপে এই জাতিরাষ্ট্রগুলি পিছু হটতে লাগল। মন্দা তবু ধনতন্ত্রের পিছু ছাড়ে না। 'উন্নয়ন'-এর জন্য জনগণের সম্পত্তি, সাধারণের সম্পত্তি দেশি বিদেশি লুঠেরা পুঁজিবাদীদের হাতে তুলে দেওয়া শুরু হলো। বিশেষ করে সংবাদমাধ্যম ও অন্য সব প্রচারমাধ্যমের মধ্য দিয়ে ধনতান্ত্রিক মতাদর্শ আরও জোরগলায় প্রচার শুরু করল।

এই পরিস্থিতিতে মানুষ কিন্তু চুপ করে বসে নেই। তারা বিদ্রোহ করছে। মার্কসবাদী বৌদ্ধিক ও সাংগঠনিক নেতৃত্বের অভাবে কখনো নেতৃত্ববিহীন স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন, কখনো বিভিন্ন সুবিধাবাদী শক্তির নেতৃত্বে, আবার কখনো কখনো বিভিন্ন ধারার বামপন্থী নেতৃত্বে।

এই পরিস্থিতিতে আমরা ধনতন্ত্রকে ফিরে দেখতে চাইলাম অনীক-এর বর্তমান সংখ্যায়। এতে পুঁজি, পুঁজিবাদী উৎপাদন ও বণ্টন, পুঁজিবাদী মতাদর্শ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে দুটি বর্গে। একটি বর্গ বর্ণনামূলক। সেখানে দেখানো হয়েছে কীভাবে জন্ম থেকেই লুণ্ঠন, হত্যা, বিস্থাপন ও যুদ্ধের রক্তে রাঙানো ছিল ধনতন্ত্রের পথ। পুঁজিবাদের প্রথম প্রহরের আদিম সঞ্চয়ন হয়েছিল কীভাবে, যুদ্ধ কীভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবশ্য প্রয়োজনীয় অংশ হিসাবে কাজ করেছে, কেমন করে শ্রমশক্তির পাশাপাশি প্রকৃতির রক্ত চুষে খায় এই দানব - এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন যথাক্রমে মিতা দত্ত, সমরেশ মিত্র এবং অরিজিৎ।

ধনতন্ত্রকে ফিরে দেখার আর একটা অংশ বিশ্লেষণমূলক। সেখানে ধনতন্ত্রে 'হেজিমনি' নিয়ে আলোচনা করেছেন শোভনলাল দত্তগুপ্ত। আলোচনাটি করা হয়েছি গ্রামশি ও আলথুসার নিয়ে। বিস্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়ন সম্পর্কিত তাত্ত্বিক আলোচনাটি অমিত ভাদুড়ি-র। আর একবিংশ শতকের ধনতন্ত্র নিয়ে রতন খাসনবিশের লেখাটি শুধু আজকের ধনতন্ত্রের স্বরূপই উদ্‌ঘাটন করেনি, আলোচনা করা হয়েছে সমাজতন্ত্রের সমস্যা নিয়েও।

টমাস পিকেটি-র *ক্যাপিটাল ইন দ্য টোয়েন্টি-ফার্স্ট সেঞ্চুরি* গ্রন্থটি এখন অ্যাকাডেমিক অর্থনীতির মহল ছেড়ে রাজনৈতিক মহলেও আলোড়ন তুলেছে। ধনতন্ত্রে অসাম্য সম্পর্কিত তথ্যবহুল এই বইটি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন মানস।

ধনতন্ত্র নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনার একটি বিশেষ দিক পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে তার 'বাহির'-এর সম্পর্ক। আদি(ম) সঞ্চয়ন কেন ধনতন্ত্রের শুধু আদিকালের বিষয় নয়, কেন ধনতন্ত্রকে তার 'বাহির' থেকে লুণ্ঠন চালিয়েই যেতে হয় এ নিয়ে বলতে গিয়ে রাজেশ ভট্টাচার্য একটি তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা-র বহির্স্থ মেহনতি জনগণের সঙ্গে ধনতন্ত্রের আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে, এবং সেখান থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি রাজনৈতিক বিতর্ক তুলেছেন।

আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন প্রণব কান্তি বসু। আশির দশকে 'লেনিনবাদীর ক্যাপিটাল পাঠ' বিষয়টিকে নিয়ে কয়েকজন চিন্তক একটি তাত্ত্বিক বিতর্ক করেছিলেন *অনীক*-এর পাতায়। সেই বিতর্কের একজন অংশীদার প্রণব কান্তি বসু *ক্যাপিটাল* পাঠ নিয়ে তাঁর বর্তমান চিন্তা ও বোধের কথা জানিয়েছেন তাঁর প্রবন্ধে। তাত্ত্বিক মার্কস ও অ্যাকটিভিস্ট মার্কস কীভাবে ক্যাপিটালে একই সঙ্গে তত্ত্বের সঙ্গে জীবনের অভিজ্ঞতাকে মিলিয়েছেন সেটি তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে। ক্যাপিটাল নিয়ে তাঁর এই লেখাটি গভীরভাবে রাজনৈতিক।

ধনতন্ত্রকে ফিরে দেখার এই প্রচেষ্টাটি আবশ্যিক ভাবেই খণ্ডিত। কিন্তু সর্বগ্রাসী এই ব্যবস্থাটিকে জানতে বুঝতে বিতর্ক তুলতে আমাদের এই প্রয়াস যদি কিছুমাত্র সাহায্য করে সেটিই আমাদের লক্ষ্য।

এছাড়া এই সংখ্যাটিতে রয়েছে অন্যান্য বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ এবং কবিতা। উনিশ শতকের ছাত্র-আন্দোলন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মানবাধিকার হত্যা ও হেমাঙ্গ বিশ্বাস-কে নিয়ে এই আলোচনাগুলি সংখ্যাটিকে ঋদ্ধ করেছে। নকশালবাড়ি নিয়ে দুটি লেখার একটি সেই আন্দোলনের দু-চারজন কর্মী-নেতাদের রাজনৈতিক জীবনী-আত্মজৈবনিক ও আন্দোলন সংক্রান্ত চারটি বাংলা-ইংরাজি গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা। অন্য লেখাটি আজকের নকশালবাড়ি নিয়ে।

লেখকদের আমরা ধন্যবাদ দেব না। পত্রিকায় কথা বলেন তো লেখকরাই। কিন্তু ধন্যবাদ দিতেই হবে ডি অ্যান্ড পি প্রেসের কর্মীদের। শেষ মুহূর্তে পৌঁছে দেওয়া লেখাগুলিকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার গুরুদায়িত্ব তাঁরা পালন করেছেন অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে। আর ধন্যবাদ আমাদের পাঠকদের। শুধু পত্রিকা পড়া, তা নিয়ে বিতর্ক তোলা বা পত্রিকা-র বার্তা সমাজের কাছে পৌঁছে দেওয়াই নয়, অর্ধ শতকের বেশি সময় ধরে অনীক তাঁদের সবরকম সহযোগিতা, আলোচনা-সমালোচনার ওপরই দাঁড়িয়ে আছে।

পত্রিকায় যেসব ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে গেল তার দায় অবশ্য আমাদেরই।

ভারত বিক্রি আছে

'আমেরিকা থেকে এলো টিয়ে, পকেট ভর্তি চুক্তি নিয়ে'। 'আলিবাবা' গল্পে সেই দস্যু সর্দারকে মনে আছে? আলিগৃহে তিনি এসেছিলেন অতিথি রূপে, কিন্তু দুরভিসন্ধি নিয়ে। অতিথির ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্য তাঁর ছিলনা। ২০১৫ সালে ভারতবর্ষে প্রজাতন্ত্র দিবসে নরেন্দ্র মোদী সরকারের তরফে যাঁকে প্রধান অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ জানানো হলো, ভারতবাসী তাঁকে দুদিনের সফরে কোম্পানী এক্সিকিউটিভের ভূমিকাতেই বেশি দেখলো। গল্পের সঙ্গে তফাৎ একটাই — গল্পে গৃহকর্তা দস্যুসর্দারের অভিসন্ধি জানতেন না, কিন্তু নরেন্দ্র মোদী বারাক ওবামাকে ডেকেই এনেছিলেন ভারতে মৃগয়ার আনন্দ দিতে।

যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, নরেন্দ্র মোদী সরকারের লক্ষ্য কী? এককথায় তার উত্তর আসবে, কর্পোরেট পুঁজির সেবা করা, বিশেষত বিদেশি পুঁজির জন্য তাঁরা নিবেদিত প্রাণ। মার্কিন সরকারের বিশেষ বন্ধু ছিলেন মনমোহন সিং। ভারত বেচতে তাঁরও চেষ্টার ত্রুটি ছিলনা। কিন্তু বিধি বাম। নয়া উদারনীতির জনক হয়েও তিনি মার্কিনী এবং কর্পোরেট দৈত্যদের চাহিদামতো দ্রুত পদক্ষেপ নিতে পারছিলেন না। সেক্ষেত্রে নরেন্দ্র মোদীর উদারীকরণের ক্ষেত্রে কোনো রকম ঢাক ঢাক গুড়গুড় নেই এবং সেই লক্ষ্যে ভারতকে দেশি-বিদেশি কর্পোরেট অতিথির জন্য মৃগয়াক্ষেত্র হিসাবে প্রস্তুত করার জন্য তিনি খোলামেলা পথ নিয়েছেন। জর্জ বুশ এবং বারাক ওবামা মনমোহন সিং-এর কাঁধে হাত রেখেছিলেন। বারাক ওবামা কিন্তু নরেন্দ্র মোদীকে বুকে টেনে নিয়েছেন।

লাল রং-এ সম্ভবত নরেন্দ্র মোদীর এ্যালার্জি আছে, তাই বারাক ওবামার জন্য লাল কার্পেট পাতা হয়নি। কিন্তু বিদেশি অতিথি আসার আগে তিন তিনটি অর্ডিন্যান্স জারি করে, বস্তুত তিনি কার্পেট পেতেই রেখেছিলেন। তার আগে শ্রম আইনগুলি সংস্কার করে, সামাজিক ও খাদ্য নিরাপত্তা খাতে ভর্তুকি ছাঁটাই করে, বিলগ্নীকরণ ও বেসরকারিকরণের ইঙ্গিত দিয়ে মোদী সরকার বাগানে ফুল ফুটিয়েই রেখেছিল। ওবামা এসে ফুলগুলি তুলে নিয়ে গেলেন। যেটা নিয়ে ওবামার সবথেকে বেশি উদ্বেগ ছিল, তা হলো 'ভারত-মার্কিন অসামরিক পরমাণু চুক্তি' (১২৩ চুক্তি) রূপায়ন। দীর্ঘবছর ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতে পরমাণু ব্যবসা সম্প্রসারণের চেষ্টা চালাচ্ছে। দুদেশকেই এ ব্যাপারে নানা টেকনিক্যাল আর রাজনৈতিক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। শেষমেশ জর্জ বুশ এবং মনমোহন সিং-এর সক্রিয় প্রচেষ্টায় ২০০৮ সালে ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মার্কিন দেশের পরমাণু চুল্লি ব্যবসায়ীরা উল্লসিত হলেও, মনমোহন সিং সরকার সহজে ছাড় পায়নি। বিজেপি-র সহযোগিতায় সংসদে ২০১০ সালে 'পারমাণবিক দায়বদ্ধতা আইন' (Civil Liability for Nuclear Damage Act, 2010) সংসদে পাশ করিয়ে অবস্থা সামাল দেওয়ার চেষ্টা হলো বটে, কিন্তু মার্কিন সরকার এই আইনে উষ্মা প্রকাশ করে। কারণটা আর কিছুই নয়, এই আইনের একটি ধারায় বলা হয়েছিল, 'সরবরাহকারী সংস্থা অথবা তার কর্মচারীর দোষে, ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রপাতি অথবা উপাদান কিংবা নিম্ন-মানের পরিষেবার কারণে পারমাণবিক দুর্ঘটনা ঘটলে, সরবরাহকারী সংস্থার থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের অধিকার ভারতের থাকবে'। আমেরিকা এই দায় ঘাড়ে নিতে রাজি নয়। কেনই বা নেবে? চিরকাল তারা উত্তমর্ণের ভূমিকা গ্রহণ করেছে, আজ তারা অধমর্ণ হতে যাবে কেন? আমেরিকার আব্দার, এই ধারা বাতিল করতে হবে।

মনমোহন সিং খুব মনোকষ্ট নিয়ে বিদায় নিয়েছেন, তিনি মার্কিনী আব্দার পূরণ করতে পারেন নি। নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর আমেরিকায় গিয়ে ওবামাকে বোঝালেন, 'মা ভৈঃ, ময়় হুঁ না'। মোদী সরকার কৌশলে মার্কিনী কোম্পানীগুলোর সমস্ত দায় ভারতবাসীর কাঁধে চাপিয়ে দিল। সংবাদে প্রকাশ, পরমাণু দুর্ঘটনার সমস্যা এড়াবার জন্য, ১৫০০ কোটি টাকার বিমা তহবিল গড়া হবে। এই তহবিলের অর্ধেক, ৭৫০ কোটি টাকার জোগান দেবে জিআইসি সহ ভারতের পাঁচটি বিমা কোম্পানী এবং বাকি টাকা দেবে সরকার। আমেরিকা বলেছে, তারা ভারতের পরমাণু প্রকল্পগুলির উপর নজরদারি করার শর্ত তুলে নিচ্ছে। সে কাজটা করবে আন্তর্জাতিক সংস্থা, আই.এ.ই.এ। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির উপর ছড়ি ঘোরানো আমেরিকার দীর্ঘদিনের অভ্যাস। কাজেই বকলমে মার্কিনী নজরদারির সুযোগ থেকেই যাচ্ছে। বিশেষ করে মোদী সরকারের মতো তাঁবেদার যখন আছে।

প্রতিরক্ষা অস্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রেও আমেরিকা সাহায্য করবে— যার অর্থ, সামরিক টেকনলজিও আমেরিকা নিয়ন্ত্রণ করবে। সর্ব অর্থেই দেশটা নতুন করে মার্কিনীদের পদানত হতে চলেছে। ২০১৫ সালের ২৬ জানুয়ারি লালকেল্লা থেকে সেই বার্তাই ভেসে এল।

মহাভারত নীতিকথা নয়

সুমন্ত ব্যানার্জী

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ হিস্টরিক্যাল রিসার্চ-র নতুন প্রধান (বিজেপি সরকার নিয়োজিত) ইয়েল্লাপ্রাগাডা সুদর্শন রাও রামায়ণ মহাভারতের ভিত্তিতে এদেশের প্রাচীন ইতিহাস নতুন করে লেখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। রাওয়ের মতে, এগুলি ঐতিহাসিক ঘটনার সত্য বর্ণনা। কিন্তু মহাকাব্য বাছার ক্ষেত্রে রাওয়ের আর একটু যত্নবান হওয়া উচিত।

মহাভারতের গল্পগুলি যেমন প্রায়শ বিজেপি সরকার ও তার জন্মদাতা সংঘ পরিবার যে হিন্দুত্ব প্রচার করেন তার সঙ্গে মেলে না। হিন্দুত্ববাদীরা এর নায়কনায়িকাদের পূজা করেন, কিন্তু এদের বেশির ভাগই যে বাণী দেন তা বর্তমান সরকার হিন্দুত্ব প্রচারের জন্য মানুষকে যে 'নীতি ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ' শেখানোর কথা বলেন তার পক্ষে উপযোগী হবে না। সত্যি বলতে কি, মহাভারতের আট খণ্ডে দেবদেবী বা মানুষদের কোথাও হিন্দু নামে বর্ণনা করাই হয়নি। বিজেপি মন্ত্রীদের জন্য, সংঘ পরিবারের ঐতিহাসিকদের জন্য মহাভারতের খনি খুঁড়ে হিন্দু ভারতীয় নৈতিকতা ও সংস্কৃতির মডেল বের করা কঠিন হবে।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত যিনি স্বাস্থমন্ত্রী ছিলেন সেই হর্ষবর্ধন (চিকিৎসক) তথাকথিত ''ভারতীয় নৈতিক সংস্কৃতি''র একটা ধরন তৈরির ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করেছেন। নিউইয়র্ক টাইমসে এক সাক্ষাৎকারে তিনি নাকি বলেছেন যে এইড্‌স থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কনডমের বিজ্ঞাপনের চেয়ে ''বিবাহপূর্ব ও বিবাহ-বহির্ভূত যৌনসম্পর্ক'' থেকে বিরত থাকাটা অনেক ভালো উপায়, কারণ ব্রহ্মচর্য ''ভারতীয় সংস্কৃতির অংশ''। ভারতীয় নারীদের পোষাক সংস্কার প্রচেষ্টায় গোয়ায় বিজেপি-র মন্ত্রী সুধীর দাভালকরের সতর্কবাণী, ''স্বল্পপোষাকের নারীরা আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খায় না।'' আরএসএস-এর সংস্থা ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতির পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনা করা হচ্ছে, এই সংস্থা পুরাণ থেকে ইতিহাস লেখার ধরন ঠিক করে দিয়েছে, যাতে করে বর্তমান ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকগুলিকে ''নীতিভ্রষ্ট পশ্চিমা প্রভাব'' থেকে মুক্ত করা যায়।

কিন্তু যৌন কার্যকলাপ, নারীর আচারব্যবহার ও পোষাক সম্পর্কে এই তিন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হিন্দু ধর্মীয় ঐতিহ্য একমাত্র ''ভারতীয় সংস্কৃতি'' হিসাবে যা প্রচার করছেন, মহাভারতের নায়কনায়িকারা সেগুলিকে ভঙ্গ করেছেন। আমাদের মন্ত্রীরা আমাদের নারীদের যে ধরনের সতীত্বের আদর্শ মেনে চলতে বলছেন মহাভারতের নায়িকারা সেরকম চলেন নি। এই মহাকাব্যে নারীদের দেহের (পোষাকের আড়ালে দৃশ্যমান) যে বিশদ বর্ণনা পাই তার কাছে জিনস পরিহিত যে নারীদের বিরুদ্ধে সংঘ পরিবারের নৈতিক অভিভাবকরা সরব, তারা নেহাতই নস্যি। মহাভারতের নায়কদের কথা বললে বলতে হয় যে তারা আনন্দের সঙ্গে বিবাহপূর্ব ও বিবাহ-বহির্ভূত যৌন সংসর্গ করে গেছেন। আর এটা ভুললে চলবে না যে তারা ও তাদের বিবাহ-বহির্ভূত সন্তানরা মহানায়কের মর্যাদা পেয়েছেন।

কৌরব ও পান্ডবদের পিতৃ(মাতৃ)পুরুষদের জন্ম

ডাঃ হর্ষবর্ধন ও তাঁর পার্টির অন্য নেতারা বলছেন বিবাহপূর্ব ও বিবাহ-বহির্ভূত যৌনসম্পর্ক যত নষ্টের গোড়া, কিন্তু সেরকম যৌনসম্পর্ক না হলে আমরা মহাভারতকার বেদব্যাসকে পেতাম না, তাঁর ব্যাভিচারী সম্পর্ক জাত পুত্রদের (ধৃতরাষ্ট্র, পান্ডু ও বিদুর) পেতাম না, তাঁর নাতিদের (পঞ্চপান্ডব) পেতাম না। মহাভারতের আদি পর্বে বেদব্যাসের জন্মবৃত্তান্তই শোনা যাক। মহামুনি পরাশর একদিন তীর্থযাত্রাকালে যমুনা নদীর তীরে উপস্থিত হলেন এবং দেখলেন এক পরমাসুন্দরী সুহাসিনী নারীকে। দেখে ঋষি পরাশরের মধ্যে অতিশয় কাম জাগ্রত হলো। নারীটির নাম মৎস্যগন্ধা (জেলের ঘরে মানুষ হওয়ার জন্য মাছের গন্ধ গায়ে), সে যাত্রী নিয়ে নদী পারাপার করে। পরাশর এসে যখন তাঁর কামনার কথা জানালেন, সে বললো এখনি সেই কামনার নিষ্পত্তি ঘটানো যাবে না কারণ ঘাট ভর্তি ঋষিরা অপেক্ষা করছে তার নৌকার জন্য। মহাঋষি পরাশর তখনই কুয়াশার সৃষ্টি করলেন যাতে অন্য ঋষিরা তাঁর কার্যকলাপ দেখতে না পান। পরাশরের এই কীর্তি দেখে মুগ্ধ হলেও মৎস্যগন্ধা রাজি হলেন না। তাঁর বক্তব্য, ''তোমার কামনা সিদ্ধ করলে আমি কৌমার্য হারাবো, তখন আমি কী করে পরিবারের কাছে, সমাজের কাছে মুখ দেখাবো?'' পরাশর বললেন, আমার কামনা পূর্ণ করলে আমি তোমায় যা চাও তাই দেব, তোমার কৌমার্য ফিরিয়ে দেব।'' মৎস্যগন্ধা প্রার্থনা করলেন, ''আমার গায়ে যেন সুন্দর গন্ধ হয়।'' প্রার্থনা পূর্ণ হওয়ার পর মৎস্যগন্ধা পরাশরে সঙ্গে সঙ্গমে রাজি হলেন। যথাসময়ে তাঁর এক পুত্র জন্মালো। তার নাম কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস (অর্থ, তিনি কৃষ্ণবর্ণ এবং দ্বীপে জন্ম তাঁর)। ঋষি হওয়ার জন্য ঘর ছাড়লেন ব্যাস। তবে বললেন, মা ডাকলে তিনি আসবেন।

এর পর মৎস্যগন্ধার (এখন তাঁর নাম সত্যবতী, পরাশরের বরে তাঁর শরীর ''সুগন্ধী'' আর তিনি ''আবার কুমারী'') বিয়ে হলো রাজা শান্তনুর সাথে। তাঁদের দুটি পুত্র হলো। চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য। শান্তনুর মৃত্যুর পর বিচিত্রবীর্য সিংহাসনে বসলেন, বিয়ে করলেন এক রাজার মেয়ে দুই বোনকে- অম্বিকা ও

অম্বালিকা। মহাভারতে আদি পর্বে বর্ণিত হয়েছে কীভাবে সাতবছর রাণীদের সঙ্গে বিহার করার পরও বিচিত্রবীর্যের সন্তান হলো না। তার পর তিনি যৌবনেই ক্ষয়রোগে প্রাণ হারালেন। এবার সমস্যা হলো, রানিরা সন্তানহীনা— রাজত্ব চলবে কীভাবে? শ্বাশুড়ি সত্যবতী প্রথমে তাঁর সৎছেলে ভীষ্মকে ডাকলেন বউমাদের সন্তানবতী করতে। তিনি কাজটি করতে অস্বীকার করলে সত্যবতী এবার ডাকলেন তাঁর প্রথম সন্তান পরাশরপুত্র বেদব্যাসকে (তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সত্যবতীর কোনো প্রয়োজন হলে তিনি সাহায্য করবেন)। তিনি সমস্যার সমাধানে রাজি হলেন। সত্যবতী এবার বড় বউমা অম্বিকাকে বুঝিয়ে রাজি করলেন বেদব্যাসের সঙ্গে একশয্যায় রাত্রিযাপন করতে। কিন্তু বেদব্যাসকে দেখে, তাঁর ভয়ানক চেহারা, কৃষ্ণবর্ণ, রক্তবর্ণ চক্ষু, জটাজুট দর্শন করে অম্বিকা ভয়ে তাঁর চোখ বন্ধ করে ফেললেন। তাঁর কাজ সম্পন্ন করে ব্যাস মা সত্যবতীকে বললেন, পুত্রসন্তান হবে, তার দারুন মানসিক ও শারীরিক শক্তিও হবে, কিন্তু সেই পুত্র হবে অন্ধ, কারণ গর্ভনিষেকের সময় অম্বিকা চোখ বন্ধ করে রেখেছিলেন। ফলে অম্বিকার পুত্র ধৃতরাষ্ট্র হলেন জন্মান্ধ। এই ভুলটা ঠিক করে নেওয়ার জন্য সত্যবতী আবার বেদব্যাসকে ডাকলেন, এবার অন্য পুত্রবধূ অম্বালিকার গর্ভাধানের জন্য। অম্বালিকাও কিন্তু ব্যাসের ভয়ানক চেহারা দেখে ভয়ে পান্ডুরবর্ণ হয়ে গেলেন। ফলে তাঁর পুত্র পান্ডু হলেন পান্ডুরবর্ণ। পরপর দুবার খুঁতযুক্ত নাতি জন্মানোয় হতাশ সত্যবতী আবারও ব্যাসকে ডাকলেন, বড়বউ অম্বিকার গর্ভাধানোর জন্য। এবার কিন্তু অম্বিকা সত্যবতীকে ঠকালেন। ঐ ভয়ানক বুনো লোকটার কাছে আর যেতে ইচ্ছে নেই তাঁর। তিনি এক সুন্দরী দাসীকে তাঁর পোযাক ও গহনা পরিয়ে ব্যাসের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এই দাসী কিন্তু ব্যাসকে দেখে ভীত হলেন না। খুশি হয়ে ব্যাস তাঁকে আশীর্বাদ করলেন, ''তুমি এখন থেকে দাসীত্ব থেকে মুক্ত হলে, আর তোমার পুত্র হবে অতি জ্ঞানী এবং অত্যন্ত ধার্মিক।'' এইভাবে জন্ম হলো বিদুর। তিনভাইয়ের মধ্যে যিনি নিখুঁত এবং সবচেয়ে বুদ্ধিমান। (*আদি পর্ব*)

পাণ্ডবদের জন্ম

বিবাহপূর্ব ও বিবাহবহির্ভূত যৌনসম্পর্ক থেকে (অন্য পুরুষ দিয়ে স্ত্রী বা বিধবা স্ত্রীর গর্ভাধান) উদ্ভূত সন্তান, যকে বলে ক্ষেত্রজ সন্তান, সে ব্যাপারটা কিন্তু চলতেই থাকল। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন ও নকুল-সহদেব, এইসব পাণ্ডব ভ্রাতারা যাদের সংঘ পরিবার পূজা করে, সংঘ পরিবারের চিন্তকরা যাদের 'ঐতিহাসিক পুরুষ' বলে প্রতিষ্ঠা করতে উঠেপড়ে লেগেছেন, তাদের সবার জন্ম ক্ষেত্রজ সন্তান হিসেবেই। পাণ্ডবমাতা কুন্তী দিয়েই শুরু করি। রাজকন্যা কুন্তী যখন কুমারী কন্যা তখন তিনি দুর্বাসা মুনিকে তাঁর সেবা দিয়ে সন্তুষ্ট করে এক বর পান। তিনি যে কোনে দেবতাকে ডাকতে পারবেন তাঁর সন্তান উৎপাদনের জন্য। কুন্তীর তখন বয়স কম। ঝোঁকের মাথায় তিনি ডেকে বসলেন সূর্যদেবকে। সূর্যদেব এলেন। কুন্তী তখন ভয় পেয়ে গেছেন। সূর্যদেব তখন কুন্তীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আবার একটু ভয় দেখিয়ে রাজি করালেন। বললেন যে কুন্তী আবার কুমারী হয়ে যাবেন। কুন্তী বিপদে পড়লেন। এর ফলে তিনি সামাজিকভাবে অচ্ছ্যুৎ হয়ে পড়বেন। তিনি তাঁর প্রথম সন্তানকে নদীতে ফেলে দিলেন। সৌভাগ্যবশত, একটি নিচুজাত ছুতোর পরিবার তাকে খুঁজে পায় এবং মানুষ করে। এই সন্তানই হন বীর যোদ্ধা কর্ণ। (*আদি পর্ব*)

এই বিবাহপূর্ব যৌনসম্পর্কের কথা লুকিয়ে রেখেই কুন্তী এক রাজকুমারী হিসেবে স্বয়ংবরসভায় হাজির হলেন, যেখানে আগত নানা রাজপুত্রদের মধ্য থেকে তিনি স্বামী হিসেবে একজনকে পছন্দ করে তাঁর গলায় মালা দেবেন। তা, হিন্দু ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের ব্রত যাদের সেই বিজেপি সরকার কি স্বয়ম্বরসভার ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনবেন? যাই হোক, স্বয়ম্বরসভায় কুন্তী পান্ডুর গলায় মালা দিলেন। তাঁরা সুখে জীবন কাটাতে লাগলেন। কিন্তু একদিন শিকারে গিয়ে পান্ডু শৃঙ্গাররত এক হরিণ-হরিণীকে তীরবিদ্ধ করলেন। কিন্তু সেই হরিণ-হরিণী আসলে ছিল মানুষ। হরিণটি এক ঋষিপুত্র। বোধহয় প্রাণীদের শৃঙ্গার কেমন হয় তা বোঝার জন্য একদিন সে নিজে হরিণের রূপ ধারণ করে, তার স্ত্রীকে হরিণীরূপ ধারণ করায়। সেই শৃঙ্গারে এভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ঋষিপুত্র পাণ্ডুকে অভিশাপ দিলেন, স্ত্রীতে উপগত হতে গেলেই প্রাণ হারাবেন পাণ্ডু। বিপদে পড়ে পাণ্ডু কুন্তীকে বললেন অন্যের দ্বারা সন্তানবতী হতে। কুন্তী তখন তাঁর সেই পুরনো বর ব্যবহার করে একের পর এক দেবতাকে, ধর্ম, বায়ু ও ইন্দ্র, আহ্বান করে তাঁদের সঙ্গে সঙ্গমের মাধ্যমে জন্ম দিলেন তিন পুত্রের। যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন। পাণ্ডুর অনুরোধে কুন্তী অশ্বিনীকুমার ভ্রাতৃদ্বয়কে আহ্বান করলেন মাদ্রীকে সন্তানবতী করার জন্য। তাঁদের ঔরসে মাদ্রীর দুই সন্তান হলো। নকুল ও সহদেব। এই সব কাহিনীই মহাভারতের আদি পর্বের কাহিনী। একে তো সংঘ পরিবার মার্কসবাদীদের বানানো গল্প বলে উড়িয়ে দিতে পারবে না। মহাভারতের এর পরবর্তী ১৭ পর্বে কী আছে? প্রধান যুদ্ধের কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে আছে প্রচুর প্রেমের গল্প, গোপন প্রেম ও অভিসারের কাহিনী, যা থেকে বেরিয়ে আসে বিভিন্ন ধরে যৌন জীবন, বিভিন্ন জাত ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে যৌন সম্পর্ক। (অতীতে এসবই বিদুরের জন্ম সম্ভব করেছে। পরে ভীমের সঙ্গে অরণ্যকন্যা হিড়িম্বার প্রেম অথবা অর্জুনের সঙ্গে মণিপুরের রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার বিবাহ সম্ভবপর করে তুলেছে।)

অথচ আজ যদি দুজন বিভিন্ন জাত বা জাতি বা ধর্মের মানুষ এধরনের রোমান্টিক সম্পর্ক গড়তে যায়, তাদের ওপর

এর পর ৭০ পৃষ্ঠায়

ঘটনাপ্রবাহ

মানবাধিকার : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাল-হকিকত

সুদীপ্ত সেন

দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (United States of America) যে অন্য দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় বড়ই 'ব্যথিত' হয় তা বোধহয় একটি শিশুরও অজানা নয়। মাঝে মাঝেই দেখা যায় মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী দেশটির 'স্বৈরাচারী' শাসকদের 'উপযুক্ত শিক্ষা' দিতে যথাযথ ব্যবস্থা নিতেও হোয়াইট হাউসের নায়করা দ্বিধা করেন না। বর্তমানে হোয়াইট হাউসের বিচারে মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত দেশের তালিকায় সর্বাগ্রে নাম রয়েছে সম্ভবত উত্তর-কোরিয়ার। এই দেশটিতে স্বৈরাচারী শাসক-বৃন্দ দেশের সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলিকে কী ভাবে 'পদদলিত' করছে তা দুনিয়ার কাছে তুলে ধরতে হোয়াইট হাউসের চেষ্টায় সামান্যতম ত্রুটি আছে বলে বোধহয় তার পরম শত্রুও অপবাদ দিতে পারবে না। তবে সাধারণ বুদ্ধি ঐ কথাই বলে যে কোনও রকম অভিযোগ এলেই যে কোন মানুষেরই উচিত উভয় পক্ষের বক্তব্যই ভাল করে জেনে নেওয়া। কাজেই এক্ষেত্রে যদি উত্তর কোরিয়ায় শাসকদের কোন বক্তব্য থাকে তা ভাল করে জেনে নেওয়া উচিত (অবশ্য তার অর্থ কখনই এই নয় যে তাদের সব কথা মেনে নিতে হবে)। উত্তর কোরিয়ায় সরকারি সংবাদ সংস্থা কোরিয়ান সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সি (KCNA) এপ্রিল মাসে প্রকাশিত এক রিপোর্টে জানায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার তাঁবেদার দেশগুলো মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে বিভিন্ন দেশে যথেচ্ছাচার শুরু করেছে। এর অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তারা এ বিষয়ে এক নতুন পথ অবলম্বন করেছেন। এবার তারা নিজেরাও আক্রমণাত্মক হয়ে খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই মানবাধিকার লঙ্ঘনের অসংখ্য অভিযোগ এনেছেন, যার মধ্যে সবচেয়ে বড় অভিযোগটি বর্ণ-বৈষম্য সংক্রান্ত। এই অভিযোগের স্বপক্ষে তারা জানিয়েছেন আমেরিকার ৫২ শতাংশ নাগরিক বলেছেন যে দেশে বর্ণ-বৈষম্য এখনও বর্তমান এবং ৪৬ শতাংশ মানুষ আক্ষেপ করেছেন এ'জাতীয় বৈষম্য চিরস্থায়ী হবে। এ অভিযোগটি ছাড়া আর উল্লেখযোগ্য অভিযোগের মধ্যে রয়েছে, আবাসনের খরচ অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ায় দেশের বহু নাগরিকের গৃহহীন হয়ে যাওয়া, দেশের নাগরিক এবং সে দেশে বসবাসকারী বিদেশিদের গতিবিধির উপর ব্যাপক নজরদারি, ক্যামেরা এবং অন্য উন্নত যন্ত্রপাতির দ্বারা তাদের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখা। ওই রিপোর্টে আরও দাবি করা হয়েছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমান কারা-বন্দির সংখ্যা ২২ লক্ষ, যা পৃথিবীর সমস্ত দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং কারাগারের অভাবে দেশের ধনিক সম্প্রদায়ের অনেকে বেসরকারি কারাগার নির্মাণে উৎসাহ দিচ্ছেন— যার একমাত্র উদ্দেশ্য আরও অর্থ উপার্জ্জন করা। এ রিপোর্টে রাষ্ট্রপতি ওবামার বিরুদ্ধেও একটি মারাত্মক অভিযোগ করা হয়েছে, বলা হয়েছে দিন দিন তাঁর বিলাসিতার বহর বাড়ছে। দেশের সাধারণ নাগরিকদের দুঃস্থ অবস্থার উপর কোন রকম গুরুত্ব না নিয়ে তিনি তাঁর বিদেশ ভ্রমণের পিছনে অকারণে কোটি কোটি ডলার খরচ করছেন।[১]

অবশ্য বিংশ শতাব্দীর ৬০ বা ৭০-এর দশকে ইন্দোচীনে যখন মার্কিন-তাণ্ডবলীলা চলছিল তখন যারা বলতেন মেকং-এর অববাহিকায় মার্কিন সৈন্যরা লড়ছে এশিয়ায় মুক্তির জন্য অথবা এই শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে যারা দাবি করতেন মার্কিন মুলুকে দুধ আর মধুর বন্যা বয়ে যাচ্ছে[২], এ পর্যন্ত পড়ে তারা চিৎকার করে বলবেন উত্তর-কোরিয়ায় মত একটি দেশের সরকারি মুখপাত্ররা যা বলছে তার কী গুরুত্ব আছে? কিন্তু এ সম্পর্কে আর একটি তথ্য পেশ করলেই এই মার্কিন তাঁবেদাররা খুব বিপদে পড়ে যাবেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের কথা কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘের একটি রিপোর্টেও বলা হয়েছে। শুধু তাই নয় রাষ্ট্রসঙ্ঘ নিয়োজিত এই কমিটিটি নয় নয় করে ২৫টি ক্ষেত্রে মার্কিন সরকারের মানবাধিকার লঙ্ঘনের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন।[৩] এক্ষেত্রে আরও উল্লেখ্য, উত্তর কোরিয়ায় সরকারি সংস্থা যে সব অভিযোগ করেছে তার বেশ কয়েকটি কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যদলের এই রিপোর্টেও সমর্থিত হয়েছে। এই রিপোর্টে যে সমস্ত বিষয়গুলির কথা জানানো হয়েছে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো, গুয়ানতানামো, বুশ জমানায় মানবাধিকার লঙ্ঘন (এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে ক্ষমতায় আসার পর বুশ জমানায় অত্যাচারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বর্তমান রাষ্ট্রপতি ওবামা বলেছিলেন, "পেছনে নয়, আমাদের এবার সামনে তাকাতে হবে"), কারাগারে বন্দিদের বর্ণ-বৈষম্যের শিকার হওয়া; জাতি-বৈষম্য (Racial Discrimination), পুলিশি নির্যাতন এবং গৃহহীনদের অপরাধীতে পরিণত করা।

এই রিপোর্টে প্রথমেই বলা হয়েছে, কিউবার গুয়ানতানামোর সামরিক শিবিরগুলির কথা। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে এখানে অত্যাচারের সমস্ত প্রমাণ নষ্ট করার চেষ্টা চলেছে। বন্দিদের উপর মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ (Central Intelligence Agency) যে অমানবিক অত্যাচার চালাত তার যথাযথ বিবরণ সংগ্রহ করার কাজটি খুবই কঠিন, কারণ সিআইএ-র তরফ থেকে তা ধামাচাপা দেবার যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে। অত্যাচারিতদের আইনজীবীরা বিষয়টি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করার প্রাণপাত চেষ্টা করে চলেছেন। এই আইনজীবীদের

একজন জেমস কর্নেল বলেছেন, সিনেটের একটি নির্বাচিত কমিটির রিপোর্টে এ সংক্রান্ত অনেক তথ্য আছে এবং এই কমিটি (SSCI- Senate Select Committee In Intelligence) প্রকৃত সত্যটি জানে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য যখন আমাদের হাতে নেই তখন এ নিয়ে আর বিশেষ কিছু বলা সম্ভব নয়। কিন্তু এই কুখ্যাত সিআইএ-র পৃথিবীব্যাপী দৌরাত্ম্যের কথা মাঝে মাঝেই শোনা যায়। খবরে প্রকাশ, ২০০১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে জঙ্গি হানার পর তাদের এই অত্যাচার প্রচণ্ড বেড়ে গিয়েছে। এই রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে কি হবে না— তা নিয়ে ওবামা প্রশাসন এবং বিরোধী রিপাবলিকান সদস্যদের মধ্যে প্রচণ্ড বাদানুবাদ হয়।[৫] প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ একবার দাবি করেছিলেন, সন্ত্রাসবাদী সন্দেহে (বিশেষত আল-কায়দা জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক থাকার অভিযোগে) বন্দিদের উপরে পাশবিক অত্যাচারের বিষয়টি তাঁর জানা ছিল না, কিন্তু সম্প্রতি সিআইএ-র এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, তারা যা করেছেন তা হোয়াইট-হাউসের নির্দেশেই করা হয়েছে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের রিপোর্টে যে ২৫টি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে চারটি হল জাতি বৈষম্য বা বর্ণ বিদ্বেষ সংক্রান্ত। এ সম্পর্কে রাষ্ট্র-সঙ্ঘের এই রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করার আগে একটি অতি সাম্প্রতিক ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। মিসৌরি প্রদেশের ফার্গুসনের এই ঘটনা গোটা দুনিয়াকেই সচকিত করেছে। ১৮ বছরের কৃষ্ণাঙ্গ যুবক মাইকেল ব্রাউনকে গুলি করে হত্যা করে পুলিশ অফিসার ড্যারেন উইলসন। ব্রাউন নাকি দোকান থেকে এক বাক্স চুরুট চুরি করে পালাচ্ছিল। কিন্তু ঘটনা হলো, এ ব্যাপারে দোকান থেকে কোনও কর্মচারী পুলিশকে ফোন করেন নি। ব্রাউন মারা যাওয়ার আগে কেউ দোকানের ভিডিও সার্ভিলেন্স ফুটেজও দেখেন নি। সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী উইলসন নাকি তখন ওই এলাকায় টহল দিচ্ছিল, ব্রাউন ও তার এক সঙ্গীকে রাস্তায় হাঁটতে দেখে থামতে বলে। উইলসনের বক্তব্য অনুযায়ী ব্রাউন পুলিশের আদেশ অমান্য করে। শুধু তাই নয়, সে ছুটে উইলসনকে ঘুষি মারে, ফলে সে গুলি চালাতে বাধ্য হয়। কিন্তু যারা সাক্ষ্য দিয়েছেন, তাদের মধ্যে অনেকেই বলেছেন যে উইলসন যখন গুলি করে তখন ব্রাউন তার থেকে বেশ কিছুটা দূরে ছিল। নভেম্বর মাসের শেষের দিকে এই মামলার (ঘটনাটি ঘটেছিল ৯ই আগস্ট) রায় বেরোয় এবং তাতে বেকসুর খালাস পায় শ্বেতাঙ্গ পুলিশ অফিসার উইলসন। ২০১৪ সালের এই ঘটনাটি বলে দিল, ১৯৬৪ সালে মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণ-বৈষম্য বিরোধী আইন পাশ হলেও বর্ণ-বৈষম্য আজও বহাল। কালো মানুষকে মারলে সাদা পুলিশের শাস্তি হয় না। কৃষ্ণাঙ্গদের উপর সরকারি নিপীড়ন এখনও চলছে। মানবাধিকার আন্দোলনের একজন নেতা জেসি জ্যাকসন বলেছেন, এদেশে যত কালো ছেলেমেয়ে কলেজে পড়ার সুযোগ পায়, তার চেয়ে বেশি জেলে বন্দি থাকে।[৬]

এবার রাষ্ট্রসঙ্ঘের রিপোর্টটি পর্যালোচনা করা যাক। এই রিপোর্টে যে ২৫টি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে চারটি হলো মার্কিন দেশে বিচার ব্যবস্থা এবং আইন প্রয়োগে জাতি-বৈষম্যের (Racial-disparity) প্রভাব সংক্রান্ত। রাষ্ট্রসঙ্ঘ নিয়োজিত এই কমিটি অপরাধীর শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রেও এই বৈষম্যের উল্লেখ করেছেন। প্রধানত মুসলমানরা এই বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন বলে তারা উল্লেখ করেছেন। আফ্রিকান বংশোদ্ভূত আমেরিকান নাগরিকদের উপর অত্যাচারের কথাও তারা বলেছেন। এখনও পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীরা যে প্রায় অকারণে আফ্রিকান বংশোদ্ভূত নাগরিকদের গুলি করে হত্যা করে সে বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে এই রিপোর্টে। এতে আরও বলা হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জেলবন্দির সংখ্যা তাদের দৃষ্টিতে চরম স্বৈরাচারী চীন বা রাশিয়ার চেয়েও বেশি। এই রিপোর্টে অবশ্য বলা হয়েছে নিউ ইয়র্কে বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।

বস্তুত মার্কিন মুলুকে জাতি-বৈষম্যের নিদর্শন সর্বত্রই পাওয়া যায়। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলার দশম বার্ষিকীতে সোসহানা হেবশি নামক এক মহিলা যিনি নিজেকে আধা-আরবি আধা-ইহুদি বলে পরিচয় দেন, ডেট্রয়েট বিমানবন্দরে এই জঘন্য জাতি-বিদ্বেষের শিকার হন। মার্কিন নাগরিক অধিকার সংস্থা (ACLU- American Civil Liberties Union) আনীত এক অভিযোগে এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

বিমানটি সানফ্রান্সিসকো থেকে ডেট্রয়েট যাচ্ছিল। শ্রীমতী হেবশির খুব কাছেই দুজন যাত্রী ছিল যারা বাথরুমে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটিয়েছিল। পরে জানা যায় তারা এশীয় বংশোদ্ভূত, অর্থাৎ তাদের পূর্বপুরুষরা এশিয়ার কোন দেশের নাগরিক ছিলেন। ওই বিমানসংস্থার কর্মীরা নিরাপত্তাকর্মীদের কাছে সন্দেহভাজনদের যে তালিকা পেশ করেন তাতে ওই দুজনের সঙ্গে সোসহানা হেবশির নামও দেওয়া হয় যদিও হেবশি জানান যে তিনি ওই দুজনকে চিনতেন না এবং এমন কোন প্রমাণ ছিল না যে তিনি সত্যিই তাদের চিনতেন। কিন্তু তাতে কোন ফল হলো না। অভিযোগ পাওয়ার পর FBI (Federal Bureau of Investigation)-এর কর্মীরা এবং বিমানবন্দরের দায়িত্বে থাকা পুলিশ কর্মীরা হেবশিকে গ্রেপ্তার করে, যদিও এই গ্রেপ্তারের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না, কেননা কোন অপরাধমূলক কার্যকলাপের সঙ্গে তাঁর যোগ থাকার কোন তথ্যই গ্রেপ্তারকারীদের হাতে ছিল না।

হেবশিকে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় একটি ৬ ফুট x ১০ ফুট কক্ষে এবং নিরাপত্তা-কর্মীরা জানায় তার শারীরিক তল্লাশি করা হবে। টোয়া পার্কার নামক বিমান-বন্দরের

নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা একজন পুলিশ অফিসার হেবশিকে তার যাবতীয় অন্তর্বাস সহ সমস্ত পোষাক খুলে ফেলার নির্দেশ দেন। ফলে শ্রীমতী হেবশিতে নিরাপত্তারক্ষীদের সামনে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হতে হয়। এর পরে এই ভাগ্যহীনা মহিলাকে দেওয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। অতঃপর পার্কার তাঁকে ঝুঁকে পড়ে নিতম্ব প্রদর্শন করতে বলেন। এই ভাগ্যহীনা তরুণীটি যখন এই লাঞ্ছনা ভোগ করছিলেন তখন পুলিশ অফিসার পার্কার মাত্র ফুট দুয়েক দূরে দাঁড়িয়ে সব কিছুর উপর লক্ষ্য রাখছিলেন। পুলিশ অফিসার তার শরীরের বিভিন্ন অংশ (মুখ-গহ্বর, চোখের পাতা, নিতম্ব ইত্যাদি ভাল করে পর্যবেক্ষণ করার পর হেবশিকে তাঁর পোষাক ফেরত দেওয়া হয়।

এ প্রসঙ্গে ACLU-এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে হেবশি কোন অস্ত্র বা কোন নিষিদ্ধ বস্তু লুকিয়ে রেখেছেন এরকম কোন তথ্যই পুলিশের হাতে ছিল না। তাঁর বিরুদ্ধে এমন কোন অপরাধের কোন প্রমাণ ছিল না যার জন্য নগ্ন -তল্লাশির (Strip-Search) প্রয়োজন হতে পারে। এ ধরনের তল্লাশি তখনই করা যেতে পারে যখন এ সম্পর্কে আদালতের নির্দেশ থাকে অথবা অভিযুক্তের শরীরে কোনও অস্ত্র বা নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্য লুকানো আছে বলে সন্দেহ করার যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে।[৭]

এ বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে দুই যমজ সন্তানের জননী সোসহানা হেবশি বলেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইতিহাসই হল একটু অন্য ধরনের (different looking) মানুষের উপর অত্যাচারের ইতিহাস। বিশেষত আরব-বংশোদ্ভূত, মুসলমান, দক্ষিণ এশিয়ার নাগরিক এবং লাতিনরা এই বৈষম্যের শিকার। তিনি আরও জানিয়েছেন মার্কিন প্রভুদের ধারণা হলো বাদামী (Brown) বর্ণের মানুষ হলেই সে অপরাধী।[৮]

এবার একবার মার্কিন কারাগারগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সমীক্ষা অনুযায়ী মার্কিন জনসংখ্যার ১৩ শতাংশ হলেন আফ্রিকান বংশোদ্ভূত আর সে দেশের কারাবন্দিদের মধ্যে এই সম্প্রদায়ের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৪০ শতাংশ। সমীক্ষায় আরও জানানো হয়েছে, প্রত্যেক তিনজন কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষের মধ্যে একজনকে জীবনে একবার কারাবাস করতে হবেই। লাতিনদের ক্ষেত্রে প্রতি ছজনের মধ্যে একজনকে এই অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। অন্যদিকে শ্বেতাঙ্গদের ক্ষেত্রে প্রতি ১৭ জনের মধ্যে একজনের এই অভিজ্ঞতা হয়।[৯] গুয়ানতানামো প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি ওবামা হোয়াইট হাউসে প্রবেশ করার পরে বলেছিলেন যে সেখানে বন্দিরা যাতে তাদের ন্যায্য অধিকার ফিরে পায় সে বিষয়ে তিনি সচেষ্ট হবেন, কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘের রিপোর্টে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে এখনও পর্যন্ত তিনি সে প্রতিশ্রুতি পালন করেন নি।

মার্কিন কারাগারগুলিতে মহিলাদের অবস্থা কেমন? বিভিন্ন সমীক্ষায় বন্দিনীদের ভয়াবহ অবস্থার চিত্রটি ফুটে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে আলোচনায় যাওয়ার আগে বছরখানেক আগে মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় কূটনীতিবিদ দেবযানী খোবরাগাড়ে (রাঠোর) এর অভিজ্ঞতার কথা একবার উল্লেখ করা যেতে পারে। দেবযানীকে ভিসায় ভুল তথ্য দেওয়া এবং পরিচারিকাকে কম বেতন প্রদান এবং অতিরিক্ত শ্রমে বাধ্য করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করার পর পুলিশি হেপাজতে এনে তাঁকে সম্পূর্ণ বিবসনা করে তল্লাশি করা হয়। এ প্রসঙ্গে ম্যানহাটনের এ্যাটর্নি প্রীত ভারারা (যিনি দেবযানীকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়েছিলেন) বলেছিলেন যে এর মধ্যে কোন অস্বাভাবিকত্ব নেই, যে কোনও বন্দির ক্ষেত্রেই এ কাজ করা যেতে পারে।[১০] মানসিক সমস্যা অথবা শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য যে সমস্ত বন্দিদের আলাদা করে বিশেষ কুঠুরিতে রাখা হয় তাদের অবস্থা সবচেয়ে সঙ্গীন, চার-পাঁচজন পুলিশ অফিসারের উপস্থিতিতে তাদের সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে শারীরিক তল্লাশির সম্মুখীন হতে হয়। কয়েক ফুট দূরে দাড়িয়ে একজন অফিসার এই তল্লাশির ছবি তুলে রাখেন ভিডিও ক্যামেরায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাজটি করানো হয় একজন পুরুষ অফিসারকে দিয়ে।[১১]

শুধু কারাগারের নিয়ম অমান্য করার জন্যই নয়, যে মহিলারা আত্মহত্যা করতে পারেন বলে সন্দেহ করা হয় অথবা যারা নিরাপত্তার কারণে বিচ্ছিন্ন (Isolated) কুঠুরিতে থাকতে চান তাদেরও এই চরম দুর্ভাগ্যজনক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়। সংবাদে প্রকাশ ২০০৮ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর থেকে প্রায় ২৭৪টি ঘটনা ঘটেছে যেখানে একজন পুরুষ আধিকারিক মেয়েদের নগ্ন-তল্লাশির ভিডিও রেকর্ড করার জন্য ক্যামেরা হাতে দাঁড়িয়ে থাকেন।[১২]

এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা পশ্চিম ম্যাসাচুসেটসের কারাগারগুলির। মহিলা বন্দিনীরা জানিয়েছেন নগ্ন তল্লাশির ভিডিও-রেকর্ডিং করা এবং পুরুষ কারারক্ষীদের তা দেখতে দেওয়া— একটি ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, যে ব্যবস্থায় কারাগারে বন্দিদের যৌন নির্যাতনে মদত দেওয়া হয়। যে মহিলাদের বিচ্ছিন্ন কুঠুরিতে একলা রাখা হতো তারাই যে কেবল এ নির্যাতনের শিকার হন, এমন নয়। এখানকার এলবিয়ন এলাকার এক মহিলা কারাগারে তার নির্যাতনের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন :

> একজন সার্জেন্ট আমাকে নিয়ে ঘরে ঢুকতে আমি দেখলাম সেখানে যারা উপস্থিত ছিল তারা ক্যামেরায় হাত দিল। ঘরটি ছিল নোংরা এবং মেঝেটি একেবারে অপরিচ্ছন্ন। সেখানে দুজন নারী অফিসার দাঁড়িয়ে ছিলেন। দুজন পুরুষ আধিকারিক বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন এবং আমি দেখলাম যে তাদের দৃষ্টি ঘরের ভিতরের দিকে।
>
> তারা ক্যামেরা চালু করল এবং আমাকে একটি একটি করে পোষাক খুলতে বলল, আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম যে এরকম কিছু ঘটতে পারে। আমি তাদের বললাম তাদের

একাজ করার কথা নয় কারণ এর আগেই অন্য এক জায়গায় আমার শারীরিক তল্লাশি হয়েছে এবং তারপর এখানে আনা হয়েছে। যদি বিশেষ কোন কারণ থাকে তাহলেই তারা এ কাজ করতে পারেন। কিন্তু সে কথায় কেউ কান দিল না। আমার পোষাক খুলে ফেলার কাজ শেষ হলে তারা আমাকে স্তনযুগল তুলে দেখাতে বলল, তারপর তারা আমাকে ঘুরে দাঁড়াতে নির্দেশ দিল। আমি এতটাই অপমানিত বোধ করছিলাম যে আমি কাঁদতে শুরু করলাম। তা দেখে অফিসারটি হেসে বলল, এখানে চোখের জল ফেলে কোন কাজ হবে না, কারণ তুমি এখন হাজতে আছো ।

১৯৯৪ সালের আগস্ট মাসে বন্দিদের আইনজীবীদের সংগঠন নিউইয়র্কের সংশোধন এবং গোষ্ঠী নিরীক্ষণ বিভাগের (DOCCS- Department of Correction and Community Supervision) বিরুদ্ধে মামলা করার হুমকি দেয়। তখন DOCCS-এর তরফ থেকে সমঝোতা প্রস্তাব দেওয়া হয় যে প্রত্যেক নির্যাতিতা মহিলাকে ১০০০ ডলার করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এরপর এলবিয়নে নগ্ন-তল্লাশির ভিডিও রেকর্ডিং বন্ধ করা হয়। এই ভিডিও রেকর্ডিং-এর ব্যাপক প্রচার এবং কারাগারে বন্দিনীদের উপর যৌন নির্যাতনের খবর পেয়ে সিনেটর ক্যাথরিন অ্যাবেটে এ সংক্রান্ত একটি বিলের খসড়া রচনা করেন যাতে বলা হয়, কোন কারারক্ষী বন্দিনীদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করলে তা অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। ১৯৯৬ সালে বিলটি পাশ হয়ে আইনে পরিণত হয়।[১৩]

কিন্তু এই আইন পাশ হওয়ার পরেও কারাগারে যৌন নির্যাতনের মত জঘন্য কাজটি বন্ধ করা হয়নি। ২০০৩ সালে অর্থাৎ এই আইন পাশ হবার ৭ বছর পরে, নিউ ইয়র্কের একটি কারাগারের বন্দিনীরা কারারক্ষীদের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ আনেন। এর মধ্যে শরীরের বিভিন্ন জায়গা স্পর্শ করা থেকে আরম্ভ করে ধর্ষণেরও অভিযোগ ছিল। কিন্তু ২০০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে আদালত তাদের এই আবেদন নাকচ করে দেয়, কারণ সেই অভিযোগ আইনানুগ হয়নি, কেননা কারাগার অভিযোগ সংস্থাকে (Prison Grievance System) এ সম্পর্কে অবহিত করা হয় নি, যদিও অভিযোগকারিণীদের বক্তব্য, উক্ত সংস্থার ইনস্পেক্টর জেনারেলকে তাদের অভিযোগের কথা জানান হয়েছিল।[১৪]

বস্তুত কারারক্ষীরা নগ্ন তল্লাশির এই প্রথাটির সুযোগ নিয়ে বন্দিনীদের উপর যৌন নির্যাতন চালায় এবং তাদের নানাভাবে অপমান করে। নগ্ন তল্লাশির কাজটি অনেক কারাগারেই এখন দৈনন্দিন বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এর মাধ্যমে যাতে বন্দিনীদের যৌন হেনস্থা না করা যায় তার জন্য সেরকম বিশেষ কোন রক্ষাকবচও রাখা হয়নি। ২০১২ সালে নিউ-ইয়র্ক সুপ্রিম কোর্টেরই এক রায় অনুযায়ী যে কোন বন্দিকেই নগ্ন করে তল্লাশি করা যেতে পারে, এ ক্ষেত্রে তার অপরাধের গুরুত্ব কতখানি তা বিবেচনা না করলেও চলবে। এই তল্লাশির স্বপক্ষে রায় দেন ৫ জন বিচারক। ডিভিসন বেঞ্চের চারজন বিচারপতি এই প্রস্তাবের বিপক্ষে মতামত দেন। ফলে ৫-৪ ব্যবধানে এই সিদ্ধান্তটি গৃহীত। যারা এ জাতীয় তল্লাশির সমর্থনে রায় দেন তাদের অন্যতম বিচারপতি এ্যান্টনি এম কেনেডি তাঁর সিদ্ধান্তের সমর্থনে যুক্তি দিতে গিয়ে বলেন, অতীতে দেখা গিয়েছে অতি সাধারণ অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের কাছ থেকেও অনেক সময় নিষিদ্ধ বস্তু পাওয়া গেছে এবং পরে তাদের মারাত্মক অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হবার নজিরও মিলেছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেছেন যে অভব্য আচরণের জন্য ওয়াশিংটনে ধৃত এক ব্যক্তি শরীরের অভ্যন্তরে অনেক নিষিদ্ধ বস্তু লুকিয়ে রেখেছিল। তাছাড়া ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনায় জড়িত এক সন্ত্রাসবাদীকে অত্যধিক গতিতে গাড়ি চালানোর জন্য ধরা হয়েছিল ঘটনাটির মাত্র দুদিন আগে। অবশ্য এ প্রসঙ্গে আর একজন বিচারক, বিচারপতি ব্রেয়ার (যিনি এই জাতীয় তল্লাশির বিরোধিতা করেছিলেন) বলেছেন, এই জাতীয় ঘটনা কদাচিৎ ঘটে এবং নিজের বক্তব্যের স্বপক্ষে তিনি জানিয়েছেন যে নিউইয়র্কে অরেঞ্জ কাউন্টি সংশোধনাগারে ২৩০০০ জনকে এইভাবে তল্লাশি করার পর মাত্র একজনের কাছ থেকেই নিষিদ্ধ বস্তু উদ্ধার করা গিয়েছিল যা অন্যভাবে করা সম্ভব ছিল না।[১৫]

সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের পর কারাগারে নতুন কোন বন্দি এলেই তাদের এইভাবে তল্লাশি করার অধিকার পেয়ে গিয়েছে কারারক্ষীরা। বন্দিরা আদালতে হাজিরা দিয়ে ফিরে এলে বা তাদের সঙ্গে কেউ (কোন আত্মীয় বা বন্ধু) দেখা করে চলে যাবার পর তাদের আবার নতুন করে এই তল্লাশির সম্মুখীন হতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২০,০০০ এরও বেশি বন্দি আছেন বিভিন্ন কারাগারে। একাধিক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে বেশ কিছু কারাগারে আটক মহিলাদের অবস্থা ভয়াবহ। ম্যাসাচুসেটসের কথা আগেই বলেছি। আমাদের কাছে যে তথ্য আছে তার থেকে বলা যেতে পারে যে মিশিগানের অবস্থাও তথৈবচ। ২০১২ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এখানকার একটি মহিলা সংশোধনাগারের প্রকৃত চিত্রটি ফুটে উঠেছে। প্রতিবেদক কেভন গস্টোলা (Kevin Gosztola) এই পরিবেশটিকে 'রাষ্ট্র কর্তৃক যৌন নিগ্রহ' আখ্যা দিয়েছেন। প্রতিবেদনে কয়েকজন নিগৃহীতার বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। একজন বন্দিনী নিজের লাঞ্ছনার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন :

> আমার ভাই আমার সঙ্গে দেখা করে চলে যাবার পর একজন কারারক্ষী আমার শারীরিক তল্লাশি শুরু করে। সে আমাকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে চেয়ারের এক কোণে বসার নির্দেশ দেয়। তারপর আমাকে পা ছড়িয়ে বসার নির্দেশ দেওয়া হয়। ...আমি চেয়ারের দিকে তাকিয়ে বেশ কিছু দাগ (spot) দেখতে পাই, যেগুলি নিঃসন্দেহে অন্য বন্দিনীদের শরীরের দাগ। আমি নগ্ন শরীরে ওই চেয়ারের উপর বসতে

পারছিলাম না। আমার পেট গুলিয়ে ওঠে, আমি একেবারে বিপর্যস্ত বোধ করি, তারপর কারারক্ষীর নির্দেশ মানতে আমি আমার জামাটাই (যেটি আমি পরেছিলাম) চেয়ারের উপর তুলে দিই। তল্লাশি শেষ হবার পর আমাকে হাত ধোওয়ার জন্য কোন সাবান দেওয়া হয়নি। এরপর এই দুর্দশা এড়ানোর জন্য আমি দীর্ঘদিন আমার দাদার সঙ্গে দেখা করিনি। বস্তুত কেউ দেখা করতে এলেই প্রত্যেক সাক্ষাতের আগে এবং পরে আমি অসুস্থ হয়ে পড়তাম। ....এখানে আরও একটা কথা জানানোর আছে। আমি একজন মুসলমান এবং ইসলাম ধর্মানুযায়ী কোন মহিলা নিজেকে কোনভাবে উন্মোচিত করতে পারে না, বিশেষত যেভাবে আমাকে তা করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছিল। যে পদ্ধতি অবসম্বন করা হয়েছিল তা আমাদের ধর্মবিরুদ্ধ।

অন্য এক রমণী, যাকে আরও কয়েকজন বন্দির সঙ্গে একসাথে এই লজ্জাজনক তল্লাশির সম্মুখীন হতে হয়েছিল, নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

আমাকে অন্যান্য মহিলাদের সামনে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হতে হল। এ অবস্থায় আমার মানসিক প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আমার সামনে একাধিক নগ্ন শরীরের উপস্থিতি, যা কখনই আমার কাছে বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়নি। বারবার মনে হচ্ছিল যে প্রকাশ্য রাজপথে আমি ধর্ষিতা হচ্ছি।[১৬]

এরকম আরও অনেক বন্দিনী তাদের অবমাননাকর অবস্থায় বর্ণনা দিয়েছেন, কিন্তু তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে কাগজ-কলমকে অপবিত্র করা মোটেই সঙ্গত নয়। আর তার কোনও প্রয়োজন আছে বলেও এই প্রতিবেদকের মনে হয় না। মানব-অধিকারের ধ্বজাধারী হোয়াইট হাউসের পান্ডাদের আসল চেহারাটি নিশ্চয়ই এসব কথা জানার পর সকলের কাছেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। এই নিবন্ধের গোড়ায় উত্তর কোরিয়ার সরকারি সংস্থায় যে রিপোর্টের কথা উল্লেখ করেছি তাতে মার্কিন দেশকে জীবন্ত নরক (living hell) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। উত্তর কোরিয়ার শাসকদের অনেক কাজেরই আমরা সমালোচনা করি। কিন্তু তাদের এই মন্তব্যটিকে যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হয়।

নিজেদের দেশে পদে পদে মানবাধিকারকে এভাবে পদদলিত করার পরও যখন মার্কিন-প্রভুরা অন্যদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে তুলকালাম করেন তখন তাদের প্রকৃত চেহারাটি আসলে কী তা নিশ্চয়ই বলার প্রয়োজন নেই। তবে সবশেষে এই প্রসঙ্গে অন্য একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই। রবার্ট জেমস ফিশার (যিনি ববি ফিশার নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ) ১৯৭২ সালে ২৪ বছরের সোভিয়েত একাধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হন। পরে নানা কারণে এই কিংবদন্তী দাবাড়ু দেশ (অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) ছেড়ে চলে যান। মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে এক সাক্ষাৎকারে এই প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্বটি বলেন : দুনিয়ার মানুষের হিতার্থে সর্বাগ্রে প্রয়োজন হোয়াইট হাউসের ভণ্ডগুলোকে কবরে পাঠানো। ববি ফিশার যে অকারণে এ মন্তব্য করেন নি তা আশা করি সকলেই মেনে নেবেন।

সূত্রাবলী

১। North Korea Releases List of U.S. Human Rights Abuses : 'The U.S. is a living hell.'- The Washington Post- May 02, 2014

২। এই মন্তব্যটি বিজেপি নেতা তথাগত রায়ের। সম্ভবত ২০০২ সালে *দেশ* পত্রিকার একটি সংখ্যায় তাঁর এই নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়। নিবন্ধের শিরোনাম : আমেরিকা কি বিশ্বের নিয়ন্তা? এই ঘটনার বছর দুই বাদেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ-অর্লিন্সে আছড়ে পরে হ্যারিকেন ক্যাটারিনা নামক সামুদ্রিক ঝড়, যা তথাগত রায় মহাশয়ের সৃষ্ট সমস্ত অতিকথনগুলিকে গুঁড়িয়ে দেয়। ২০০৮ এর অর্থনৈতিক বিপর্যয় মার্কিন দেশকে আরও বে-আব্রু করে দেয়।

৩। U. N. Human Rights Committee Finds U.S. in Violations on 25 Counts, Adam Hudson : Truthout News Analysis.

৪। C.I.A. Torture Report Sparks Alert, *The Telegraph*; Orissa Edition, Dec 10, 2014

৫। Bush Knew about Tortures, Insists C.I.A., *The Telegraph*, Orissa Edition, Dec 12, 2014

৬। ফার্গুসন কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ৪ ডিসেম্বর, ২০১৪

৭। Woman Handcuffed, Detained & Strip-searched on Tenth Anniversary of 9/11, Files Lawsuit Against Racial profiling, Kevin Gosztota, January 22, 2013

৮। Backed by ACLU. Ohio Woman Strip- searched at Detroit Airport Sues FBI in Alleged Ethnic Profiling, Carlos Kuruvilla; *New York Daily News*, January 24, 2014

৯। ৩ নং সূত্রের অনুরূপ

১০। দেবযানী উপাখ্যান : ভারত-মার্কিন সঙ্ঘাত, সুদীপ্ত সেন, *অনীক*, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১৪

১১। On the Way to Solitarity, Women in Massachusets Jail Get Strip-searched and Videotaped -Victoria Law, May 2014

১২। Women Jail Allowed Male Guards to Videotape 274 different strip-searches

১৩। ১১নং সূত্রের অনুরূপ

১৪। ১১নং সূত্রের অনুরূপ

১৫। Supreme Court Ruling Allows Strip-searches for Any Arrest, Adam Liptak, April 2, 2012

১৬। The Sexual Sadism of the Michigan Department of Corrections : Kevin Gosztola, April 12, 2012.

* এই সূত্রগুলি ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, ১ এবং ৩ নং সূত্রের জন্য Human Rights Violation in the USA, ৭ এবং ৮ নং সূত্রের জন্য Airport Strip-Search, ১১নং সূত্রের জন্য U.S. Supreme Court on Strip-search এবং ১২, ১৩ ও ১৭ নং সূত্রের জন্য Prison Strip-searches শিরোনামে দেখতে হবে।

সময়

রাণা চট্টোপাধ্যায়

সময় রাখেনা মনে সেই অরন্ধন
ভোলায় সমস্ত স্মৃতি
খরস্রোতা নদীর বাঁকে চকিতে দেখা
কিশোরী হরিণীর চোখের কাজল
ভালবাসা প্রীতি
দুয়ারে আগল মা'র মুখ
ঝঞ্ঝাময় দলমাদল।
মানব বন্ধন।

বহুদিন পর ফিরে এসে যদি
পুরোনো ঘড়ির দিকে চাই-
হারানো কষ্ট ছাড়া নিরবধি
কিছু আর নাই।
এমনকি সেদিনের নবোঢ়া বধূটিও
ভুলে গেছে বাসরের স্মৃতি
জরাগ্রস্থ মৃত্যুপথে আমার সন্ততি
ছিঁড়ে দিয়ে গেছে বুঝি পুরোনো বন্ধন,
হাহাকার সেতারের ঝালা হয়ে তুলেছে ক্রন্দন,
সময় রাখেনা মনে কাউকে কখনো
খরস্রোতা নদী বয় কটি ঢেউ গোনো?

দাহনপর্ব

বিশ্বনাথ গড়াই

আবার সূর্যোদয়? আবার নতুন আঁচ?
আলপথ জুড়ে ঝিকিয়ে উঠেছে আধভাঙা যত কাঁচ!
উন্নয়নের আমিষগন্ধী বাঁকে
লাফ দিয়ে নেমে শৃগালেরা এক ফাঁকে
গোগ্রাসে সাফা করেছে মাংস, মজ্জা এবং হাড়—
বন্ধ সকল দ্বার—
কণ্ঠ যখনি চিৎকার করে, মানি না
কণ্ঠে যখন উপচায় গাঢ় ঘৃণা—
কলিজায় সোজা ঢুকেছে তীক্ষ্ম ছুরি
আমাদের ছিল যত উত্তরসূরি
সেই থেকে চুপ, অন্ধ তখনই দু'চোখ—
বৃক্ষ জেনেছে শাখাপ্রশাখায় ঝরাপাতাদের শোক
জনহীন গ্রাম, নিঝ্‌ঝুম চরাচরে
জননীটি একা, বুলেটবিদ্ধ ছেলে যদি ফেরে ঘরে!

বিচ্ছিন্নতা

কোয়েল সাহা

কারও কোন মাথাব্যথা নেই
রাষ্ট্রশক্তির ভাষণ কাপালিকরা
দরোজার সামনে সমবেত,
মার্চগার্ড শুরু করেছেন;
আমি দরোজা বন্ধ করে দিয়েছি।
এখন শীতের মরসুমের শুরু
সোনালি নরম রোদ
আমার বিছানায় এসে পড়ে
প্রতিটি ভোর ভয়ে ঠান্ডা করে দেয় আমাকে।
আমি একা, বিচ্ছিন্ন
আমার বেড়ে ওঠা আদর্শের চারাগাছ।
অনেক কিছুর মতো আমার জানাচেনা
মানুষগুলো ইদানিং, বহুবিভক্ত
টুকরো টুকরো, আর আমিও
একটা টুকরো হয়ে গেছি।

প্রতিস্পর্ধী

অজয় সেন

কালবেলা
দীর্ঘ... দীর্ঘতর জানি,
তবুও তো
রাত্রি শেষ হয়
ভোরের কুয়াশা কাটে;

উজানে
মাছের মত দুরন্ত জীবন
স্রোতের বিরুদ্ধে চলে
কথা বলে ফের,

তবুও কী শুরু হয়
আমাদের—
নিষুপ্তি ছিন্নভিন্ন
ইঙ্গিত আলোর সংঘাত!

আভাসেই তো ইষ্ট নয়
সফেন ওষ্ঠময়—
যা সোচ্চার;

সময়ের নির্ভীক বিশ্বাস

প্রবন্ধ

উনিশ শতকের একটি বিস্মৃতপ্রায় ছাত্র আন্দোলন

অশোক চট্টোপাধ্যায়

উনিশ শতকের আশির দশকের প্রথম দিকে ইলবার্ট বিলকে কেন্দ্র করে সমসময়ের বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত জনমহল রীতিমতো আলোড়িত হয়েছিল। বাংলার বড়লাট রিপন সাহেব ইলবার্ট বিলের সপক্ষতা করায় তিনি স্বদেশীয় মহলে তীব্র সমালোচিত হচ্ছিলেন। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'নেভার নেভার' শীর্ষক কবিতায় লিখেছিলেন ঃ 'হুঁশিয়ার ইলবার্ট দেখো হে রিপন লাট/সাহেব-রক্ষিণী সভা সংগঠিত হয়েছে।' প্রকৃতপক্ষেই বাংলার ছোটলাট অ্যাসলি ইডেন এই বিলের পক্ষে থাকলেও তাঁর পরবর্তী ছোটলার্ট রিভার্স অগাস্টাস এই বিলের বিপক্ষতাকারীদের মদত দিয়েছিলেন। ইলবার্ট বিলের অন্যতম বিরুদ্ধতাকারী ছিলেন বিচারপতি নরিস স্বয়ং।

ইংলন্ডে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে গ্ল্যাডস্টোনের নেতৃত্বে উদারনৈতিকেরা বিজয় অর্জন করায় উপনিবেশ শাসিত এদেশেও তার প্রভাব পড়ে। গ্ল্যাডস্টোন ভারতে রক্ষণশীলদের অপশাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। এবং এই উদারনীতিবাদীদের মুখপাত্র হিসেবেই রিপন এদেশে আসেন। স্বভাবতই রিপনের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রস্তাবিত ইলবার্ট বিল, যা ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি রিপনের নির্দেশে তাঁর আইন সচিব, ভারত সরকারের পক্ষে, সিপি ইলবার্ট প্রস্তাবাকারে পেশ করেন। এই প্রস্তাবিত বিল এদেশের অনুদার য়্যুরোপীয় এবং অ্যাংলো ইন্ডিয়ানমহলকে আলোড়িত করে। যেহেতু এই বিলে ভারতীয় ও ইংরেজদের মধ্যে 'বর্ণ বৈষম্যজনিত অধিকারবোধ দূর করার' এবং এদেশীয়দের প্রতি কিছু প্রশাসনিক সুবিধাদানের প্রস্তাব ছিল, রক্ষণশীলরা এই বিলের বিরোধিতায় সোচ্চার হন। এই বিলের বিরোধিতা করতে গিয়ে তাঁরা এদেশীয়দের এবং তাদের ধর্মের বিরুদ্ধে কুৎসাও করতে থাকেন। এই কুৎসাকারীদের অন্যতম ছিলেন বিচারপতি নরিস এবং ব্রানসন। ব্রানসন ঢাকায় গিয়ে 'হিন্দুদের ধর্মমত আচার-ব্যবহার'-এর নিন্দে করে বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতাটি অত্যন্ত 'জাতিবিদ্বেষ-মূলক' বলে বিপিনচন্দ্র পালের মনে হয়েছিল। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি কলকাতার টাউনহলে অনুষ্ঠিত এক সভায় এই রক্ষণশীলরা এই আশঙ্কা ব্যক্ত করেন যে এই বিলের মাধ্যমে য়্যুরোপীয়দের এতদিনের ভোগ-করে-আসা সুযোগসুবিধা হরণ করা হচ্ছে, এই বিল কার্যকর হলে এদেশে ইংরেজদের স্বার্থ বিপন্ন হয়ে পড়বে। এসময় রিপন সিমলায় যান। তাঁর অনুপস্থিতিতে রক্ষণশীলরা তাঁদের আন্দোলন জোরদার করতে থাকেন। রিপন যখন সিমলা থেকে ফিরে আসেন, সেসময় এঁরা রিপনকে যে শুধু অপমান করেন তাই নয়, এমনকি তাঁরা রিপনকে জোর করে ইংলন্ডে পাঠিয়ে দেবার চক্রান্তও করেছিলেন।

এই বিল নিয়ে যখন তুমুল চর্চা চলছে, সেই সময় এই ইলবার্ট বিলের অন্যতম বিরোধী বিচারপতি নরিস আদালতে হিন্দুদের পূজ্য শালগ্রাম শিলা এনে তার সামনে সাক্ষীদের সাক্ষ্য দেওয়ার ফরমান দেন। এভাবে তিনি হিন্দুধর্মকে আদালতে তুলে এদেশীয়দের ভাবাবেগে আঘাত করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পিতা ভুবনমোহন দাশ সম্পাদিত 'বেঙ্গল পাবলিক ওপিনিঅন' পত্রিকায় এই সংবাদটি প্রকাশিত হয়। ভুবনমোহন ছিলেন সেসময়ের একজন প্রথিতযশা অ্যাটর্নি। সুতরাং তাঁর পত্রিকায় প্রকাশিত এই সংবাদের সত্যতা সম্পর্কে সন্দিহান হওয়ার কোন যুক্তি ছিল না। তাছাড়া কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে নরিস ভারতীয়দের আখচার 'মিথ্যেবাদী' বলতেন এবং প্রকাশ্যে য়্যুরোপীয়ানদের পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করতেন। 'দ্য বেঙ্গলি' পত্রিকার মার্চ ৩, ১৮৮৩ তারিখের সংখ্যায় লেখা হয়েছিল যে এক পুরস্কার বিতরণী সভায় নরিস সরাসরি বলেছিলেন ঃ তাঁর অভিজ্ঞতায় তিনি দেখেছেন যে এদেশের লোকেরা প্রতি দিন, ঘণ্টা, মিনিটে মিথ্যে বলতে অভ্যস্থ! নরিসের এ ধরনের আচার-আচরণে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলাই বাহুল্য, বিরক্ত বোধ করতেন। কিন্তু শালগ্রাম শিলা নিয়ে তাঁর এ ধরনের বেয়াদবি সুরেন্দ্রনাথের সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছিল। তাঁর 'দ্য বেঙ্গলি' পত্রিকার এপ্রিল ২, ১৮৮৩ তারিখের সংখ্যায় তিনি 'বেঙ্গল পাবলিক ওপিনিঅন' পত্রিকার সংবাদের ভিত্তিতে লেখেন ঃ

> কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিরা আমাদের কাছে যথেষ্ট সম্মানের পাত্র ছিলেন, কিন্তু এখন এমন একজন বিচারপতি ওই সম্মানীয় পদটি অলংকৃত করছেন, যিনি প্রকৃতপক্ষে ওই পদের যোগ্য নন, বরং তাঁর কাজকর্মে কুখ্যাত জেফ্রেজ ও স্করগস-এর কথা মনে পড়ে যায়।

সুরেন্দ্রনাথ আর লেখেন ঃ

> বিচারপতি শ্রীনরিস হুগলীতে আগুন জ্বালাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মহামান্য বিচারপতির তরফে শেষ জব্বরদস্তিমূলক কর্মটি হল একটি শালগ্রাম শিলাকে পাথরের বিগ্রহকে সনাক্তকরণের জন্য আদালতে আনয়ন। পূর্বের সর্বোচ্চ আদালতে এবং বর্তমানের উচ্চ আদালতে হিন্দু বিগ্রহের জিম্মা নিয়ে বিস্তর মোকদ্দমা হয়েছে। কিন্তু ইতিপূর্বে কখনো হিন্দু গৃহস্থের গৃহদেবতাকে আদালতে টেনে আনা হয়নি।

আমাদের কলকাতার দানিয়েল বিগ্রহটি দেখে বলেন যে এটি কিছুতেই একশ' বছরের পুরাতন হতে পারে না। তাহলে বিচারপতি শ্রী নরিস শুধু আইন ও ওষধি বিষয়ে পারঙ্গম তাই নয়, তিনি হিন্দু বিগ্রহের এক একজন সমঝদারও বটে।...

...সুরেন্দ্রনাথের 'দ্য বেঙ্গলি' পত্রিকায় এই মন্তব্য প্রকাশিত হলে বিচারপতি নরিস অত্যন্ত কুপিত হন এবং পত্রিকার সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথকে আদালত অবমাননার দায়ে ৫ মে আদালতে হাজির হওয়ার শমন পাঠান। শমন জারি হয় ৩ মে তারিখে।

প্রসঙ্গত স্মরণ থাকতে পারে যে ইংলন্ড থেকে ফিরে আনন্দমোহন বসু ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে ছাত্র সংগঠন গড়ে তুলতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। আর এই সংগঠনের প্রধান মুখ ছিলেন স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আনন্দমোহন বম্বে শহরে গড়ে-ওঠা ছাত্র আন্দোলন দেখে কলকাতায় এসে এখানেও একটি ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা করেন। বাংলার তরুণ ছাত্রদের মনে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও উজ্জীবনের লক্ষ্যে সুরেন্দ্রনাথ, শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন প্রমুখ সচেষ্ট হন। এর পরিণতিতে গড়ে ওঠে ক্যালকাটা স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন। এই ছাত্র সংগঠনের সভাপতি হন আনন্দমোহন, সহ-সভাপতি হন সুরেন্দ্রনাথ এবং সম্পাদক হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নন্দকৃষ্ণ বসু। এই ছাত্র সংগঠনের প্রধান মুখ হিসেবে সুরেন্দ্রনাথ জনপ্রিয় ছাত্রনেতা হয়ে ওঠেন। সুরেন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল ঃ দেশের রাজনৈতিক চিন্তার অগ্রগতির লক্ষ্যে যুবসমাজের জাগরণ ঘটানো দরকার, রাজনীতি-বিমুখতা থেকে তাদের ফিরিয়ে আনা দরকার, বিপদের ঝুঁকি নিয়ে লড়াই করার যে দৃষ্টান্ত ইতিহাসে মেলে তাঁর সঙ্গে তাদের পরিচিত করা দরকার - আর এই জায়গা নিয়ে থেকে তিনি ছাত্রদের নিয়ে সংগঠন গড়তে উদ্যোগী হন বলে তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন। বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন ঃ

> এই কলিকাতা ছাত্রমণ্ডলীর বা স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন-এর রঙ্গমঞ্চেই সর্বপ্রথমে সুরেন্দ্রনাথের অসাধারণ বাগ্মীপ্রতিভা প্রকাশিত এবং প্রতিষ্ঠিত হয়, হিন্দু কলেজের একটা গ্যালারী ছিল ... বর্তমান সংস্কৃত কলেজের পশ্চিমের ঘরে এই গ্যালারীটা ছিল। এখানেই কলিকাতা স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েসনের সভা হইত।.. এই রঙ্গমঞ্চেই সুরেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম আপনার আলোকসামান্য বাগবিভূতি বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রথম বক্তৃতার কথা এখনও মনে আছে। বিষয় ছিল —'রাইজ অব দ্য শিখ পাওয়ার ইন ইন্ডিয়া'; ইহার পূর্বে ইংরাজী নবীশ বাঙ্গালী রাষ্ট্রীয় বিষয়ে এমন বক্তৃতা শুনে নাই।... সুরেন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম শিখ ইতিহাসের প্রাণোন্মাদিনী স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী আমাদের নিকট উপস্থিত করেন। তাঁহার এই প্রথম বক্তৃতাকালে কলিকাতার গোলদিঘীর চারিদিকে ঘন ঘন করতালি ধ্বনিতে বহিরাকাশে যেমন একটা ঝড় উঠিয়াছিল, সেইরূপ কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমন্ডলীর অন্তরেও একটা অভূতপূর্ব ভাবের বন্যা ছুটিয়াছিল। ...সুরেন্দ্রনাথের এই বক্তৃতা বাংলার নবযুগের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা।

স্বভাবতই এই জনপ্রিয় ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে যখন আদালতে শমন জারি হয়, তখন ছাত্রসমাজ আলোড়িত হবে, এটাই স্বাভাবিক। তাঁর আত্মজীবনীতে সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ ২ মে শমন জারি হয়, আর ৫ মে শুনানির দিন। একদম সময় নেই। এর মধ্যে ব্যারিস্টার যোগাড় করাও কঠিন। মনমোহন ঘোষ অসুস্থ। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আমার পক্ষে দাঁড়াতে রাজি হলেন তবে বললেন আমি যেন বিচারক নরিসের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে নরিসের বিরুদ্ধে আমার পত্রিকার বক্তব্য প্রত্যাহার করে নিই।... সুরেন্দ্রনাথ তা করলেও নরিস পিছু হঠেন নি। ৫ মে সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ সরন্দ্রেনাথ আদালতে হাজির হন। তখন আদালত প্রাঙ্গন জনসমুদ্রের রূপ নিয়েছে। বলাইবাহুল্য এর অধিকাংশই ছিল ছাত্র। আদালতে ফুলবেঞ্চের পাঁচজন বিচারকের মধ্যে একজনই ছিলেন বাঙালি, রমেশচন্দ্র দত্ত। চারজন ইংরেজ বিচারই সুরেন্দ্রনাথকে কারাবাসের দণ্ড দেবার পক্ষপাতী। কেবল রমেশচন্দ্র তার বিরোধিতা করেন। সুরেন্দ্রনাথের অপরাধের শাস্তি হিসেবে তিনি জরিমানার কথা বলেন। কিন্তু অধিকাংশ বিচারকের রায় অনুযায়ী সুরেন্দ্রনাথের দুই মাসের কারাদণ্ড হয়। এই সংবাদ পাওয়ামাত্র ছাত্রদের মধ্যে তুমুল ক্ষোভের সঞ্চার হয়। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে তাঁর শাস্তির খবর বাইরে আসা মাত্র ছাত্ররা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। চিরাচরিত পদ্ধতিতে তারা আদালতের জানলার কাচ ভেঙে দেয়, পুলিশের দিকে ইট ছুঁড়তে থাকে। আন্দোলনকারী ছাত্রদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যিনি কিনা উত্তরকালে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ অলংকৃত করেছিলেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছাত্র আন্দোলনের নেতা হিসেবে এই ভূমিকা উত্তরকালে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জীবনীগ্রন্থে স্বীকৃত হয় নি। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত প্রখ্যাত অধ্যাপক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ প্রণীত 'আশুতোষ মুখার্জী আ বায়োগ্রাফিক্যাল স্টাডি' শীর্ষক গ্রন্থে এই তথ্যের উল্লেখ নেই।

সুরেন্দ্রনাথের কারাবাসের আদেশের খবর প্রচারিত হওয়ার পর কলকাতার দোকানপাট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, শহরের সমস্ত

ব্যবসাদার তাঁদের ব্যবসা সেদিনের মত বন্ধ রেখেছিলেন, কলকাতা ও সন্নিহিত এলাকার মানুষজনের মনে একটা অভূতপূর্ব আবেগ সঞ্চারিত হয়েছিল। ছাত্রদের মধ্যে অনেককেই বিলাপরত অবস্থায় দেখা গিয়েছিল। এই কারাবাসের আদেশের প্রতিবাদে কলকাতার টাউনহলে এক প্রতিবাদী সামবেশের ডাক দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টাউনহলে সভার অনুমতি পাওয়া যায়নি। প্রকাশ্য স্থানে যে জনসমাবেশ হয়েছিল, তা অভূতপূর্ব, কেননা মানুষের সমাগমে সমস্ত এলাকা এমনকি বাজারের জায়গাও পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এই প্রতিবাদী জনসমাবেশে কুড়িহাজার মানুষের সমাগম হয়েছিল এবং এই সমাবেশ সফল করতে ছাত্রদের অক্লান্ত পরিশ্রম অবিস্মরণীয়। সুরেন্দ্রনাথের কারাবাস একটা নতুন ধরনের জাতীয় ভাবাবেগের জন্ম দিয়েছিল।

সুরেন্দ্রনাথের কারাবাসের আদেশের পর 'ত্রিপুরা বার্তাবহ' পত্রিকা তার ১২ আষাঢ় ১২৯০ বঙ্গাব্দের সংখ্যায় লিখেছিল ঃ

> ...সুরেন্দ্রর বিচারে হাইকোর্ট যে সরাসরি বিচার ক্ষমতার পরিচালনা করিয়াছেন, তাহা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার ভয়ানক পরিপন্থী ও দেশের সাংঘাতিক অমঙ্গলকর।... বেঙ্গলী সম্পাদক নিজে শালগ্রাম মানে না, তাই বলিয়া হিন্দু সাধারণের মাননীয় শালগ্রামের অপমান দেখিয়া প্রতিবাদ করিবে না ইহা অপেক্ষা পত্র সম্পাদকের পক্ষে আর কুতর্ক কি হইতে পারে?

শালগ্রাম শিলা আদালতে নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদে 'হিন্দু রঞ্জিকা' পত্রিকা 'তীব্রবাক্য প্রয়োগ' করায় সম্পাদকের নামে আদালতে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। এই ঘটনাকে 'ত্রিপুরা বার্তাবহ' নরিস সাহেবের 'এদেশে ভীতির জীবন্ত মূর্তি আনয়ন' সদৃশ বলে মন্তব্য করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের কারাবাসের প্রতিবাদে ছাত্রসমাজ যেভাবে জঙ্গি আন্দোলনে সামিল হয়েছিল, ভাঙচুর ও পুলিশের দিকে ইটপাটকেল ছুঁড়ে তাদের পুঞ্জিত বিক্ষোভের প্রকাশ ঘটিয়েছিল, তাতে করে ব্রিটিশ সরকার ছাত্রদের ওপর কুপিত হন। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের ২২ এপ্রিল তারিখের 'ভারতমিহির' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল ঃ

> বাংলা সরকার ছাত্রদের ওপর খুব অসন্তুষ্ট। সুযোগ পেলেই নৈতিকতা শিক্ষা দেয়ার নামে তাদের ওপর একহাত নিতে কসুর করেন না। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময় থেকেই ছাত্ররা সরকারের চক্ষুশূল হয়ে উঠেছে। সে সময় থেকে তাদের ওপর নিষ্ঠুর আচরণ করা হচ্ছে। ঢাকার জন্মাষ্টমী এবং চাটগাঁর দিওয়ালীর সময় তাদের ভেড়ার মত পেটানো হয়েছে। ছাত্রদের প্রতি এহেন ব্যবহার জনমনে সৃষ্টি করেছে আশঙ্কার।

ছাত্রদের প্রতি পুলিশের এহেন আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গী বর্তমান সময়ের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলন এবং তার মোকাবিলায় পুলিশি নৈতিকতার কথা মনে করিয়ে দেয়। সুরেন্দ্রনাথকে কারাদণ্ড দেবার প্রতিবাদে সেদিন আদালত প্রাঙ্গনে সমবেত ছাত্ররা ভাঙচুর ও পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুঁড়লেও পুলিশ সেই জঙ্গি ছাত্র আন্দোলন দমন করতে কী ব্যবস্থা নিয়েছিল, সেকথার উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে সুরেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীপাঠে এটুকু জানা যায় যে আদালতে চত্বরের আইন ভেঙ্গে জঙ্গি আন্দোলন করার কারণে জনৈক 'যুবককে' (অর্থাৎ এক ছাত্রকে) পুলিশ গ্রেপ্তার করে এক সপ্তাহ কারারুদ্ধ করে রেখেছিল। প্রেসিডেন্সি জেলে সেই বন্দি ছাত্রটির সেল-টি ছিল সুরেন্দ্রনাথ-এর ঠিক উল্টো দিকে। সে প্রতিদিন সকালে নানাভাবে সুরেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁকে প্রণাম জানাতো। এই ছাত্রটি পরবর্তীকালে একজন সাব-রেজিস্ট্রার হয়েছিলেন।

সাজা ঘোষণার পর সুরেন্দ্রনাথকে যখন প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে যাবার জন্যে গাড়িকে তোলা হয়, তখনও আদালত চত্বরে, রাস্তায় এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে হাজার হাজার ছাত্র সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের উত্তেজিত মানুষ দাঁড়িয়েছিলেন। আবার কোনও ঝামেলা হতে পারে এই আশঙ্কায় সুরেন্দ্রনাথকে একটি প্রাইভেট গাড়িতে করে বিচারকদের প্রবেশপথ দিয়ে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়।

'দ্য স্টেটসম্যান' পত্রিকা সুরেন্দ্রনাথের এহেন বিচারপদ্ধতির সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিল। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ৮ মে তারিখের সংখ্যার 'দ্য স্টেটসম্যান' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল ঃ বেঙ্গলি পত্রিকার সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আদালতে ডেকে পাঠিয়ে শাস্তি ঘোষণা করে কারাগারে পুরে দেওয়ার ঘটনা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হস্তক্ষেপ বই কিছু নয়। এ ধরনের আদালত অবমাননা আগে যখন ইংরেজ সম্পাদকের তরফে সংগঠিত হয়েছে, তখন আদালত এ ধরনের ব্যবস্থা নেয়নি, এখন নিচ্ছে তার কারণ কি এই যে সুরেন্দ্রনাথ বাঙালি? স্টেটসম্যান পত্রিকা লিখেছিল, আপত্তিকর কিছু লেখা তার জন্যে সম্পাদকের শাস্তি হতে পারে, তবে তা যেন যথাযথ নিয়ম মেনেই হয়। আদালত নিশ্চয়ই তার এক্তিয়ারের বাইরের গিয়ে কিছু করবে না। সুরেন্দ্রনাথকে আদালতে ডেকে পাঠিয়ে শাস্তি দেওয়াটা কি লিখিত আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেই হয়েছে? যদি তা না হয়ে থাকে তবে এরপর কোন পত্রিকা-সম্পাদকের পালা, এমন প্রশ্নের অবকাশ কিন্তু থেকেই যায়।

দুমাস কারাবাস করার পর ৪ জুলাই সুরেন্দ্রনাথ মুক্তিলাভ করেন। সুরেন্দ্রনাথকে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারেও পুলিশ অনেক নাটক করেছিল। সুরেন্দ্রনাথের মুক্তি উপলক্ষে প্রেসিডেন্সি জেলের সামনে বহুসংখ্যক গাড়ি ও ফুলের মালা নিয়ে হাজার হাজার ছাত্রজনতা জড় হয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের মুক্তি উপলক্ষে এই অভূতপূর্ব জনসমাবেশ দেখে পুলিশ বাস্তবিক ভয়

পেয়ে গিয়েছিল। সাধারণত সকাল ছটায় বন্দিমুক্তি হয়ে থাকে। সুরেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও এই নিয়মই প্রযোজ্য হওয়ার কথা। কিন্তু পুলিশ ভোর চারটের সময় তাঁকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে একটা 'টিক্কা গাড়ি'তে বসিয়ে প্রায় সারা কলকাতা ঘুরিয়ে ঠিক সকাল ছটার সময় তাঁকে 'বেঙ্গলি' পত্রিকার অফিসে পৌঁছে দেয়। এরপর যখন উপস্থিত জনতা জানতে পারে যে সুরেন্দ্রনাথকে পুলিশ তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসেছে, তখন তাদের মধ্যে ক্ষোভ ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। তারা অবশ্য কোনো ঝামেলা না করে বেঙ্গলি পত্রিকা অফিসের পথে রওনা দেন। এরপর সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর এক সমারোহের আয়োজন করা হয়। সমসময়ের 'ত্রিপুরা বার্তাবহ' ১২৯০ বঙ্গাব্দের ২৬ আষাঢ় সংখ্যায় লিখেছিল ঃ

> ...সুরেন্দ্রবাবু প্রথমতঃ, স্বীয় প্রেসিডেন্সি স্কুলে গমন করেন, তথাকার ছাত্র ও শিক্ষকগণ তাঁহাকে পাইয়া পরম হর্ষ প্রকাশ করিয়া ইংরেজিতে এক অভিনন্দনপত্র প্রদান করে। এই স্থান হইতে তিনি ফ্রি চার্চ ইন্সটিটিউশন নামক কলেজে গিয়াছিলেন, এই বিদ্যালয়ে সুরেন্দ্রবাবু একজন অধ্যাপক তথাকার ছাত্র ও মিসনরিগণও সুরেন্দ্রবাবুকে পাইয়া যথোচিত হর্ষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তালতলার ছাত্রগণ ইতিপূর্বেই সুরেন্দ্রবাবুর জন্য যথেষ্ট সমোরোহের উদযোগ করিয়াছিল তথায় তাহার নহবৎ বাজাইয়া ও নিশানাদি তুলিয়া সুরেন্দ্রবাবুকে অভ্যর্থনা করে।

প্রসঙ্গত স্মরণ থাকতে পারে যে, সুরেন্দ্রনাথের কারামুক্তির দিন প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল। সেই বৃষ্টির মধ্যেই পুলিশ বৃষ্টি -উপেক্ষা করে সমবেত হাজার হাজার মানুষের চোখ ফাঁকি দিয়ে সুরেন্দ্রনাথকে নিয়ে প্রেসিডেন্সি জেল চত্বর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথের কারামুক্তির দিনটি, অর্থাৎ ৪ জুলাই ছিল আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস। স্বভাবতই এই দিনে সুরেন্দ্রনাথের কারামুক্তিতে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য জনসাধারণ বিশেষত ছাত্রসমাজ উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল।

সুরেন্দ্রনাথ ছাত্রদের প্রিয় নেতা ছিলেন। 'ছাত্রসমাজ ...তাঁহার (সুরেন্দ্রনাথের) কথায় উঠে বসে। এহেন সুরেন্দ্রনাথের কারাবরণে যদি জনসমাজ বিক্ষুব্ধ না হয় তবে কিসে হইবে?' একদম ঠিক কথা। কিন্তু একটা সময় ছাত্র-যুব সম্প্রদায়ের প্রিয় এবং পরম শ্রদ্ধেয় নেতা, এক সেময়ের 'সারেন্ডার নট' নামে বিশেষিত হওয়া সত্ত্বেও সুরেন্দ্রনাথ কিন্তু শেষ পর্যন্ত পথান্তরী হয়েছিলেন। যে ইংরেজ সরকার একসময় তাঁকে চাকরিবিচ্যুত করেছিল, তাঁকে কারারুদ্ধ করেছিল, সেই ইংরেজ সরকারই আবার তাঁকে 'স্যর' উপাধি দিয়েছিল। সেই ইংরেজ সরকারের মন্ত্রিও হয়েছিলেন তিনি। বিদেশি ইংরাজ সরকারের এই বদান্যতায় তিনি যারপরনাই প্রীত ছিলেন। এক সময় তিনি ছাত্রদের জাতিয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার, রাজনীতি-বিমুখীনতার বিপরীতে রাজনীতি সচেতন করার এবং ঝুঁকি নিয়ে লড়াই করার মানসিকতা তৈরির জন্য বিভিন্ন দেশের ইতিহাস থেকে নজির আহরণ করে তাদের শিক্ষিত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। অথচ উত্তরকালে তিনি তাঁর মত-পথ পরিবর্তন করেছিলেন। সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার রাজনীতিতে স্বদেশপ্রেমের নতুন ব্যাখ্যার উদ্ভাবক হয়েছিলেন, একদা ছাত্র আন্দোলনের নেতা শেষপর্যন্ত অতীত আর বর্তমানকে এক বিন্দুতে মেলানোর ব্যর্থ প্রয়াসে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

সহায়ক গ্রন্থ

১। যোগেশচন্দ্র বাগল ঃ জাতিবৈর বা আমাদের দেশাত্মবোধ। এস কে মিত্র অ্যান্ড ব্রাদার্স। কলকাতা। ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ সংস্করণ।
২। বিপিনচন্দ্র পাল ঃ চরিতচিত্র। যুগযাত্রী প্রকাশক লিমিটেড। কলকাতা। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ সংস্করণ।
৩। বিপিনচন্দ্র পাল ঃ আমার জীবন ও সমকাল (প্রথম পর্ব)। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ। কলকাতা। ১৯৮৫ সংস্করণ।
৪। বিনয় ঘোষ ঃ বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা। প্রকাশ ভবন। কলকাতা। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ সংস্করণ।
৫। মুনতাসীর মামুন ঃ উনিশ শতকে বাংলার সংবাদ ও সাময়িকপত্র (দ্বিতীয় খণ্ড)। বাংলা একাডেমী ঢাকা। ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ সংস্করণ।
৬। প্রাগুক্ত। দ্বাদশ খণ্ড। অনন্যা। ঢাকা। ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ সংস্করণ।
৭। এন কে সিনহা ঃ আশুতোষ মুখার্জী। আ বায়োগ্রাফিক্যাল স্টাডি। আশুতোষ মুখার্জী সেন্টিনারি কমিটি। কলকাতা। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ সংস্করণ।
৮। হেমচন্দ্র সরকার ঃ আ লাইফ অব আনন্দমোহন বোস। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। কলকাতা । ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ সংস্করণ।
৯। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ঃ আ নেশন ইন মেকিং। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ সংস্করণ।
১০। মোহিত মৈত্র ঃ আ হিস্টরি অব ইন্ডিয়ান জার্নালিজম। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি। কলকাতা। ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ সংস্করণ।
১১। দ্য স্টেটসম্যান (কম্পাইল্ড বাই নিরঞ্জন মজুমদার)। দ্য স্টেটসম্যান লিমিটেড। কলকাতা। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ সংস্করণ।

প্রবন্ধ

'গুরু একজন নয়, গণসমষ্টি'

হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও গানের বাহিরানা

আনু মুহাম্মদ

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সঙ্গে পরিচয়ের আগেই তাঁর গানের সাথে আমাদের যোগাযোগ হয়েছে, সেগুলো আমাদের সক্রিয়তার অংশই ছিল। তাঁর সঙ্গে কথা বলার এবং মুখোমুখি তাঁর কণ্ঠে গান শোনার সুযোগ হয়েছিল ১৯৮১ সালে, যখন তিনি বাংলাদেশে এসেছিলেন। সেইসময় অনেকগুলো কর্মসূচিতে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমরা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়েও দলসহ তাঁকে নিয়ে একটা অনুষ্ঠান করেছিলাম। তখন বাংলাদেশ লেখক শিবিরের যে গণনাট্যদল ছিল সেখানে প্রধানত হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গানই গাওয়া হত। সেসময় আজফার আজিজ এবং কামরুদ্দিন আবসার এই গানগুলো আমাদের কৃষক, শ্রমিক ও সাংস্কৃতিক সমাবেশে গাইতেন। এর মধ্যে দিয়েই হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গানগুলো ক্রমে বাংলাদেশে পরিচিত ও জনপ্রিয় হয়। তাঁর বাংলাদেশ সফরের পর এই গানগুলোর পরিচিতি আরও বিস্তৃত হয়। অনেক শিল্পী ও সংগঠনই এই গানগুলোর ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠে।

বর্তমান সময়ে অনেকেই এই গানগুলোর সঙ্গে পরিচিত, হেমাঙ্গ বিশ্বাসের নাম না জেনেও। গানগুলোর মধ্যে 'জন হেনরী', 'ওরা আমাদের গান গাইতে দেয় না', 'কাস্তেটারে দিও জোরে শান', 'শঙ্খচিল', 'শহীদের খুনে রাঙা পথে দেখো হায়েনার আনাগোনা', 'সাম্যের গান গেয়ে রেল চলে', 'আন্তর্জাতিক', 'আরো বসন্ত বহু বসন্ত', 'আজব দেশের আজব লীলা', 'মাউন্টব্যাটেন মঙ্গলকাব্য', 'আমরা তো ভুলি নাই শহীদ' এখনও বাংলাদেশের মানুষের বিভিন্ন লড়াইয়ে, সমাবেশে গাওয়া হয়। এই গানগুলোর কোন কোনটি পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী কথা কিছুটা পাল্টে গেয়েছিলেন আজফার ও আবসার। এখনও তা হয়। এরশাদ স্বৈরশাসনের সময় কিংবা জেল হত্যা কিংবা শ্রমিক নিপীড়নের সাথে এগুলো মেলানো খুবই কার্যকর হয়েছিল। আজফার এখন আর সক্রিয় না থাকলেও বাংলাদেশের বর্তমান সময়ের প্রধান গণসঙ্গীতশিল্পী কামরুদ্দিন আবসার এই গানগুলো জীবন্ত রেখেছেন দীর্ঘদিন। সম্প্রতি তিনি অসুস্থ হয়ে গানের জগৎ থেকে সাময়িকভাবে দূরে থাকলেও তাঁর মাধ্যমেই এই গানগুলো আরও শিল্পীর কাছে পৌঁছেছে। বলাই বাহুল্য, আরও নতুন নতুন গান ও শিল্পী এই ধারায় ক্রমে যুক্ত হচ্ছেন। ভাষা ও সুরেও অনেক বৈচিত্র্য এসেছে, পরীক্ষানিরীক্ষাও চলছে।

২

হেমাঙ্গ বিশ্বাস শুধু শিল্পী, গীতিকার, সংগ্রাহক, সুরকারই নন তিনি গানের একজন তাত্ত্বিকও। 'গানের বাহিরানা' গ্রন্থে অনেকগুলো নতুন ও পুরনো লেখায় তাঁর জনসমষ্টির সঙ্গীত জীবন আর তার সাথে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও গণসঙ্গীতের যোগ বিশ্লেষণ করেছেন। লোকসঙ্গীত হিসেবে পরিচিত সঙ্গীত সমুদ্রের সাথে শহুরে নানা বাণিজ্যিক তৎপরতার পার্থক্যকেও সনাক্ত করেছেন। তিনি বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রাণ ও গান জগতকে অভিন্নরূপে দেখেছেন এবং তাকে আবিষ্কার করেছেন সকল ঘরানার উর্ধ্বে আবার বিভিন্ন ঘরানার সঙ্গে যার যোগও আছে। তিনি বলেছেন, "গায়কীটা জল মাটি হাওয়ার, কিংবা পাহাড় ও উপত্যকার। গুরু একজন নয়— গণসমষ্টি। সুরের লহরের তুলিতে আঁকা সামগ্রিক সমষ্টিজীবনের চিত্রপট থাকে চোখের সামনে। একটি বাদ দিয়ে আরেকটি উপলব্ধি করা যায় না।" হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মতে, "(অখণ্ড) বাংলাদেশের পূর্ববঙ্গের মূল মেলোডি হলো ভাটিয়ালী, উত্তরবঙ্গের তেমনি ভাওয়াইয়া, মধ্যবঙ্গের মূল গীতরীতি হলো বাউল।" তাঁর সিদ্ধান্ত, গণসঙ্গীত ও জনগণের এই প্রাণের সুর ও কথার উপর ভিত্তি করেই বিকশিত হতে পারে।

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের ভাষায়, "লোকসঙ্গীত শুধু অতীত সন্ধানী নয়, লোকসঙ্গীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রতিষ্ঠান।" সেজন্য লোকসঙ্গীত বা নির্দিষ্ট অঞ্চলে পরম্পরায় টিকে থাকা ভাব ভাষা অভিব্যক্তির উপর ভর করেই গণসঙ্গীতের মূল স্রোত তৈরী হয়। সেখানে নতুন যারা শিল্পী আসবেন তাদের এই জগৎকে বোঝার একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থেকে যায়।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস বলেন,

> আমাদের নিবেদনের মুখ্য কথা, লোকসঙ্গীত আয়ত্ত করতে হলে একান্ত হতে হবে। সেটা জীবনে জীবন যোগ করার সমস্যা। উৎপাদক মেহনতী মানুষই লোকসঙ্গীতের স্রষ্টা। যে অন্নদাতা সেই সুরদাতা। যে হাত লাঙলের খুঁটি ধরে, যে হাত নৌকার বৈঠা ধরে, গুণ টানে, যে হাত জাল বোনে, সেই হাতই দোতারা বানায়, সেই হাতেই ঢোলের বোল ওঠে। সেই অবিচ্ছিন্ন জীবন থেকে সুরকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করলে ভুল হতে বাধ্য।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস অসংখ্য লোকশিল্পীদের সৃষ্টির দিকে, তাদের অসাধারণ ক্ষমতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। তিনি দেখেছেন এসব অসাধারণ প্রতিভাধর শিল্পী নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে, সামাজিক অর্থনৈতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একই সুর একই প্রশ্নকে নতুনভাবে প্রকাশ করেন। লিখেছেন,

অর্ধাহার অনাহারের মধ্যেও জনতার মাঝখান থেকে

অসংখ্য শিল্পী তৈরী হচ্ছেন, শহরের সংগীতবিদদের কাছে তাঁরা অজ্ঞাত।... আব্বাসউদ্দীনকে তাঁরা জানেন— জানেন না টেপু মিঞা বা বায়ন শেখদের। শচীন দেব বর্মনকে জানেন, কিন্তু নিরঞ্জন সূত্রধর বা কুনিয়া শীল বা মহানন্দ দাসদের কেউ জানেন না— যাঁরা শচীন দেব বর্মনের চেয়ে অনেক উঁচুদরের লোকশিল্পী। তাই গণপ্রতিভা আবিষ্কারের সাধনা নিয়েই গবেষককে ডুব দিতে হবে জনসমুদ্রে।

জনসমুদ্রে ডুব দিলে, পরম্পরায় খোঁজ নিলে, আমরা দেখি নির্দিষ্ট পরিস্থিতি ছাড়া সরাসরি লড়াইকেন্দ্রিক গণসঙ্গীত সৃষ্টি না হলেও নানাভাবে, ধর্ম-সংস্কৃতি, জীবন-জীবিকা, ব্যক্তির অনুভূতি, প্রেম, নারীর বেদনা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সমাজের বৈষম্য নিপীড়ন বঞ্চনা হাহাকারের প্রতিধ্বনি ঘটে। সুফী ধারার শিল্পী, বাউল শিল্পী যারা সমাজের নিয়ম শাসন কিংবা শাস্ত্রীয় ধর্মের কঠোর দেয়াল থেকে মানসিকভাবে মুক্ত, তাঁদের মধ্যে আমরা তাই প্রতিবাদ, সামাজিক বিধি অমান্য কিংবা বৈষম্যের বিরুদ্ধে কথা ও সুর পাই। লালন ফকির এক্ষেত্রে অগ্রগণ্য। জালাল বা বাউল করিম শাহ সহ বাংলার অসংখ্য শিল্পীর গানে, পালা, যাত্রায়, বচনে, প্রবাদে আমরা এই চেতনার স্বাক্ষর পাই।

আর জনসমাজের সাথে ঘনিষ্ঠ শিল্পীরা তো বিচ্ছিন্নভাবে শিল্পকর্ম নিয়েই ডুবে থাকতে পারেন না। লালনের এক ভিন্ন ও অজানা ভূমিকার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। কাঙ্গাল হরিনাথের অপ্রকাশিত দিনপঞ্জীর সূত্রে তিনি বলছেন,

> কাঙ্গাল হরিনাথের অপ্রকাশিত দিনপঞ্জিতে দেখি সত্যি সত্যি লালন-চরিত্র ভোলা বাউল আবার প্রয়োজন হলে হতে পারেন জাঁদরেল লাঠিয়াল। হাতের একতারাটি রেখে জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লাঠিও ধরতে পারেন। কাঙ্গাল হরিনাথ তার পত্রিকা 'গ্রামবার্তা'য় জমিদারের প্রজানিপীড়নের খবর ছাপানোর জন্য সেই জমিদার যখন কাঙ্গাল হরিনাথকে শায়েস্তা করার জন্য লাঠিয়ালের দল পাঠান, তখন লালন তাঁর দলবল নিয়ে নিজ হাতে সেই লাঠিয়ালের দলকে আচ্ছা করে টিট্ করে সুহৃদ কৃষক-বন্ধু হরিনাথকে রক্ষা করেন।

জাত, পরকালমুখিতা, শ্রেণী বৈষম্য, মানুষের অপমান ধনী জমিদার শোষণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে লালনের অবস্থান খুব স্পষ্ট যদিও তা সবসময় উচ্চকিত নয়। তার অনুগামীদের মধ্যে সবাই যে এই ধারাকে অব্যাহত রেখেছেন তাও নয়। এই জাতপাত ধর্ম ইত্যাদি পরিচয়ের বাইরে মানুষকে সনাক্ত করবার যে অবিরাম চেষ্টা আমরা লালনের মধ্যে দেখি তা সবসময় শান্তিপূর্ণ ছিল না। অনেক নারীপুরুষ এসব পরিচয় অতিক্রম করে যখন প্রেম সম্পর্কে সম্পর্কিত হন তখন তাদেরও সমাজের সাথে লড়াইয়ে নামতে হয়। আমরা জানি অনেক তরুণ তরুণী লালনের আখড়াতেই নিজেদের আশ্রয় খুঁজেছেন।

৩

জীবনের প্রবহমান ধারাতেই গান জন্ম নেয়। জীবনের শ্রম, কাম, ঘাম, দাম, সব থেকেই সৃষ্টি হতে পারে গান। জীবনই গানের উৎস, গণসঙ্গীত সেই জীবনের বিশেষ মুহূর্তকে বিশিষ্ট করে তোলে। ব্যক্তির ক্রোধ, ক্ষোভ, আর্তনাদ, প্রেম, প্রতিবাদ, স্বপ্ন, আর লড়াইকে সমষ্টির সঙ্গে যুক্ত করে। সব দেশেই গণসঙ্গীত প্রধানত আশ্রয় নেয় লোকসঙ্গীতের উপর কেননা সেখানে মানুষের প্রাণের টান থাকে, থাকে শেকড়ের যোগ। কিন্তু গণসঙ্গীত সেখানেই সীমিত থাকে না, তা অন্যান্য গানের ধারা, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের গানের কাঠামো, যন্ত্র, ভাব, কাহিনীকেও রূপান্তর করে সম্পৃক্ত করে। এটা গণসঙ্গীতে সম্ভব; কেননা, গণসঙ্গীত বিশ্বজনীন মানুষের লড়াইয়ের একটি ভাষা।

প্রচলিত গানই কীভাবে পরিস্থিতির টানে পাল্টে গিয়ে নতুন রূপে হাজির হয় তার অনেক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। যেমন তিনি দেখেছেন, সারিগানে শোনা যেত,

> সাবধানে গুরুজীর নাম লইওরে সাধুভাই
> সাবধানে গুরুজীর নাম লইও।

সেখানে শোনা গেল:

> কাস্তেটারে দিও জোরে শান কিষাণ ভাইরে
> কাস্তেটারে দিও জোরে শান।
> ফসল কাটার সময় এল কাটবে সোনার ধান
> দস্যু যদি লুটতে আসে কাটবে তাহার জান রে।...

কিংবা ভাটিয়ালীতে পরিচিত কথার জায়গায় শোনা গেল:

> ফিরাইয়া দে, দে, দে মোদের কায়ুর বন্ধুদেরে
> মালাবারে কৃষক সন্তান
> তারা কৃষক সভার ছিল প্রাণ
> অমর হইয়া রহিবে দেশের দশের অন্তরে।
> কৃষকসভার রাখতে ইজ্জতমান
> তাঁরা ফাঁসী কাষ্ঠে দিল প্রাণ।
> ফিরিয়া পাব নারে মোদের কায়ুর বন্ধুদেরে।।

সকল মানুষের গভীর ঐক্যের বাণী অজানা কবির সৃষ্টি গাজীর গীতিতে পাওয়া যায়:

> নানা বরণ গাভীরে তার একই বরণ দুধ
> জগত ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত।

কিংবা

> হেদু আর মোছলমান একই পিঞ্জর দড়ি
> কেহ বলে আল্লা রসুল কেহ বলে হরি
> বিছমিল্লা আর সিরিবিষ্টু একই গোয়াল
> দোফাক করি দিয়ে পরভু রাম রহমান।

কিন্তু এসব কথা শাস্ত্রীয় নেতারা, রাম রহমান, কেউই গ্রহণ

করবে না। বরঞ্চ ক্রুদ্ধ হবে। হেমাঙ্গ বিশ্বাস বলছেন,

মোল্লা মওলানার শরীয়ত শাসন কিংবা সনাতন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মনুর বিধানকে অবজ্ঞা করে, সমাজপতিদের লাঞ্ছনাকে অগ্রাহ্য করে, বৈষ্ণব, সুফী ও সহজিয়া বাউলের ভাবধারার সংমিশ্রণে এক অপূর্ব মানবতাও গড়ে উঠেছিল।

বাংলার ভূমিতে এটাই হচ্ছে। লালন বলেন,

মানব তত্ত্ব যার সত্য হয় মনে
সে কী অন্য তত্ত্ব মানে।

কিংবা

থাকে ভেস্তের আশায় মমিনগণ
হিন্দুরা দেয় স্বর্গেতে মন
ভেস্ত স্বর্গ ফাটক সমপান
কার বা তা ভালো লাগে।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস মদন বাউলের গানের কথাও বলেন,

তোমার পথ ঢেক্যাছে মন্দিরে মসজিদে
ও তোর ডাক শুনে সাঁই চলতে না পাই
আমায় রুখে দাঁড়ায় গুরুতে, মুরশেদে।

ময়মনসিংহের ভাটিয়ালী একটি গানের উল্লেখ করেছেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। গানটি ১৩৫০ বা ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের পরিপ্রেক্ষিতে তৈরী। গানটি হলো:

আমার দুঃখের অন্ত নাই
দুঃখ কার জানে জানাই
সুখের স্বপন ভাঙলোরে চুরাইবাজারে
ভাইরে ভাই ....১৩৫০ এর কথা
মনে কি কেউর পড়ে- রে
মনে কি কেউর পড়ে
ক্ষুধার জ্বালায় বুকের ছাওয়াল
মায়ে বিক্রী করে রে -
চুরাইবাজারে ...

প্রতিটি গণসঙ্গীতের এরকম একেকটি পরিপ্রেক্ষিত আছে। হেমাঙ্গ বিশ্বাস তাঁর গানগুলোর কোনটি নিজে রচনা ও সুরারোপ করেছিলেন, কোনটি সংগ্রহ করেছিলেন লোকসঙ্গীতের ভাণ্ডার থেকে, কোনটি কিছুটা পাল্টে নিয়ে চলতি লড়াই এর সাথে যুক্ত করেছিলেন। গণসঙ্গীত একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে রচিত হয় নিশ্চয়ই, কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে একটি গণসঙ্গীত যদি মানুষ ও তার লড়াইয়ের প্রাণ ধারণ করতে পারে তাহলে তা দীর্ঘদিন অন্যান্য লড়াইকেও উজ্জীবিত করতে সক্ষম হয়। কারণ শোষণ পীড়ন, বৈষম্য আর নিষ্পেষণ, অপমান বঞ্চনার বিরুদ্ধে কান্না ক্রোধ ও প্রতিবাদ, কিংবা মানুষের স্বপ্ন, সাহস, এবং আরও অসংখ্য মানুষের সাথে মৈত্রী সংহতির গান মানুষকে স্পর্শ করবেই। সেজন্য হেমাঙ্গ বিশ্বাস আমাদের কাছে এখনও জীবন্ত থাকেন।

৪

গণসঙ্গীত যারা সৃষ্টি করেছেন, করছেন, যারা এসব গণসঙ্গীতকে মানুষের লড়াইয়ে হাজির করে তাতে প্রাণের স্পর্শ দিয়েছেন, তাদের জীবনও সংগ্রামের তাপ ও চাপকে মোকবিলা করেই চড়াই উৎরাই পার হয়। এই শিল্পীদের জীবন অন্য সাধারণ শিল্পীদের মতো নয়। এঁরা শিল্পীজগত থেকেই আবির্ভূত হন। কিন্তু মানুষের জীবন ও লড়াই-এর প্রতি তাঁদের তীব্র সংবেদনশীলতা তাঁদেরকে সাধারণ ব্যক্তিক তৃপ্তিতে ডুবে থাকা চরিত্রের শিল্পী থেকে অন্য এক মানুষে রূপান্তরিত করে। নন্দনতাত্ত্বিক সুখ নিয়ে তাঁরা সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না, যদিও নন্দনতত্ত্বের পরীক্ষায় তাঁদেরকেও উত্তীর্ণ হতে হয়। হেমাঙ্গ বিশ্বাস এরকম উত্তীর্ণ একজন মানুষ।

আর শিল্পে ব্যক্তিক সাফল্য, প্রতিষ্ঠা, যশ তাদের আরাধ্য নয়, সমষ্টির লড়াইয়ে নিজের সক্ষমতা যোগ করে তাঁকেও নিতে হয় জীবনের ঝুঁকি। জীবনের সাফল্যের প্রচিলিত ঘেরাটোপ থেকে বের করে তৃপ্তি আর সাফল্যের নতুন সংজ্ঞা তাঁকে গ্রহণ করতে হয়। সেখানে প্রচলিত বিত্ত বৈভবের স্থলে অনটন, নিশ্চিত জীবনের বদলে দারিদ্র, জেল জুলুম সবকিছুরই সম্ভাবনা থাকে। এটা শুধু বাংলাদেশের নয় সবদেশেরই অভিজ্ঞতা।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস এরকম একটি চরিত্রের কথা বিশেষ করে তাঁর লেখা ও কথায় উল্লেখ করেছেন। তিনি বাংলাদেশে সুপরিচিত শিল্পী রমেশ শীল, যিনি এক পর্যায়ে গণনাট্য আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তাঁর শুরুটা তা ছিল না।

সুফীবাদী দর্শনে অনুপ্রাণিত রমেশ শীল জীবনের প্রথম পর্যায়ে মাইজভাণ্ডারের মধ্যে জীবনের অর্থ খুঁজেছিলেন। গেয়েছিলেন :

দেখে যারে মাইজভাণ্ডারের আজব রঙের ফুল
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে পড়ে আশেক অলিকূল।
ফুলের রং দেখেছে যারা, হয়ে গেছে মাতোয়ারা
দুনিয়ার সুখ চায় না তারা চায় না জাতিকুল।
সে ফুলের সুবাতাসে, দিল খোলে আর আঁধার নামে।
নিত্তরসে চিত্ত বাসে প্রেমবাগে বুলবুল।

কিংবা

ত্রিবেণীর ঘাটেতে মাঝি জোয়ার ধরি যাইও
ভাণ্ডারীর বর্জকে তরী ধীরে ধীরে বাইও।

সেই একই রমেশ শীল নতুন জগৎ আবিষ্কার করলেন যখন, তখন লিখলেন,

আমার খুলে মটর গাড়ি
তেতালা চৌতালা বাড়ি—
আমার খুলে রেডিও আর বিজলি বাতি জ্বলে।

আমি কৃষক, তুমি মজুর দিনে রাতে খাটি
দুই শক্তি এক হইলে তারা পিছু যাবে হটি।
একসঙ্গে নিঃশ্বাস ছাড়ি
পর্বত উড়াতে পারি
দুশমন চক্রে চাও না ফিরি কী আছে তার মূলে?

রমেশ শীল গানের জন্য নিগৃহীত হয়েছিলেন, কারাবরণও করেছিলেন। হতাশার মধ্যেও আশার আলো নিয়ে শেষ বয়সে লিখেছিলেন,

অত্যাচারের প্রতিশোধ আমার নেওয়া নাইবা হবে
আমার পরে আসবে যারা বোধ করি তারাই নেবে।
সারাজীবন ধরে আমি তারই চেষ্টা করে যাব।
মনের কোণে সুর উঠিবে, কলম দিয়ে তাল বাজাব।...
হিংস্র জন্তুর ডাক থামিবে, পথের বাধা হবে শেষ
বুক ফুলিয়ে বলে উঠব, এইতো আমার দেশ।'

৫

রমেশ শীল পূর্ববঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের এক ভাষণে যা বলেছিলেন তা এক নির্মম বাস্তবতাকে আমাদের সামনে উপস্থিত করে। একই সঙ্গে এটাও দেখায় যে, কেন লোককবি লোকশিল্পীদের সব সৃষ্টি জনগণের পক্ষে যায় না। কেন শিল্পীজগতে ধ্বস নামে যা আমরা এখনও প্রত্যক্ষ করি। রমেশ শীল বলেছিলেন,

গ্রামের চাষী গরীব হইল, ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিল জমিদার মহাজনের দল, চাষীরা আর গ্রাম্য কবি ও লোকশিল্পীদের অন্নসংস্থান করিতে পারে না। গ্রাম্য কবিগণ পেটের দায়ে এবং মোটা অর্থের প্রলোভনে জমিদার মহাজনদের উৎসব মণ্ডপে আসিয়া ভিড় জমাইল। বাউণ্ডুলে ইয়ারদোস্ত পরিবৃত ধনী জমিদার বাবুদের মনোরঞ্জন করিতে গিয়া গ্রাম্যকবিগণ অশ্লীল ভঙ্গীতে নাচিল, গান গাহিল। নারীজাতির কুৎসা রটনা করিয়া তথাকথিত পুরুষপুঙ্গবকে পরিতৃপ্ত করিল। আমার ব্যক্তিগত কবিজীবনে অসংখ্যবার এইভাবে নাচিয়াছি। অশ্লীল গান গাহিয়াছি।...

বর্তমান বাংলাদেশে বহুসংখ্যক টিভি চ্যানেল, এফএম রেডিও, ইন্টারনেট, সিডি ডিভিডি করবার অনুকূল পরিস্থিতি গানের শিল্পজগতে বিনিয়োগ ও উৎপাদন তৎপরতা বৃদ্ধি করেছে বহুগুণ। বাজার লক্ষ্য হলেও গানের জগতে নানা পরিবর্তনও লক্ষ্যণীয়। সুর ও কথায় লোকসঙ্গীত বা শেকড় সন্ধান একটি বড় প্রবণতা। কিন্তু এই লোকসঙ্গীত আশ্রয়ে যে ধারাটি সবচাইতে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে সেটি হল মৃত্যুর ধারা, জীবনের নয়। কেন মৃত্যু, আত্মসমর্পণ আর হতাশা কিংবা ব্যক্তি-বিচ্ছিন্নতার কথা ও সুর জনপ্রিয় গানের মূল ধারা তৈরি করে? এমনকি ব্যান্ড সংগীত বলে পরিচিত ধারাও কেন মৃত্যুর জয়গান করতে থাকে? কেন বাণিজ্যিক স্রোতও এগুলো ঘিরেই আবর্তিত হয়? কেন বাণিজ্যিক তৎপরতা শিল্পীর সকল সৃজনশীলতা গ্রাস করতে উদ্যত হয় এবং সফলও হয়? প্রশ্নটি একটু ঘুরিয়ে হেমাঙ্গ বিশ্বাসেরও। তিনি চীন, রাশিয়া বা ইউরোপের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে বলছেন,

শোষকশ্রেণীর ভাবাদর্শের সঙ্গে সংঘাতই লোকসংগীতের বিচার ও বিকাশের মূল চালিকা-শক্তি। কিন্তু এদেশে, বিশেষত বাংলার লোকসংগীত জীবন-বিমুখী আধ্যাত্ম্যবাদের দ্বারা এমন আচ্ছন্ন কেন?

অদৃষ্টবাদ, আধ্যাত্ম্যবাদ, তিনি বলছেন,

আত্মসমর্পণের জীবনযান, জীবনের অনিত্যতার দর্শন জনজীবনকে প্রভাবিত করতে লাগলো—

বড় সাধে বাইন্ধাছ ঘর, বড় করছাও আশা
রজনী পরভাত কালে পঙ্খী ছাড় বাসা।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস বলছেন,

কিন্তু প্রশ্ন জাগে, লোকসংগীতে তার (কৃষক বিদ্রোহের) প্রতিধ্বনি সেরকম আমরা পাই না কেন? তিতুমীর দুদুমিঞা বা সমশের গাজীদের নিয়ে 'ব্যালাড' বা গীতিকা পেলাম না কেন? ভাবজগতে আধ্যাত্ম্যবাদের অপ্রতিহত ক্ষমতাই কি তার একমাত্র কারণ? তাছাড়াও অন্য প্রশ্ন মনে জাগে।

বাংলাতেও অন্যায় নিপীড়ন শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে অসংখ্য গান, প্রবাদ, প্রবচন, শ্লোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মতে, সমস্যাটা অনেকটা গবেষক ও সংগ্রাহকদের, তাদের মানসিকতায়, মতাদর্শে। এই মধ্যবিত্ত, ইউরোপের চোখে দেখা ভারতকে, তার "আত্মসমর্পণ, আধ্যাত্মিক তত্ত্বমূলক ধারাটিকেই ভারতীয় ধারা বলে সনাক্ত করেছেন।" কিন্তু তিনি অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছেন, "সামান্য অনুসন্ধান করলে আজও অনেক টুকরো ছড়া, গানের ভাঙাকলি, গীতিকার ছিন্নমালা খুঁজে পাওয়া যায়— শুধু বাংলাদেশে নয়, ভারতের সর্বত্র।" হেমাঙ্গ বিশ্বাস অনেকগুলো দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যেখানে সিরাজউদৌল্লা, ঝাঁসির রাণী, নীলবিদ্রোহ, প্রজাবিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহের বিষয়ে জনঅনুভূতি, উপলব্ধি আছে— আছে বিদ্রোহের এবং অস্বীকারের চেতনা। বলাই বাহুল্য, পরবর্তী সময়ে কে কোন ধারাকে গ্রহণ করবে তা নির্ভর করে তার মতাদর্শ ও সামাজিক অবস্থানের উপর।

৬

সবসময় স্পষ্ট আকারে না হলেও সাধারণভাবে নারী, নিপীড়িত মানুষ, সংখ্যালঘু মানুষের গানে কথায় যে ব্যক্তিক অনুভূতি প্রকাশিত হয় তাতে এই জগতে তাঁদের জীবন সংগ্রামের ক্ষোভ, হতাশা আর বেদনার ছাপ পাওয়া যায়। তাতে যে সবসময় সরবে বিদ্রোহের কথা আছে তা নয়, কিন্তু সমষ্টির ভেতর প্রচলিত এসব নানাগানে জনসমাজের ভেতরকার মুক্তির

আকুলতা এবং জীবন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়। হেমাঙ্গ বিশ্বাস দেখেছেন বিভিন্ন ধরনের গানে এর বিবিধ প্রকাশ ঘটে। যেমন ছাদঢালা গানে অপূরিত আকাঙ্ক্ষা, নদীর যাত্রায় প্রকৃতির অনিশ্চয়তা, ভাটিয়ালিতে সাগরের বিশালত্ব, অনিশ্চয়তা, ডাকাতের ভয়, জমিদার বিরোধী ক্ষোভ, ভাওয়াইয়ায় নারীর বেদনা, একই সঙ্গে বঞ্চনার ক্ষোভ ও পরাণ পোড়া আর্তি।

ও মনরে... ভবেরি বাজারে আইলাম
ষোল আনা লইয়া
আমার সর্বস্বধন লুইট্যা নিল
ডাকাইতে লগ পাইয়া।

কিংবা,

ও মনরে... ভবসাগরে ঢেউ দেখিয়া
প্রাণপাখি যায় উড়িয়া রে
শূন্যঘাটে পইড়্যা রইলাম
ভাঙাতরী লইয়া রে।।...

হেমাঙ্গ বিশ্বাস এই গান সম্পর্কে বলেন,

ভবের বাজারে সর্বস্ব অপহরণকারী কে? আর সর্বস্ব হারিয়ে ভাঙাতরী নিয়ে শূন্যঘাটে পড়ে থাকার কারণটি কি? এর পেছনে যারা আধ্যাত্মিকতা খুঁজে বেড়ান— খুঁজুন, কিন্তু আমরা জানি এর পিছনের ইতিহাসটা।

বলেন,

যাকে আধ্যাত্মিক বলা হয়, সেই সব গানে জীবনের বঞ্চনাই ব্যক্ত।

কিংবা গুরু বা মুর্শিদের কাছে কী নালিশ করে কৃষক?

গুরু ও— আমার বাড়ির চারধারে
ডাকাইতের দল বসত করে— ও
মনা ডাকাইত দলের সর্দার, ও
তারা লুটে করে ছারখার।।
গুরু ও— আমার সাতপুরুষের বাড়িখানা
তাতে জমিদারের খাজনা দেনা— ও
আমায় কখন জানি উচ্ছেদ করে— ও
খাজনার যমরাজা তহশিলদার।।

কিংবা

মুরশিদ ও— কারো বা আছে দলান গো কুঠা
আমার আছে ভাঙা ডেরা— ও
ডেরায় মেঘ মানে তুফান মানে না— ও
শুনেন গো মুরশিদ...।।

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের ব্যাখ্যা,

কিন্তু আমাদের অর্ধ-উপনিবেশিক সমাজে, ভূমিতে চিরস্থায়ী ব্যবস্থায় নব্য ভূমধ্যকারীর নিরঙ্কুশ শোষণে পল্লীজীবনের কৃষিসংকটের আবদ্ধ জলাশয়ের গেঁজলায় বাউল তত্ত্বেরও সামাজিক চেতনার বহির্মুখীতা তন্ত্রাচারী যোগাসনের গুহ্য দুর্বোধ্যতা এবং অর্থহীনতায় ডুবে গেল। যে বাউলরা বলতেন, ''দেবের দুর্লভ মানবজন্ম তোমার'' সেই বাউলরা আবার যখন দেখলেন, ''মানবজনম সফল হইল না'' তখন তাঁরা ভাগ্যের কাছে বৈষ্ণবীয় আত্মসমর্পণের আশ্রয় নিলেন। দোষী করলেন 'ষড়রিপুকে', তাকাতে পারলেন না পরশ্রম-অপহরণকারীদের দিকে। উৎপাদনকারী শ্রমজীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মরতিতে নিমগ্ন হলেন। এমনকি যে লালন পরজন্মের চিন্তাকে নস্যাৎ করে মনুষ্যজীবনকে শ্রেষ্ঠ জীবন বলেছেন— দীর্ঘজীবী সেই লালনকে দেখি পরপারের ভাবনায় আকুল।

নারীর ক্রন্দন, আর্তি, বাসনা, প্রেম কীভাবে গানে গানে নানাভাবে ছড়িয়ে আছে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। প্রেম ও প্রকৃতির অবিচ্ছিন্নতা কতভাবে প্রতিফলিত, তা নারীর দৃষ্টিতে আরও স্পষ্ট হয়। হেমাঙ্গ বিশ্বাস বলছেন,

কৌম গোষ্ঠী-সমাজের সমানাধিকারের স্থলে এল সামন্ত-সমাজের পুরুষ প্রাধান্য, বহুবিবাহ, বৈধব্য প্রথা, বংশকৌলিন্য, শাঁখা, সিঁদুর, পর্দাপ্রথা ইত্যাদি। তারই সমর্থনে এল নতুন নতুন মূল্যবোধ, নতুন ধ্যান ধারণা ও ধর্মচিন্তা। কিন্তু শ্রমজীবী সমাজ তা সহজে মেনে নিল না। এই সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ গানে, গল্পে, গাথায় নানাভাবে ধ্বনিত হয়ে উঠল। কখনও রূপকে কখনো সরাসরি।

নাইওর নিয়েও বহু ভাওয়াইয়া গান আছে। হেমাঙ্গ বিশ্বাস ভাওয়াইয়া গানকে ''সামন্ত সমাজের বিরুদ্ধে নারী জাতির প্রতিবাদের গান'' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।' বৃদ্ধ স্বামীর চাইতে দেবর, বিবাহিত অবস্থায় বন্ধুর জন্য আনচান অস্থিরতা, ভাই-এর জন্য পরাণ পোড়া, প্রবাসী স্বামীর জন্য বিরহ, নির্যাতক স্বামীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ সবই এসব গানে পাওয়া যায়।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন,

ব্রাহ্মণ্যধর্ম-শাসিত সমাজের জাতিকুলধর্মের নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে একদিন বৈষ্ণব জাগরণ এসেছিল এবং জনসাধারণের মধ্যে তা ব্যাপ্তি লাভ করেছিল। প্রেম যেখানে প্রতিবাদী; সেটুকুই লোকসংগীত গ্রহণ করেছে। প্রেম যেখানে ভক্তিমার্গে আধ্যাত্মবাদী, লোকসংগীতে তার প্রতিফলন অত্যন্ত ক্ষীণ এবং তা এসেছে অনেক পরে।

৭

মনে রাখা দরকার যে, গণসঙ্গীত আর দেশাত্মবোধক গান সবসময় এক নয়। এদুটোর পার্থক্য সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে হেমাঙ্গ বিশ্বাস ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে লিখছেন,

বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম স্বদেশ-চেতনা এবং

পরাধীনতার বেদনাবোধে যে গীতের জন্ম তাকে আমরা স্বদেশী সংগীত কিংবা দেশাত্মবোধক সংগীত বলে থাকি। সেই স্বদেশী সংগীতের একটা বড় অংশ ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদের প্রভাবে আচ্ছন্ন ছিল, অনেক সময় আবার জাতীয় চেতনা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের আদর্শে প্রভাবিত ছিল। সেসব গানে দেশাত্মবোধের আবেদন ও বেদনা থাকলেও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহের চেতনা ছিল না। দেশের মুক্তির সঙ্গে শোষণমুক্তির চিন্তার মিলন ঘটেনি।... স্বদেশ চেতনা যেখানে গণচেতনায় মিলিত হয়ে শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার ভাবাদর্শের আকারে মিশলো সেই মোহনাতেই গণসংগীতের জন্ম।

তেভাগা আন্দোলন, অক্টোবর বিপ্লব, কমিউনিস্ট দর্শনের প্রভাব এদেশে গণসংগীতের নতুন ধারা তৈরি করে। যা খুব স্পষ্টভাবে সাম্রাজ্যবাদ ওশ্রেণীগত শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে জনগণের রাজনৈতিক সংগ্রামের চেতনাকে কথা, সুর ও মঞ্চে উপস্থিত করে। গণনাট্য সংঘ এই ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে। সলিল চৌধুরী ও হেমাঙ্গ বিশ্বাস, বিজন ভট্টাচার্য্য, ঋত্বিক ঘটক ছিলেন এসব তৎপরতার নেতৃত্বের ভূমিকায়। এর ধারাবাহিকতা পরে অক্ষুন্ন থাকেনি। কেননা গণসঙ্গীত মানুষের বিপ্লবী লড়াই-এর আশ্রয়ে, তাপেই গড়ে উঠে। এই আন্দোলন দুর্বল হয়ে গেলে গণসঙ্গীতের ধারাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ৭০ দশকে পশ্চিম বাংলায় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আরেকটি নবজাগরণ দেখা যায়, সেটা হয় নকশালবাড়ি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। আমরা এই সময়ে যাদের পাই তাদের মধ্যে প্রতুল মুখোপাধ্যায় অন্যতম।

'৫০ ও '৬০-এর দশকে এবং স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন বাংলাদেশে সংগ্রামী অনেক গান রচিত হয়েছে। তবে তার বেশিরভাগ ভাষা আন্দোলন ও জাতিগত নিপীড়ন বিরোধী বাঙালী জাতির লড়াই-এর গান। এগুলো এই সময়কালের লড়াইএ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আলতাফ মাহমুদ, শেখ লুৎফর রহমান, আবদুল লতিফ এসময়ে এই ধারা সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। খেয়াল করলে তুলনামূলক কম পরিচিতি পাওয়া গানের সন্ধানও এখন আমরা পাই পাহাড়ী সহ সংখ্যালঘু জাতি-জনগোষ্ঠীর গানে, যেখানে বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও বাঙালী শাসক শ্রেণীর জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদী চেতনা, ক্ষোভ ও লড়াই-এর সংকল্প ধ্বনিত হয়েছে।

৮

প্রতুলের 'আমি বাংলায় গান গাই' এখন বিজ্ঞাপনের গান, শুধু এটাই নয়, 'জাগরণের গান' নামের প্যাকেজে অনেক সংগ্রামী গান এখন মোবাইল কোম্পানির বিজ্ঞাপনী প্রকল্পের অংশ। শুধু গান নয়, জাতীয় স্মৃতিসৌধ, শহিদ মিনার, শহিদ মুক্তিযোদ্ধার চিঠি, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, নারীর লড়াই, শিশুর স্বপ্ন ও লড়াই, দারিদ্র্য পীড়িত শিল্পী, সংগঠক সবাই সবকিছু এখন বিজ্ঞাপনের মডেল। সৃজনশীল ক্ষমতার অধিকারী অনেক কণ্ঠশিল্পী, গীতিকার, সুরকার, নাট্যকার এখন উৎকৃষ্ট মানের বিজ্ঞাপন রচনায় ব্যস্ত। অনেক মেধাবী তরুণ এখন কিছু টাকার বিনিময়ে কিংবা ক্যারিয়ার গড়বার আশায় বিজ্ঞাপন অর্থাৎ মিথ্যাচার ও প্রতারণার মাধ্যমে জনগণের মাথা গুলিয়ে কতিপয় কোম্পানির মুনাফা বাড়াতে ব্যস্ত। আর তা করতে গিয়ে জনগণের দীর্ঘদিনের রক্তমাখা স্মারক গান আর প্রতিষ্ঠানকে মডেল বানাতে তাদের দ্বিধা হচ্ছে না। এটাই তাদের সফল ক্যারিয়ারের শীর্ষবিন্দু। স্পনসরশিপের জাল ক্রমেই শিল্প সংস্কৃতি জগতকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলছে। এখন নাট্য উৎসব, সঙ্গীত উৎসব, স্বাধীনতার গান, নারী দিবস, মে দিবস সবকিছু হয়ে উঠছে গ্রামীণ ফোন, বাংলালিংক, ওয়ারিদ, রবি বা কোন হাউজিং সোসাইটির প্রচারণা কর্মসূচির বাহন। শিল্পী সংস্কৃতি কর্মীদের অনেকে সন্তুষ্টচিত্তে নিজেদের বিলিয়ে দিচ্ছেন পুঁজির পদতলে।

এরকম একটি আগ্রাসনের কালেও মানুষ তো আর অদৃশ্য হয়ে যায়নি। তাই লড়াইও থেমে যায়নি। মানুষ যদি থাকে, তার চেতনা যদি থাকে তবে তার লড়াই এর ভাষাও নানাভাবে নির্মিত হতে থাকে। সেকারণে গত এক দশকে বাংলাদেশে নিপীড়ন আধিপত্য দখল ও বৈষম্য বিরোধী অনেকগুলো লড়াই সংগ্রাম দৃশ্যমান হয়েছে। বিশ্বব্যাপী সাম্রাজবাদী ও পুঁজির আগ্রাসন শিল্পী জগতের অনেককে যেমন পরাজিত দাসে পরিণত করেছে তেমনি এর কারণেই মুক্তির আকুতি নিয়ে, প্রতিবাদের ভাষা নিয়ে অনেক তরুণও সামনে আসতে চেষ্টা করছে। ইরাক, আফগানিস্তানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী নারকীয়তা ও তার বিরুদ্ধে চেতনার বিস্তার, বাংলাদেশের গার্মেন্টিস শ্রমিকসহ নিপীড়িত মানুষদের জীবন ও সংগ্রাম, সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত নিপীড়নের নানা পর্ব ও তার বিরুদ্ধে লড়াই, নারীর নিপীড়ন ও তার বিরুদ্ধে লড়াই-এর নতুন পর্ব, সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্পের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের শিল্প কৃষি গ্যাস কয়লা সহ জাতীয় সম্পদ দখলে তৎপরতা ও তার বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য লড়াই— এই সবই আমাদের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা। ফুলবাড়ীতে জাতীয় সম্পদ রক্ষায় জীবনদান ও গণঅভ্যুত্থান মুক্তির সংগ্রামে নতুন নিশানা ও সাহস নির্মাণ করেছে।

অনীক, ডিসেম্বর ২০১৪ সংখ্যার ৫ পৃষ্ঠায় 'মোবাইল টাওয়ার বিরোধী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা' রচনাটি লেখক সুব্রত রায়চৌধুরী স্থলে *সুব্রত চৌধুরী* পড়তে হবে। এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত। —সম্পাদকমণ্ডলী

একুশ শতকের পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র

রতন খাসনবিশ

ভূমিকা

অনিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদের পক্ষে যেভাবে জোর সওয়াল করা শুরু হয়েছিলো গত শতাব্দীর আশির দশক থেকে, ইদানিং সেটা কিছুটা স্তিমিত হয়ে উঠেছে। নয়া উদারবাদী অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করার পক্ষেই পাল্লা এখনও ভারী, তবে অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে জাতিরাষ্ট্রগুলির গুরুত্ব যেভাবে প্রায় নাকচ করে ফেলার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো, সেখান থেকে পরিস্থিতিটা কিছুটা হলেও বদলাচ্ছে। পুঁজির ওপর নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তার কথা এমনকি বিশ্বব্যাঙ্কের কর্মকর্তারাও বলতে শুরু ক'রেছেন সম্প্রতি। বলার মূল কারণ হলো, নয়া উদারবাদী বাজার অর্থনীতির চাপে বিশেষত উন্নত দেশগুলির অর্থনীতি যেভাবে বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছে তার থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় খুঁজে না পাওয়া। ২০০৮ থেকে ২০১৪, এই দীর্ঘ সময় জুড়ে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে চলেছে আর্থিক মন্দা। মার্কিন অর্থনীতি ইদানিং কিছুটা চাঙ্গা হয়ে উঠেছে বটে, তবে সেটা দীর্ঘস্থায়ী হবে কিনা এ নিয়ে সংশয় আছে পুরোমাত্রায়। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন-ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে জার্মানি ছাড়া কারও অবস্থা ভালো নয়। শুধু তাই নয়, নয়া-উদারবাদ দক্ষিণ ইউরোপের দেশগুলিকে (গ্রিস, ইটালি, স্পেন) কার্যত জার্মানীর অর্থনৈতিক উপনিবেশ করে ফেলেছে কিনা, এ নিয়ে চলছে বিপুল বিতর্ক। যে দেশগুলি এরই মধ্যে কিছুটা ভালো আছে, সে দেশগুলির ভালো থাকাটা কতটা মুক্ত বাজার অর্থনীতির দৌলতে, কতটাই বা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকার কারণে অর্জন করা গেছে, সেটা এখন আলোচনার বিষয় হ'য়ে উঠেছে। নয়া উদারবাদী মুক্ত বাজার অর্থনীতির তত্ত্ব লাতিন আমেরিকার জন্য দিয়েছিলো 'ওয়াশিংটন ঐকমত্য'-এর দাওয়াই। সে দাওয়াই-এর পরিণামে এই দেশগুলি ক্রমশ বিপর্যস্ত হয়েছিলো। দেশগুলিতে দেখা দিয়েছিলো চূড়ান্ত রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং তার জেরে শেষ পর্যন্ত লাতিন আমেরিকার একটা বড় অংশ জুড়ে ঘটে গেছে রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন। সে দেশগুলিতে এখন 'ওয়াশিংটন ঐকমত্য' অচ্ছুৎ; দেশগুলির অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের গুরুত্ব ক্রমবর্ধমান।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একবিংশ শতকের সূচনাকালের পুঁজিবাদের সমস্যাগুলি কী, সে নিয়ে আলোচনা করব। নয়া উদারবাদে এসে ইতিহাসের সমাপ্তি যে ঘটবে না, বরং নয়া উদারবাদের অভিজ্ঞতা সে সমাজতন্ত্রের তাত্ত্বিক নির্মাণের ভিত্তিটি জোরদার করে একটা পাল্টা ইতিহাস রচনা করার পক্ষের মতাদর্শকেই শক্ত করে তুলছে, এই প্রবন্ধে সেটিই আমাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

নয়া উদারবাদ ও জাতিরাষ্ট্র

নয়া উদারবাদের মূলকথাটা হলো, এক দেশ থেকে অন্য দেশে পুঁজি চলাচলের ওপর জাতিরাষ্ট্র-আরোপিত বাধার অপসারণ। যে রূপ ধরে পুঁজি এইভাবে দেশান্তরে যাত্রা করে সেটা হলো লগ্নিপুঁজি— অর্থের এককে (ডলার, ইউরো, টাকা) যা মাপা যায়। পুঁজির এই দেশান্তর যাত্রা করার পিছনে থাকে অপেক্ষাকৃত বেশি লাভজনক বিনিয়োগ ক্ষেত্র খোঁজা। জন্মলগ্ন থেকে পুঁজির এই দেশান্তর যাত্রার প্রবণতা ছিল না, কেননা লাভজনক বিনিয়োগ ক্ষেত্র জোটাবার দায়টা বহুদিন জাতিরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের বাজারই মিটিয়ে দিতে পারত। সে বাজারটা টেকানো কিংবা প্রসারিত করার দরকার মেটানোর জন্য পুঁজি খাটিয়ে যে পণ্য উৎপাদন করা হয়, সেই পণ্য বিক্রি করার জন্য বিদেশি বাজারের দরকার পড়ত। রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্র প্রসারিত করেই সে দরকারটা মেটানো হয়েছে বহুদিন। বিনিয়োগের বাজার প্রসারিত করার জন্য পুঁজিকে জাতিরাষ্ট্রের সীমা অতিক্রম করতে হতো কদাচিৎ। পুঁজি সেটা চাইতও না সচরাচর, কারণ বিনিয়োগের বাজার বাড়ানোর জন্য পুঁজি তার জাতিরাষ্ট্রর সীমানা অতিক্রম করলে আসলে যা ঘটে তা হলো সম্পদের (অর্থরূপী সম্পদের) একতরফা বহির্গমন— পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে যা হয়না। পণ্য বিক্রি ক'রে অর্থ পাওয়া যায় সমমূল্যের, যা রপ্তানিকারী প্রায় নগদে ফেরত পায় বিনিময় হওয়া মাত্র। সুতরাং এই ধরনের বিনিয়োগের নিশ্চয়তা খুবই বেশি। পুঁজি রপ্তানির ক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ কিছু ফেরত আসে না। বিনিয়োগ থেকে লাভ হবে, সেই লাভ ফিরে আসবে একটা সময় জুড়ে। বিদেশে যে সম্পদ থাকে, তার নিরাপত্তার বিষয়টি তাই গুরুত্বপূর্ণ। স্বদেশি জাতিরাষ্ট্র এটা নিশ্চিত করতে পারে না। যে রাষ্ট্রে সেটা বিনিয়োগ করা হয়েছে, সেখানের সঙ্গে রাজনৈতিক বোঝাপড়া না থাকলে সে সম্পদ লোপাট হয়ে যেতে পারে। সে দেশের বিনিয়োগ-নীতি বদলে গেলে প্রত্যাশিত লাভের অঙ্কে গরমিল দেখা দিতে পারে। লগ্নিপুঁজির আদিযুগে (বিংশ শতকের সূচনার) তাই পুঁজির এই দেশান্তর গমনে থাকত বহু সতর্কতা। নিজের জাতিরাষ্ট্রের উপনিবেশ, যেখানে বিনিয়োগ-নীতি নির্ধারণে পুঁজির স্বদেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকত, পুঁজি সচরাচর যেত সে সব দেশে। বৈরী দেশে লগ্নিপুঁজি কিছুতেই যেতে চাইতো না— সেসব দেশে লাভের সম্ভাবনা যত উজ্জ্বলই হোক না কেন। লেনিন যে লগ্নিপুঁজির কথা বলেছিলেন সেটা ছিলো এই

সময়ের লগ্নিপুঁজি, যে লগ্নিপুঁজির ক্ষেত্র প্রসারিত করার জন্য যে সময় উপনিবেশ আধা-উপনিবেশের ওপর রাজনৈতিক দখল কায়েম করার দরকার হতো— জাতিরাষ্ট্র যে কাজটা করে দিত, এবং সেটা করতে গিয়ে রীতিমতো যুদ্ধে নামতে হতো উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিকে।

বিনিয়োগ-ক্ষেত্র ক্রমাগত প্রসারিত করেই পুঁজিকে যেহেতু বাঁচতে হবে এবং উপনিবেশ গড়ে পুঁজির নিরাপদ বিচরণক্ষেত্র নিশ্চিত করা যেহেতু রাজনৈতিকভাবে অসম্ভব হয়ে পড়লো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে, লগ্নিপুঁজির বিনিয়োগের সমস্যা মেটাতে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলো তাই ক্রমাগত রফায় আসতে শুরু করে গত শতকের পঞ্চাশের দশক থেকেই। নেতৃত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে দেশটি সবচেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রাজনৈতিক এবং সামরিক লড়াইটা কেন্দ্রীভূত করা হয় সোভিয়েত ব্লকের বিরুদ্ধে— যে ব্লকটি ছিলো ভিন্নধর্মী এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতীক, একজোট করা হয় 'ন্যাটো' 'সেন্টো' এবং 'সিয়াটো'র অধীনস্থ অঞ্চলগুলিকে আর লগ্নিপুঁজি মাপার একককে আনা হয় মার্কিন মুদ্রা অর্থাৎ ডলারে, যে ডলারের আন্তর্জাতিক দাম বাঁধা হয়েছিলো স্থির অঙ্কের সোনায়। লগ্নিপুঁজির দেশান্তরগমনেও যাতে তার আর্থিক মূল্যে হেরফের না হয় তার ব্যবস্থা করা হলো ডলারকে স্থির অঙ্কের সোনার সাথে বেঁধে দিয়ে আর তার নিরাপদ বিচরণ ক্ষেত্র যোগাবার কাজটা করা হলো নানাবিধ রাজনৈতিক (সামরিক) জোট গড়ে এবং প্রাক্তন উপনিবেশগুলির ওপর পরোক্ষ বা নয়া উপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ এনে। অবস্থাটা এরকম দাঁড়ালো যে লগ্নিপুঁজির খুঁটি বাঁধা থাকত জাতিরাষ্ট্রেই, কিন্তু উপনিবেশহীন পৃথিবীতেও তার বিচরণ ক্ষেত্র যাতে আন্তর্জাতিকই থেকে যেতে পারে তারও একটা উপায় পাওয়া গেল। বলা যায় যে নূতন এই ব্যবস্থাটি আগের চেয়েও ভালো একটা ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়ালো। লগ্নিপুঁজির সঙ্গে জাতিরাষ্ট্রের সম্পর্কও থাকল আবার একদেশের লগ্নিপুঁজির সঙ্গে অন্যদেশের লগ্নিপুঁজির প্রতিযোগিতায় নামার সুযোগও বাড়ল (উপনিবেশের যুগে যে সুযোগটা প্রায় ছিলই না), যার ফলে বিনিয়োগের বাজারও প্রসারিত হ'লো।

নয়া উদারবাদী সংস্কারের মধ্য দিয়ে পুঁজির যে বিশ্বায়ন আমরা এখন প্রত্যক্ষ করছি, সেটা এলো এরই ধারাবাহিকতায়। সোভিয়েত ব্যবস্থা ভেঙে যাওয়া এবং চীনের মতো একটা বিশাল দেশে বাজার ব্যবস্থা প্রসারিত হওয়ায় মধ্য দিয়ে সেই রাজনৈতিক নিশ্চয়তা এসে গেল যে পুঁজি রপ্তানি করে রাজনৈতিক কারণে আর সম্পদহানির আশঙ্কা থাকবে না। ঠিক সেই সময় নাগাদ প্রায় কাকতালীয়ভাবে ঘটে গেল আর একটা ঘটনা, যার দরুণ রপ্তানি করা লগ্নিপুঁজির আন্তর্জাতিক দাম নির্ধারণ নিয়ে আর অর্থনীতি-বহির্ভূত হস্তক্ষেপের কোনো কারণ থাকল না। ঘটনাটা হলো আন্তর্জাতিক বাজারে মুদ্রার পূর্ণাঙ্গ রূপান্তরযোগ্যতার নিয়ম চালু হওয়া। ডলারকে স্থির অঙ্কে বেঁধে রেখে লগ্নিপুঁজির আর্থিক মূল্যে যাতে হেরফের না হয়, এটা নিশ্চিত রাখাটা ছিলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সদিচ্ছা নির্ভর— সোনার যোগান ঠিক রেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো ১৯৪৪ সালে ব্রেটন-উডস্ সম্মেলনে। বেকায়দায় পড়তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ প্রতিশ্রুতি ভেঙে দিতেই পারত— ঠিক যেটা সে করল ১৯৭৩ সালে ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার খেয়ে। আন্তর্জাতিক লেনদেনের বাজারে যার ফলে দেখা দেখা দিল চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা। এখন এটা বদলে গেছে। মুদ্রা এখন আন্তর্জাতিক বাজারে বাজারের নিয়মেই তার বিনিময় মূল্য পাবে, সে নিয়ে কোনো জোরজুলুম নেই। জাতিরাষ্ট্রগুলিকে শুধু এটা মেনে নিতে হবে যে একদেশের সঙ্গে অন্যদেশের পুঁজি লেনদেনে কোনো জাতিরাষ্ট্র আরোপিত বাধা থাকবে না। লগ্নিপুঁজি নিয়ে কারবার যাদের বেশি সেই উন্নত দেশগুলি সবাই সেটা মেনে নিলো স্বীয় দেশের লগ্নিপুঁজির বিনিয়োগের বাজার প্রসারিত করার স্বার্থে এবং গত শতকের আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে এটাই দাঁড়ালো পুঁজি লেনদেনের নিয়ম। এই নিয়মে লেনদেন চালু হবার পরও ডলারই থেকে গেল প্রধান আন্তর্জাতিক মুদ্রা, যদিও ডলারের সঙ্গে নির্দিষ্ট অঙ্কের সোনাকে যুক্ত রাখার দায় আর থাকলো না ডলারের। কেন এটা হতে পারল অর্থাৎ ডলারই কেন প্রধান আন্তর্জাতিক মুদ্রা হিসেবে থেকে গেল, সেটা নিয়ে এখানে আলোচনা করতে হলে প্রসঙ্গান্তরে যেতে হবে, আমাদের মূল বক্তব্যটি ব্যাখ্যা করার জন্য যা অনাবশ্যক।

কেন এই নিয়মটিকে বলছি মুদ্রার পূর্ণাঙ্গ রূপান্তরযোগ্যতার নিয়ম? একদেশের পণ্য অন্য দেশে বিক্রয় করে যা দাম পাওয়া যায়, সেটার হিসাব হয় সে দেশের বাজারে যে চালু মুদ্রা তার অঙ্কে। এইবার সেই অর্থ যদি নিজের দেশে নিয়ে যেতে হয়, তাহলে সে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে এই নিয়ম মানতে হবে যে এই অর্থ বিক্রেতাকে তার নিজের দেশের মুদ্রায় রূপান্তর করতে দিতে হবে। উন্নত দেশগুলিতে এ নিয়ম গোড়া থেকেই চালু ছিলো, আবার ভারতের মতো দেশে (এমনকি দক্ষিণ কোরিয়াতেও) বহুদিন এ নিয়ে অনেক কড়াকড়ি ছিলো, কারণ এসব দেশ আমদানির ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখার নীতি অনুসরণ করত; মুদ্রার রূপান্তরযোগ্যতা নিয়ন্ত্রণ করা যে জন্য তাদের দরকার হতো। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অধীনে আসা দেশগুলোর প্রায় সবাই শেষ পর্যন্ত এই নিয়ন্ত্রণ তুলে দিল (কিংবা তুলে দিতে বাধ্য হলো)। সব মুদ্রার ক্ষেত্রেই এই রূপান্তযোগ্যতা চালু হয়ে গেলে— বিনিময় হারও অনেকটাই আন্তর্জাতিক বাজারে মুদ্রার চাহিদা-যোগানের নিয়মেই নির্ধারিত হওয়া শুরু হলো। এই রূপান্তরযোগ্যতা কিন্তু আংশিক রূপান্তরযোগ্যতা। পুঁজি

হিসেবে যে অর্থ লেনদেন করা হয় অনেক দেশই (যেমন ভারতবর্ষ) তার ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখে। মুদ্রার পূর্ণাঙ্গ রূপান্তরযোগ্যতা আসে তখনই যখন পুঁজি হিসেবে লগ্নি করা অর্থও যখন ইচ্ছামতো এক দেশ থেকে অন্য দেশে পাঠিয়ে দেওয়া যায় অবাধে। আগেই বলেছি উন্নত দেশগুলি এ নিয়মের অধীনে এসে গেছে গত শতকের আশির দশকে। ভারতের মতো বহু দেশে পুঁজি-খাতে মুদ্রার রূপান্তর এখনও অবাধ নয়, আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রে যদিও তা অবাধ। লগ্নিপুঁজির বর্তমান পর্যায়ে বিনিয়োগের বাজার প্রসারিত করার ক্ষেত্রে এই পুঁজি-খাতে মুদ্রার অবাধ রূপান্তরযোগ্যতা অত্যাবশ্যক। বর্তমান পর্যায়ের লগ্নিপুঁজির পক্ষে যাঁরা সওয়াল করেন, সেই নয়াউদারবাদী অর্থনীতিবিদরা সেজন্যই ভারতে মুদ্রার বাজারে 'সংস্কার' আনার ওপর জোর দেন— এমন সংস্কার যা মুদ্রার পূর্ণাঙ্গ রূপান্তরযোগ্যতাকে নিশ্চিত করতে পারে। সব জাতি-রাষ্ট্রকেই লগ্নিপুঁজির অবাধ চলাচলকে মেনে নিতে হবে, আজকের যুগের লগ্নিপুঁজির এটাই দাবি। নয়া উদারবাদের নির্যাসও এটাই।

জাতি-রাষ্ট্র, লগ্নি-পুঁজি ও বাজার অর্থনীতি

বাজারের নিয়মে যদি মুদ্রার লেনদেন হয় এবং অর্থরূপী লগ্নিপুঁজির চলাচলে রাষ্ট্র-আরোপিত বাধার যদি অপসারণ ঘটে তাহলে জাতিরাষ্ট্রগুলিকে তাদের অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ করতে হবে লগ্নিপুঁজি সৃষ্ট বাধ্যবাধকতা মেনে নিয়ে। এই বাধ্যবাধকতা কী ধরনের সেটা ভাবা যেতে পারে। পুঁজিকে যদি নিজের দেশের বেঁধে রাখতে হয় তাহলে অভ্যন্তরীণ মূল্যস্ফীতির হারে রাশ টানতেই হবে। মূল্যস্ফীতির অর্থ হলো জাতিরাষ্ট্রের মুদ্রা (ভারতে যেমন 'টাকা')-র দাম কমা। অন্য দেশের তুলনার আলোচ্য দেশে মূল্যস্ফীতির হার যদি বেশি হয় আন্তর্জাতিক লেনদেন-এর বাজারে ঐ দেশের মুদ্রার দাম কমে যাবে। মূল্যস্ফীতির হার আর মুদ্রার অবমূল্যায়নের হার সমান থাকলে অসুবিধা নেই। কিন্তু সেটা নিশ্চিত করা যায় না। তাছাড়া এই অবমূল্যয়নের সঙ্গে আমদানির দাম বাড়ে। রপ্তানির বাজারে পণ্যের দাম ক'মে রপ্তানি বাড়তেও পারে, তবে আয়ের ক্ষেত্রে এ দুটোর হ্রাস বৃদ্ধি কাটাকাটি হ'তে অবস্থাটা অপরিবর্তিত থাকবে, এটা ভাবার কারণ নেই। সামগ্রিকভাবে সমষ্টিগত অর্থনীতির ক্ষেত্রে এটা যদি সত্যও হয়, লগ্নিপুঁজি বিনিয়োগকারী বিশেষ কোনো সংস্থার ক্ষেত্রে তা সত্যি না হতেও পারে। মোটের ওপর কথাটা এই যে ক্রমিক মূল্যস্ফীতির ফলে লগ্নিপুঁজি বিনিয়োগে ঝুঁকি বাড়ে। লগ্নিপুঁজি আকর্ষণ করার জন্য তাই মুদ্রাস্ফীতি রোধ করতেই হবে। উন্নত দেশগুলিতে প্রায় ব্যতিক্রমহীনভাবে রাষ্ট্রগুলি যে মূল্যস্ফীতি রোধ করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে তার কারণ এটাই। দামের ওঠানামা অর্থের বাজারে অনিশ্চয়তা বাড়ায়, লগ্নিপুঁজি এই অনিশ্চয়তা পছন্দ করে না। কেন না তাতে বিনিয়োগে ঝুঁকি বাড়ে। লগ্নিপুঁজিকে ধরে রাখার জন্য তাই এইসব জাতিরাষ্ট্র মূল্যস্ফীতি রোধ করাকেই অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বুনিয়াদি বিষয় হিসেবে গুরুত্ব দিতে বাধ্য থাকে।

মূল্যস্ফীতি রোধ করার জন্য জাতিরাষ্ট্রকে আনতে হবে রাজকোষ শৃঙ্খলা (fiscal discipline)। রাষ্ট্রকে তার আয় বুঝে ব্যয় করতে হবে— বাজেট ঘাটতি রোধ করতে হবে, যাতে আয়ের বেশি ব্যয়ের দায় ঘাড়ে নিয়ে রাষ্ট্র নিজেই অতিরিক্ত চাহিদা সৃষ্টি করার ব্যবস্থা না করে বসে। কেন না এর ফলে মূল্যস্তর বেড়ে যাবে। আয় বাড়িয়ে খরচ বাড়ানো যাবে, কিন্তু আয় বাড়াতে গিয়ে কর্পোরেটের ওপর করের বোঝা বাড়ানো চলবে না, কেননা সেক্ষেত্রে কর্পোরেটের লাভের হার কমবে আর তার ফলে বিনিয়োগ তুলনামূলকভাবে কম হয়ে পড়বে। লগ্নিপুঁজি সেক্ষেত্রে আবার আরও বেশি লাভজনক বিনিয়োগ ক্ষেত্রের সন্ধানে দেশান্তরী হয়ে পড়তে পারে। রাষ্ট্র খরচ বাড়ায় নানা ধরনের জনকল্যাণমুখী কাজের দায় ঘাড়ে নিয়ে (পেনশন, ভর্তুকি, বেকারভাতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি)। আজকের যুগের রাষ্ট্রকে এসব দায় ক্রমান্বয়ে ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে। যেখানে এসব দায় একেবারে ঝেড়ে ফেলে দেওয়া সম্ভব নয়, সেখানে ধীরে ধীরে এ দায় কমাতে হবে। নূতন কোনো দায় তো রাষ্ট্র আর ঘাড়ে নেবেই না।

প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার করে বাজার ব্যবস্থা যাতে জোরদার হয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে রাষ্ট্রকে। বাজার ব্যবস্থা জোরদার হলে দাহিদা এবং যোগানে ভারসাম্য আসবে। দাম স্থিতিশীল হবে। পুঁজির পক্ষে বাজার বুঝে বিনিয়োগ করার কাজটা সহজ হবে। বিনিয়োগ বাড়বে এর ফলে। বিনিয়োগ বাড়লে উৎপাদন বাড়বে। নিয়োগও বাড়বে। উৎপাদন বৃদ্ধির কল্যাণে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার বাড়বে— যে বৃদ্ধির সুফল কম বেশি সব নাগরিকই ভোগ করবে। রাষ্ট্রর কাজ বৃদ্ধি ঘটানো নয়, বৃদ্ধি যাতে ঘটে সেটা নিশ্চিত করা। অর্থনৈতিক বৃদ্ধি আসে বিনিয়োগের বৃদ্ধি মারফত— লগ্নিপুঁজির বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করেই যা অর্জন করা যায় আজকের যুগে। রাষ্ট্রকে তাই লগ্নিপুঁজি যাতে বিনিয়োগে উৎসাহী হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। জাতিরাষ্ট্রকে উন্নয়নের দায় নিতে হবে না, দায় নিতে হবে পুঁজিকে ধরে রাখার। সব জাতিরাষ্ট্রকেই এটা করতে হবে, কেননা লগ্নিপুঁজির অবাধ চলচলের নিয়ম চালু হবার পর জাতিরাষ্ট্র নয়, পুঁজিই বসে পড়েছে অর্থনীতির ড্রাইভারের সিটে। এটাই হলো নয়া উদারবাদী অর্থনীতির নির্যাস। আর এর বিরুদ্ধেই হইচই উঠেছে বিশ্বজুড়ে, জাতিরাষ্ট্র যাঁরা চালান তাঁরাও ঢোঁক গিলে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন যে এভাবে চলতে গিয়ে সমস্যা বাড়ছে, রাষ্ট্রর ন্যায্যতা রক্ষা করাই কঠিন হয়ে উঠছে। কোথাও কোথাও তো উল্টো যাত্রাই শুরু হয়ে

গিয়েছে। লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে 'ওয়াশিংটন ঐকমত্য'-এর কথা এখন তো রাষ্ট্রনীতি-প্রণেতাদের কাছে একটি নিষিদ্ধ কথায় পরিণত হয়েছে। কেন এরকম ঘটছে, সেটা আমরা এবার আলোচনা করব।

একবিংশ শতকের পুঁজিবাদ : সংকট এবং আরও সংকট

প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার মারফত একটা নিখুঁত বাজার ব্যবস্থা গড়ে তুলে রাষ্ট্র যদি অর্থনীতি থেকে হাত তুলে বসে থাকে এবং পুঁজিকে যদি অর্থনীতির ড্রাইভারের সিটে বসিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কি ব্যবস্থাটি ঠিকঠাক চলবে? এমনকি উনবিংশ শতকের তাত্ত্বিকরাও এ বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন। নিখুঁত বাজার কী করতে পারে? চাহিদা এবং যোগানে ভারসাম্য আনার কথা বাজার ব্যবস্থা মারফত। বাজার যত নিখুঁত হবে, তথ্য তত সহজলভ্য হবে এবং ক্রেতা-বিক্রেতাদের যোগাযোগটা সহজ হবে, দামের ওঠানামাটাও মোটের ওপর উৎপাদন ব্যয়ের কাছাকাছিই থাকবে। কিন্তু সেটা অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখবে, কাজের অভাবে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে হবে না কাউকেই, খেয়ে পড়ে বেঁচেবর্তে থাকার ন্যূনতম অধিকার নিশ্চিত করা যাবে সবারই— এটা ভাবার কোনো কারণ নেই। বাজার ভারসাম্য আনে চাহিদা যোগানে। কিন্তু চাহিদা সৃষ্টির পেছনে যে শক্তিটি কাজ করে, বাজারের হাতে তাকে ছেড়ে দিলে এই ভারসাম্য রাখাটাই কঠিন হবে; বৃদ্ধির সোজা সড়ক ছেড়ে অর্থনীতিটি মন্দার গাড্ডায় পড়ে যেতে পারে এর ফলে। কারণ কী সেটা বলা দরকার। চাহিদা সৃষ্টি হয় আয় থেকে। আয়ের বণ্টন যেমন হবে, পণ্যের চাহিদাও আসবে সেই মতো। প্রাক্ পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে আয়ের বণ্টনে একটা বড় ভূমিকা পালন করত অর্থনীতি বহির্ভূত জোরজুলুম। পুঁজিবাদ সেটাকে এনেছে বাজারি নিয়মের আওতায়। কিন্তু নিয়মটা দাঁড়িয়েছে এরকমই যে আয় বণ্টনে পুঁজির হিস্যা থাকবে বেশি, উৎপাদন যারা করে সেই শ্রমজীবীদের হিস্যা থাকবে কম। শ্রমজীবীদের হিস্যা কম থাকলে চাহিদার ক্ষেত্রে ভোগ্যপণ্যের চাহিদার বৃদ্ধির হার কম থাকবে। বাজার সেক্ষেত্রে চাহিদা যোগানে ভারসাম্য আনবে যোগানকারীকে (উৎপাদককে) যোগান অর্থাৎ উৎপাদন কমানোর সংকেত পাঠিয়ে। পুঁজি যে আয়টা করে সেটা অবশ্যই অন্য একদিকে চাহিদা সৃষ্টি করে। পুঁজি যে আয় করে তাকে বলা হয় লাভ। লাভের একটা সামান্য অংশ ভোগ্যপণ্যের চাহিদা সৃষ্টি করে, বাকি বড় অংশটা যায় পুনর্বিনিয়োগে। ভোগ্যপণ্যের মোট চাহিদার গতিপ্রকৃতি পুঁজির মালিকদের ভোগ্যপণ্যের চাহিদা দিয়ে নির্ধারিত হয় না, সেটা নির্ধারিত হয় শ্রমজীবীদের আয় বা মজুরি দিয়ে। শ্রমজীবীদের আয় বৃদ্ধির হার মন্থর হলে ভোগ্যপণ্যের বাজারে যে চাহিদা-স্বল্পতা দেখা দেয়, পুঁজির মালিকদের ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি হলেও সেটা পূরণ হয়ে যায় না। শ্রমজীবীর আয় কমলে কিংবা শ্রমজীবীদের মোট ক্রয়ের বৃদ্ধির হার মন্থর হলে ভোগ্যপণ্যের বাজারে চাহিদা-যোগানে ভারসাম্য আসবে যোগান ক'মে (কিংবা যোগান বৃদ্ধির হার ক'মে), যেটা শেষ পযন্ত ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন কমাবে (কিংবা উৎপাদন বৃদ্ধির হার মন্থর করবে)। লাভের যে অংশটা পুনর্বিনিয়োগ হয় তা থেকে উৎপাদনের অ-শ্রম উপাদানের একটা চাহিদা বৃদ্ধি ঘটাতে পারে এবং সেই সূত্রে নতুন উৎপাদন নতুন নিয়োগ সৃষ্টি ক'রে ভোগ্যপণ্যের একটা বাড়তি চাহিদা তৈরি করতে পারে। কিন্তু তাতেও সমস্যাটা মিটবে না। সেখানেও শ্রমিকের হিস্যা কম থাকায় আগের ছকটারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে। শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে যে ভোগ্যপণ্যের বাজারে চাহিদা না থাকার কারণে লাভের আয় পুনর্বিনিয়োগের পথই সংকুচিত হয়ে পড়ছে এবং অর্থনীতি সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছে বাজার ব্যবস্থা নিখুঁত হওয়া সত্ত্বেও, এবং পুঁজির ওপর রাষ্ট্রের খবরদারি বন্ধ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও। পুঁজিকে ড্রাইভারের সিটে বসতে দিলে এটাই ঘটবে বাজার ব্যবস্থা নিখুঁত হওয়া সত্ত্বেও। বরং বলা যায়, রাষ্ট্র যদি অর্থনীতির ওপর খবরদারি করার অধিকারটা বজায় রাখে তাহলে এই অবস্থায় রাষ্ট্র আয়ের পুনর্বণ্টন ঘটিয়ে এবং পুনর্বিনিয়োগের পথ খুঁজে না পাওয়া পুঁজিকে কাজে লাগিয়ে এই সংকটকে কিছুটা হলেও সামাল দিতে পারে। লাভের একাংশ কর হিসেবে তুলে সেটা শ্রমজীবীদের চাহিদাবৃদ্ধির কাজে লাগানো, ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমে থাকা যে অর্থ বিনিয়োগের পথ পাচ্ছে না, সরকারি বন্ড বিক্রি ক'রে সেই অর্থ রাজকোষে এনে তা দিয়ে সরাসরি নিয়োগ সৃষ্টির কাজে লাগানো— এগুলোই হলো রাষ্ট্রের হাতে মজুত থাকা অস্ত্র, যা দিয়ে সেই উনবিংশ শতক থেকেই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি এই ধরনের সংকট মোকাবেলা করেছে। উন্মত্ত নয়া উদারবাদ এই অস্ত্রগুলিই কেড়ে নিতে চায় রাষ্ট্রর হাত থেকে। রাষ্ট্র যেহেতু শ্রেণীর উর্ধ্বে উঠে থাকা কোনো প্রতিষ্ঠান নয়, রাষ্ট্র যেহেতু পুঁজিবাদের স্বার্থরক্ষার প্রতিষ্ঠান, পুঁজি, কিংবা আরও নির্দিষ্ট করে বললে, লগ্নিপুঁজির বিশ্বজয়ের প্রবণতাকে মদত দেবার স্বার্থে রাষ্ট্র এই নীতি গ্রহণ করেছিলো (বা রাষ্ট্রকে দিয়ে এই নীতি গ্রহণ করানো হয়েছিলো) যে তার দায়িত্বকে সে সীমিত রাখবে লগ্নিপুঁজি যাতে বিনিয়োগে উৎসাহী হয়, স্রেফ সেটুকু নিশ্চিত করার মধ্যে। বণ্টন ব্যবস্থা এবং উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যেকার চিরস্থায়ী দ্বন্দ্বের কারণে হাজার বাজারমুখি সংস্কার সত্ত্বেও পুঁজিকে ড্রাইভারের সিটে বসিয়ে দিলে উৎপাদন বৃদ্ধির মসৃণ সড়ক থেকে অর্থনীতি যে মন্দার গাড্ডায় পড়ে যেতে পারে এবং সে অবস্থায় রাষ্ট্র ছাড়া অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান যে এই অর্থনীতিকে টেনে তুলতে পারে না, এই চিরায়ত সত্যটিই অবান্তর করার চেষ্টা করেছিল নয়া উদারবাদ।

নয়া উদারবাদী মতাদর্শচালিত অর্থনৈতিক নীতি উৎপাদন

ও বণ্টনের সমাধানহীন দ্বন্দ্বের বাস্তবতাকে পাশ কাটিয়ে অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখার পথ খুঁজেছিল 'লাভজনক বিনিয়োগ ক্ষেত্র' খোঁজার সমস্যাটিকে অন্যভাবে সমাধান করার পন্থা খুঁজে। উদ্বৃত্ত লগ্নিপুঁজি উৎপাদন ক্ষেত্রের বাইরে এনে অর্থের (finance) বাজারে একটার পর একটা 'পণ্য' সৃষ্টি করা (শেয়ারের ভবিষ্যৎ বাজার, মুদ্রার বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ বাজার, 'অপশন'-এর বাজার ইত্যাদি), জল-জমি-জঙ্গল কেনা (লুঠ করা), তৈরি হয়ে যাওয়া সম্পদের হাত বদল (বিত্ত বাজার)— এই সব নিয়ে গড়ে তোলা হ'লে এক বিচিত্র পণ্যজাল, যে জালটি ছড়ানো হলো বিশ্বায়িত বাজারে। এসব থেকে ভোগ্যপণ্যের বাজার কিছুটা চাঙ্গা রাখা গেল বটে কিন্তু সমস্যা এলো দুদিক থেকে। প্রথমত, লাভের অঙ্ক বাড়াবার তাড়নায় লগ্নিপুঁজির অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতার তীব্রতা বাড়লো; বাজার যত বিশ্বায়িত হলো এই প্রতিযোগিতা ছড়িয়ে পড়লো সারা বিশ্বে। এই যুদ্ধে জয়লাভের উপায় হলো উৎপাদনের মূল ক্ষেত্রকে যতটা সম্ভব পুঁজি-ঘন করা আর বাকি ক্ষেত্র, যেটা শ্রম-ঘন উৎপাদনের আওতায় পড়ে, তাকে উৎপাদনের মূল বৃত্তের বাইরে ঠেলে দেওয়া। যেখানে থাকবে অসংগঠিত ক্ষেত্রের উৎপাদন। নিট ফল দাঁড়াল এই যে, আয় বৈষম্য তীব্রতর হল এবং পিরামিডের নীচের দিকে থাকা শ্রমজীবীর চাহিদা সৃষ্টির ক্ষমতা কমলো। ভোগ্যপণ্যের বাজারে দুটি স্তর তৈরি হলো, যার ওপরের দিক থেকে চাহিদার কিছুটা ত্বরণ আসে কিন্তু নীচের দিকে আসে চাহিদা সংকোচন। আয় বৈষম্য তীব্রতর হল এবং একই সাথে এলো চাহিদা স্বল্পতা, কেননা পিরামিডের ওপরের অংশের চাহিদা সৃষ্টি করার ক্ষমতা যত বেশিই হোক না কেন নীচের অংশের চাহিদা সংকোচনকে সামাল দেবার ক্ষমতা তার নেই।

দ্বিতীয় যেটা ঘটলো সেটা হলো বাজারি অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি এবং একই সঙ্গে তথ্য গোপন ক'রে তথ্য অসমতা বৃদ্ধি— যার দরুন যে কোনো সময় বাজার ব্যবস্থায় ধ্বস নামার সম্ভাবনা। চাহিদা-স্বল্পতার সমস্যাকে পাশ কাটাতে গিয়ে এক ধরনের সব বিনিয়োগ ক্ষেত্র খোলা হল, যার অধিকাংশই হলো অর্থের বাজার কেন্দ্রিক, যেগুলি ফাটকা নির্ভর, যেগুলির পেছনে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই। এসব ক্ষেত্রে 'নিখুঁত বাজার' তত্ত্ব কার্যকর নয়। এসব ক্ষেত্রে যে কোনো সময় চাহিদা-যোগানের ভারসাম্য ভেঙে ব্যবস্থাটা ভেঙে যেতে পারে যদি না তার ওপর কোনো নজরদারি থাকে। একই ঘটনা ঘটতে পারে তথ্য গোপন করার সুযোগ থাকলে (লেহন ব্রাদার্স যে সুযোগ নিয়েছিল)। নয়া উদারবাদী মুক্ত অর্থনীতি, নজরদারিহীন অর্থনীতি, জাতিরাষ্ট্রকে পাশ কাটাতে চাওয়া লগ্নিপুঁজির বিশ্ব অর্থনীতি এই বিপদটাই নিয়ে এলো। এটিকে নিয়ন্ত্রণে না আনলে বিশ্ব অর্থনীতিই যে বিপন্ন হয়ে পড়বে ২০০৮-এর পর তা স্পষ্ট হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, ২০০৮-এর মন্দা এটাও বুঝিয়ে দিলো যে মন্দার গাড্ডায় পড়া লগ্নিপুঁজি নিজেই এই মন্দা কাটিয়ে উঠতে পারবে এত ক্ষমতা তার নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই মন্দা কাটাতে ৭.৭ ট্রিলিয়ন ডলার ঢালতে হয়েছে রাষ্ট্রকে এইসব আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে আবার গড়ে তুলতে।

এইসব ঘটনা এমনকি উন্নত পুঁজিবাদী দেশেও রাষ্ট্রকে পুনঃশিক্ষিত করছে। এমনকি পুঁজির স্বার্থ রক্ষা করতে হলে যে রাষ্ট্রকে তার নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করতে হবে, সেটা এখন স্পষ্ট হচ্ছে। নয়া উদারবাদী মতবাদের বিরুদ্ধে কেইনসীয় মতবাদভিত্তিক তত্ত্বচর্চার গুরুত্ব যে বাড়ছে অ্যাকাডেমিক মহলে, তার কারণ এটাই। কিন্তু সমস্যা হলো, বিশ্বায়িত লগ্নিপুঁজিকে জাতি-রাষ্ট্রর শাসনে বাঁধা কতটা সম্ভব? বলা যেতে পারে যে, মুদ্রার পূর্ণাঙ্গ রূপান্তরযোগ্যতার নিয়ম রদ করে আবার সেই পুরোনো ব্যবস্থায় ফেরা এখন, এই অবস্থায়, একেবারেই অসম্ভব। যে কথাটা নিয়ে জোর আলোচনা চলছে তা হলো বিশ্বায়িত বাজার অর্থনীতির নিয়ম বুঝে জাতিরাষ্ট্রকে তার রাষ্ট্রের চৌহদ্দির মধ্যে পুঁজিকে শাসনে রাখার উপায় উদ্ভাবন করতে হবে— চীন যেমন করছে— যাতে করে বিশ্বায়িত বাজার অর্থনীতির সুবিধেগুলো যেমন পাওয়া যায় তেমনই আবার এই বিশ্বায়িত লগ্নিপুঁজি-সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা ও অনিশ্চয়তাকেও যতটা সম্ভব আটকে দেওয়া যায়। ২০০৮-এর বিশ্বমন্দার ধাক্কা চীন সামলেছিল তার আর্থিক বাজারকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণে রেখে, একই সঙ্গে বাণিজ্য মন্দা সৃষ্ট উৎপাদন সংকোচন রোধ ক'রে অভ্যন্তরীণ নিয়োগের বাজারকে সে মজবুত রেখেছিল দ্রুত রাষ্ট্রীয় খরচ বাড়িয়ে (রাজকোষে ঘাটতি না রাখার তত্ত্বকে একেবারেই উড়িয়ে দিয়ে)। সারা পৃথিবীর পুঁজিবাদী অর্থনীতিগুলিতে এ নিয়ে বহু আলোচনা হচ্ছে। এমন এই কথাটা খুব চালু হয়েছে যে বাজার ব্যবস্থার দাসত্ব করা নয়, বাজার ব্যবস্থা যাতে অর্থনীতির দাসত্ব করে সেটা নিশ্চিত করতে হবে।

উৎপাদন ও বণ্টনের দ্বন্দ্ব এবং বাজারতন্ত্র

কিন্তু এসব সত্ত্বেও সমস্যাটা থেকেই যাবে এবং কালক্রমে তা তীব্রতর হবে যদি উৎপাদন এবং বণ্টনের এই সমাধানের অতীত দ্বন্দ্বের নিরসনের জন্য বিকল্প একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু না করা হয়। এই প্রসঙ্গেই আসে সমাজতন্ত্রের কথা, যা নিয়ে আমরা এই প্রবন্ধের অবশিষ্ট অংশে আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে বলা দরকার, আজকের বাস্তবতা এই যে উৎপাদন এবং বণ্টনের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়ে উঠেছে এই লগ্নিপুঁজির বিশ্বায়নের যুগে। বিশ্বায়নের এই বোলবোলাও-এর যুগে আয়বৈষম্য অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি হারে বাড়ছে। এখন সারা পৃথিবীতে মাত্র ৮০ জন ব্যক্তির হাতে যা সম্পদের মালিকানা আছে, পৃথিবীর অর্ধেক

মানুষ (১.৫ বিলিয়ন)-এর সম্মিলিত সম্পদের পরিমাণ তার সমান। এ পরের দিকের ১ শতাংশের হাতে আছে সময় সম্পদের ৪৮ শতাংশ, পাঁচ বছর আগেও যা ছিলো ৪৪ শতাংশ— বৃদ্ধির হার বছরে প্রায় ১ শতাংশ। গত ৯০ বছরের বিশ্বায়ন দেশের অভ্যন্তরে এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে আয়বৈষম্য বাড়িয়েছে নজর কাড়া হারে। জাতীয় আয়ে মজুরির অংশ ক্রমাগত কমছে, বাড়ছে লাভের অংশ— যে লাভের ওপর ট্যাক্স বসানোর ক্ষমতাও নেই জাতিরাষ্ট্রের (কেন না তাতে ভুল বার্তা যায় লগ্নি পুঁজির কাছে)। এসব থেকে এ সিদ্ধান্তে আসার সঙ্গত যুক্তি থাকে যে উৎপাদন ও বণ্টনের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব তীব্রতর হচ্ছে এই বিশ্বায়নের পৃথিবীতে, যা সংকটের পর সংকট সৃষ্টি করবে বিশ্ব জুড়ে। জাতিরাষ্ট্র যদি আবার তার হৃত অস্ত্রগুলি পুনরুদ্ধার করে, তাহলে সমস্যায় কিছুটা সামাল দেওয়া যায় কিন্তু তৎসত্ত্বেও মন্দার হাত থেকে অব্যহতি পাওয়া যাবে না। সেটার জন্য চাই একটা বিকল্প অর্থনীতি গড়া যেখানে এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে পাকাপাকিভাবে। কিন্তু সমস্যা হলো বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে, পুঁজি শাসিত যে সমাজে আমরা বাস করি তার বাইরে অন্য কোনো সমাজ গড়ে তোলা আদৌ সম্ভব কিনা, এ নিয়ে তীব্র সংশয় দেখা দিয়েছে এই একবিংশ শতকের পৃথিবীতে। মোটের ওপর ধারণাটা এই রকম দাঁড়িয়েছে যে পুঁজি শাসিত বাজার অর্থনীতি নিয়ে অনেক সমস্যা আছে যদিও, মানব সমাজকে বাঁচতে হবে এরকম একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেই। এই ব্যবস্থার ত্রুটি যা আছে সেগুলো মেরামত করার চেষ্টা করা যায়। ব্যবস্থাটার মধ্যেই বিভিন্ন ধরনের 'স্টেক হোল্ডার'-দের স্বার্থ যাতে যথাসম্ভব রক্ষা করা যা তার জন্য উদ্যোগও নেওয়া যায়, কিন্তু এটাকে বদলে দিয়ে অন্য কোনো একটা সমাজ গড়া যায় যেটার চালকের আসনে বসতে পারে শ্রমজীবী মানুষ— এ বিশ্বাস ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে উঠছে বর্তমান সমাজে। দারিদ্র্য, কর্মহীনতা, সুযোগের অসাম্য এসব কোনো দিনই দূর হবে না; বড়জোর যা হতে পারে তা হলো খেতে না পাওয়া মানুষের সংখ্যা যাতে কমে তার জন্য আর্থিক প্রকল্প গড়া; কর্মহীনতার অবসান নয়, কর্মহীনকে বেকার ভাতা দেওয়া; সুযোগের অসাম্য, সম্পদের অসাম্য এসব দূর করা যাবে না, যার বেশি আছে তার 'কপাল ভালো', যার বেশি আছে তার 'ঈশ্বর-দত্ত' ক্ষমতা বেশি— এসব ভেবেই সান্ত্বনা পেতে হবে। মোটের ওপর এইসব ভাবনাচিন্তার জোর বাড়ছে সমাজে। এমনকি বামপন্থী মতাদর্শের মানুষরাও এসব চিন্তার সঙ্গে আপস করে 'বাস্তবসম্মত' হ'য়ে ওঠার চেষ্টা করছেন, একথা ভাবার সঙ্গত কারণ দেখা দিয়েছে এই একবিংশ শতকের সূচনাকালের পৃথিবীতে। সমাজতন্ত্র এখন যেন একদল পরাজিত মানুষের মতাদর্শ, সমাজ যাদের অনুকম্পা করে বাঁচিয়ে রেখেছে। সমাজতন্ত্র যেন বামপন্থীদের জোরের জায়গা নয়, ওটা তাঁদের সযত্নলালিত দুর্বলতা, যে দুর্বলতা সত্ত্বেও আজকের এই পুঁজিশাসিত সমাজে তাঁরা বেঁচে থাকেন এই সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলিকে মূলধন ক'রে।

মানুষের চিন্তার জগতকে নয়া উদারবাদী মতাদর্শ যেভাবে দখল ক'রেছে, বামপন্থীদের একটা বড় অংশ যেভাবে এই মতাদর্শের দাপট সয়ে বেঁচে থাকার উপায় খুঁজতে গিয়ে কিছু আদি সত্য বিস্মৃত হ'চ্ছেন, সেই প্রেক্ষিতটা মনে রেখেই সমাজতন্ত্রের জোরের জায়গাটা কী, কেন সোভিয়েতের বিপর্যয় সত্ত্বেও সেই জোরের জায়গাটা চলে যায় না, আলোচনা করা হচ্ছে।

যে প্রশ্নের উত্তর খোঁজে সমাজতন্ত্র

একথা অনস্বীকার্য যে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সাহায্য মানবসভ্যতা উৎপাদনের জগতে আশ্চর্যজনক অগ্রগতি ঘটিয়েছে। সভ্যতার আদিযুগ থেকে এই অগ্রগতি প্রায় একমুখী, যদিও এই অগ্রগতির নানা পর্যায়ে তার বিকাশ ঘটেছে নানা ভাবে। কখনও এই অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিপুল উল্লম্ফল ঘটেছে, কখনও বা তার বিকাশের গতি মন্থর হয়ে পড়েছে। কিন্তু সে যা-ই হোক, উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্রমশ বিকাশ যে ঘটেছে এবং তার মধ্য দিয়ে পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির পরিস্থিতি যে ক্রমশ মজবুত হ'য়ে উঠেছে, সভ্যতার ইতিহাসে তা একটি অনস্বীকার্য ঘটনা। এই অগ্রগতি যে ঘটতে পেরেছে তার মূল কারণ মানুষের উদ্ভাবনী ক্ষমতা। মানুষ উদ্ভাবন করতে পারে এবং তার জন্যই সে প্রকৃতিকে নিজের বশে আনার ক্ষমতা রাখে। জীবজগতের অন্য প্রজাতির সে ক্ষমতা নেই। সে কারণে তাদের বাঁচতে হয় প্রকৃতির দাসত্ব ক'রে। উদ্ভাবনী ক্ষমতার বলে বলীয়ান মানুষ এই দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভের ক্ষমতা রাখে। মানব সভ্যতার ইতিহাস হলো এই ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত উৎকর্ষ বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে প্রকৃতির দাসত্ব থেকে ক্রমমুক্তি লাভের ইতিহাস।

যে সমস্যা থেকে গেছে এবং বিপুল উদ্ভাবনী ক্ষমতা সত্ত্বেও যে সমস্যা থেকে মানব সভ্যতা অব্যাহতি পায়নি সেটা এই যে, উৎপাদনের প্রায় একমুখী এবং অত্যাশ্চর্য অগ্রগতি সত্ত্বেও উৎপাদন বৃদ্ধির এই সুফল মানব সমাজের সর্বত্রগামী হ'য়ে ওঠেনি। বিপুল যে কর্মযজ্ঞ চলে সারা পৃথিবী জুড়ে, এমনকি এই একবিংশ শতকে দাঁড়িয়েও স্বীকার করতে হবে, সে কর্মযজ্ঞে সবার আমন্ত্রণ থাকে না। সব মানুষের জন্য নিয়োগ সৃষ্টি করার উপায় কী, আজও মানুষ তা জানে না। উৎপাদনে এই বিপুল অগ্রগতি সত্ত্বেও জীবনযাপনের ক্ষেত্রে ন্যূনতম স্বাচ্ছন্দ্য যাঁদের নিশ্চিত নয়, বিষণ্ণমুখ সেই মানুষের বাজার কেন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়, মানবসভ্যতা এখনও তার উত্তর খুঁজে পায় না। এত যে সম্পদ মানুষ অর্জন করেছে তার বণ্টনে কেন এই বিপুল অসাম্য? এত উদ্ভাবনী ক্ষমতা সত্ত্বেও এই ধরনের সমস্যার সমাধান কেন খুঁজে পায় না মানব সমাজ?

সমাজতন্ত্রের যাত্রাবিন্দু হলো এই প্রশ্নটি থেকে। উদ্ভাবনী ক্ষমতার সাহায্যে যে মানুষ উৎপাদনের জগতে বিপুল পরিবর্তন ঘটাতে পারে, সেই মানুষ তার সেই উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রয়োগ করেই এমন একটি সমাজ কি গড়ে তুলতে পারে না যেখানে সব হাতে কাজ থাকে, সব মানুষ যেখানে সভ্যতা-অর্জিত জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্য সমানভাবে ভাগ করে নিতে পারে। সমাজতন্ত্র চায় এই প্রশ্নটির উত্তর খুঁজতে। একবিংশ শতকের পুঁজিবাদ যত বেশি করে উৎপাদন ও বণ্টনের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব তীব্রতর করে তুলছে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা আরও বেশি জরুরি হয়ে পড়েছে।

কেন সমাজতন্ত্র

প্রশ্নটির একটা সোজা উত্তর দিয়ে নিশ্চিতমুখে বসে থাকেন সেই মানুষরা, যাঁরা এই অসাম্যর উৎস খোঁজেন প্রাক্-আধুনিক যুগের ঈশ্বরশাসিত সমাজ যেভাবে বিষয়টি বুঝত, সেই পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে। ইদানিং এই নয়া উদারবাদের যুগে এই মানুষদের গলার জোরও বেড়েছে। উত্তর যেটা দেওয়া হয় সেটা এই রকম যে সমস্যাটা একেবারে বুনিয়াদি সমস্যা, চাইলেই যা মিটিয়ে ফেলা যায় না, যে সমস্যা মানব সমাজের সহজাত, মানব সমাজকে যা নিয়েই চলতে হবে। কথাটা সহজ করে বললে যা দাঁড়ায় সেটা এই রকম। মানুষে মানুষে প্রকৃতিদত্ত (বা ঈশ্বরদত্ত) তফাৎ থাকে। এ তফাৎ মেধার তফাৎ, কাজ করতে পারার ক্ষমতার তফাৎ। যাদের মেধা বেশি, যারা বেশি কর্মদক্ষ, উৎপাদনের অগ্রগতি যে পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করে, সে সুযোগটির সুফল বেশি করে বর্তায় এই মানুষদের ওপর। বুনিয়াদে অসাম্য আছে মেধা ও কর্মদক্ষতায়, স্বাচ্ছন্দ্য বণ্টনে অসাম্য দেখা দেয় এই কারণেই। মানুষের সাধ্য নেই এই অসাম্য দূর করার। সবাই যে কাজ পায় না, তার কারণটিও নিহিত আছে এই মৌলিক অসাম্যে। যারা অদক্ষ, অপদার্থ— যদি ভাবা হয় যে 'সব হাতে কাজ'-এর আদর্শ মেনে তাদের কাজ দেব, তাহলে উৎপাদন ব্যবস্থাটিই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এদের দিয়ে কাজ করাতে গেলে উৎপাদন ব্যয় বাড়বে, কেননা এরা কাজ করবে কম, সময় নেবে বেশি, রসদ খরচ করবে বেশি— সীমিত রসদে টানাটানি পড়বে, কাজের মানও ভালো হবে না। তবুও যদি এটাই চালিয়ে নেওয়া হয় সবাইকে কাজ দেবার আদর্শ রক্ষার তাগিদে, তাহলে দেখা শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে অদক্ষতার মাশুল গুনতে গিয়ে অর্থনীতিটিই বিপন্ন হয়ে পড়েছে। সুতরাং এদের বাদ দিয়েই চালাতে হবে উৎপাদন ব্যবস্থাটি। বড় জোর যা করা যায় তা হলো এদের জন্য বেকার ভাতা, খাদ্যভাতা বা এই গোছের কিছু রিলিফ দেওয়া। পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য এদের সঙ্গে সমানভাবে ভাগ ক'রে নেবার প্রশ্নই ওঠে না।

এই সোজা উত্তরটা যে একেবারেই অজ্ঞতা কিংবা দুরভিসন্ধি প্রসূত, সে নিয়ে সন্দেহ নেই। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক টমাস পিকেত্তির আলোড়ন সৃষ্টিকারী গবেষণার পর অন্তত একথা বলার কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না যে মেধাগত বা দক্ষতাগত ব্যবধান থেকেই পৃথিবীতে এই তীব্র অসাম্য বিদ্যমান। পিকেত্তি দেখিয়েছেন (Capital in the Twenty-First Century) সম্পদের মালিকানা যাদের হাতে, উৎপাদন বৃদ্ধির সুফলটুকু তাদের হাতেই বেশি বেশি করে জমা হয়। মাঝে মাঝে এদের আয়ের ওপর ট্যাক্স চড়িয়ে কিংবা আইন করে শ্রমজীবীদের হিস্যা কিছুটা বাড়ানোর চেষ্টা করা হয় বটে, কিন্তু তাতে অবস্থার খুব বেশি হেরফের হয় না। উদ্ভাবনী ক্ষমতার সাহায্যে মানুষ উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যে চমকপ্রদ সাফল্য অর্জন করেছে, তার সুফলটা কুক্ষিগত করে তারাই, যাদের হাতে আছে উৎপাদী সম্পদের মালিকানা। যোগ করা যায় যে নয়া উদারবাদী অর্থনীতির এই বোলবোলাও-এর যুগে এই প্রবণতা বাড়ছে দ্রুততর গতিতে। কর্মদক্ষতা, মেধা— এসব নয়, উৎপাদন বৃদ্ধির সুফল আসলে পুঁজির করায়ত্ত।

ইদানিং এই কথাটা খুব জোর দিয়ে বলা হয় যে মানব সম্পদের উৎকর্ষ বৃদ্ধির সাথে সাথে আয় বৈষম্য কমছে, কমছে সম্পদ বণ্টনের অসাম্যও। মানব সম্পদের উৎকর্ষ বৃদ্ধি ঘটে প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং দক্ষতার প্রসারের মধ্য দিয়ে। এটার প্রসার ঘটলে উৎপাদন করার ক্ষমতার বৈষম্যও কমে। মেধাগত বা দক্ষতাগত ব্যবধান থাকার ফলে চরম সাম্য আসবে না ঠিকই কিন্তু একেবারে দূর না হ'লেও, এর ফলে আয়বৈষম্য কমে; ফলত সম্পদবণ্টনের অসাম্যও কমে। একবিংশ শতকের পৃথিবীতে যে হারে প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতার প্রসার ঘটছে পৃথিবী জুড়ে তাতে এটা ভাবা যেতে পারেই যে পুঁজি নয়, আয়বৃদ্ধির সুফল বেশি করে এসে পড়বে মানব সম্পদের অধিকারী যে শ্রমজীবী তাদের হাতে; শ্রমজীবীদের মধ্যেও প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতার দ্রুত প্রসারের ফলে আয় বৃদ্ধির এই সুফল অসাম্য কমিয়ে আনবে। তফাৎ যা থেকে যাবে তার উৎস মেধাগত তফাৎ, তবে এই তফাৎ অসহনীয় হবে না কখনই।

টমাস পিকেত্তি এই বিষয়টি নিয়েও গবেষণা করেছেন। পিকেত্তির বক্তব্য, তাত্ত্বিক বিচারে এই কথাটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মানবসম্পদের উৎকর্ষ বৃদ্ধির ফলে অসাম্য কমার প্রবণতা যতটা জোরদার, তার চেয়ে অনেক বেশি জোরদার হলো পুঁজির ওপর দখল থাকার কারণে অসাম্য বৃদ্ধির প্রবণতা। এটা বোঝা যায় এই পরিসংখ্যান থেকে যে 'inherited wealth comes to close to being as decisive at the beginning of the twenty first century as it was in the age of Balzac's Pire Goriot' (Page 22).'

মানব সম্পদের উৎপর্ষ বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে সামাজিক অসাম্য

কমছে, একথা সত্য নয়। বরং বলা যায়, এই উৎকর্ষ বৃদ্ধির কথা বলে 'কর্মদক্ষতা', 'মেধা' ইত্যাদির অজুহাত তুলে আক্রমণ তীব্রতর ক'রে তোলা হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষের পর। আক্ষরিক অর্থেই আজ 'যার হাত আছে তার ভাত নেই'-এর ঘটনা বাড়ছে সারা পৃথিবী জুড়ে। উৎপাদী সম্পদের ওপর যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মালিকানা, তার সূত্র ধরেই আসছে এই অসাম্য, আর এই অসাম্য দূর করার উপায় হলো উৎপাদী সম্পদের ওপর থেকে ব্যক্তি মালিকানার অবসান ঘটানো, এই সম্পদকে সমাজের সবার মঙ্গলবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো— যাতে উদ্ভাবনী ক্ষমতার সাহায্যে মানুষ উৎপাদনের কাজে যে চমকপ্রদ অগ্রগতি ঘটিয়েছে, তার সুফলকে সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া যায়। বলা বাহুল্য, সমাজতন্ত্র ঠিক এটাই চায়। উদ্ভাবনী ক্ষমতার সাহায্যে মানুষ উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে চমকপ্রদ অগ্রগতি ঘটিয়েছে, তার সুফল সর্বত্রগামী করার জন্য প্রয়োজন হলো উৎপাদী সম্পদ (পুঁজি)-এর ওপর যে ব্যক্তিমালিকানা আছে এটিকে সামাজিক মালিকানায় নিয়ে আসা, যাতে এই সম্পদকে কাজে লাগিয়ে সমাজের সব মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য আনা যায়। সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক নির্যাস এটাই।

সমাজতন্ত্র : কর্মসূচিত প্রণয়নের সমস্যা

সমস্যা হলো, বোধের জগতে বা তত্ত্বের জগতে এই কথাগুলো যত সহজে নিয়ে আসা যায়, ফলিত ক্ষেত্রে বা প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই লক্ষ্যে একটা বাস্তবসম্মত কর্মসূচি প্রণয়ন করা ততটাই কঠিন, কতটা যে কঠিন, সোভিয়েত রাশিয়ার অভিজ্ঞতায় তার প্রমাণ আছে। কিন্তু কঠিন কাজ এবং অসম্ভব কাজ— এ দুটো কথা এক নয়। উৎপাদী সম্পদের ওপর থেকে ব্যক্তি মালিকানার অবসান ঘটিয়ে তার ওপর সামাজিক মালিকানা কায়েম করা কঠিন কাজ; কিন্তু যুক্তি দিয়ে বোঝা যায়, কাজটা অসম্ভব কাজ নয়। মানুষের যে উদ্ভাবনী ক্ষমতা উৎপাদনের জগতে বিপ্লব ঘটিয়েছে, সেই উদ্ভাবনী ক্ষমতাই আর একটা বিপ্লবও ঘটাবে। এই বিপ্লবটি হলো বণ্টন ব্যবস্থার বিপ্লব। এটা এমন একটা বিপ্লব, যা প্রতিটি মানুষের জন্য একটা বাসযোগ্য পৃথিবী নির্মাণের ব্যবস্থা করে।

কীভাবে সেটা ঘটবে, তার কোনো তৈরি ছক নেই। তত্ত্ব এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা— এ দুয়ের মিলনে উদ্ভাবনী ক্ষমতার সাহায্যে মানুষকে এটা তৈরি করতে হবে। বলা যায় যে, যখন যে দেশে এটা ঘটবে তখন সেখানকার নির্দিষ্ট পরিস্থিতি এবং স্থানভিত্তিক বাস্তবতার একটা বড় ভূমিকা থাকবে এই ব্যবস্থাটি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে। কিছু সাধারণ কথা অবশ্যই বলা যায়। বিশেষত সোভিয়েতের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এখন এই একবিংশ শতকে সেই সাধারণ কথাগুলো উল্লেখ করা জরুরীও বটে।

উৎপাদী সম্পদের ওপর সামাজিক মালিকানা কায়েম করার কাজটা আপসে করা যাবে না, যে শ্রেণীর হাতে এই সম্পদের মালিকানা (ও নিয়ন্ত্রণ) আছে, তাদের বলপূর্বক ক্ষমতাচ্যুত ক'রে একটা পাল্টা রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করা হলো এই বিকল্প সমাজ গড়ার প্রাথমিক পূর্বশর্ত। কিন্তু যেটা মনে রাখা দরকার তা হলো— সম্পদের সামাজিক মালিকানা গড়ার কাজে রাষ্ট্রের ভূমিকা যদিও গুরুত্বপূর্ণ, রাষ্ট্রনেতা বা পার্টি-নেতারা হুকুম দিয়ে এই কাজ করিয়ে নিতে পারবে, একটা পাল্টা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবে, এটা মনে করার কোনো কারণ নেই। এই সমাজ যাদের সমাজ, সেই শ্রমজীবী মানুষদের ব্যাপক অংশগ্রহণ মারফত গড়ে তুলতে হবে এই নতুন সমাজটি। এর জন্য প্রয়োজন হবে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। সোভিয়েত দেশে এই বিকেন্দ্রীকরণের ওপর বাঞ্ছিত মাত্রায় জোর পড়ে নি। ফলত সমাজটি দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো একটি হুকুমচালিত সমাজে। হুকুম দিয়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়া যায় না।

দ্বিতীয় যে কথাটা মনে রাখা দরকার তা হলো, সোভিয়েত ব্যবস্থাটি ভেঙে পড়েছিলো উৎপাদন ব্যবস্থার অদক্ষতার কারণে। পরিকল্পনা ব্যবস্থা এই অদক্ষতা রোধে ব্যর্থ হয়েছিলো। কেন তা হয়েছিলো, এই প্রবন্ধে তা আমরা আলোচনা করছি না। এই কথাটা শুধু উল্লেখ করব যে যতদিন পর্যন্ত পরিকল্পনা মারফত উৎপাদন দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব না হবে, ততদিন পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি, উৎপাদন দক্ষতা অর্জনের বিকল্প যে হাতিয়ার, সেই বাজার ব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে চলতে পারবে না। এই বাজার ব্যবস্থা পুঁজিবাদী বাজার ব্যবস্থা থেকে পৃথক একটি বাজার ব্যবস্থা, সমাজকল্যাণের মূল লক্ষ্য থেকে যা কখনই বিযুক্ত নয়।

সমাজতন্ত্রের জন্য চাই নূতন মানুষ, যাঁরা উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রয়োগ ক'রে এই সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সমাজটি গড়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। মাও সে-তুং যে 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব'-এর কথা বলেছিলেন, তার তাৎপর্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। নূতন সমাজের জন্য চাই নূতন মানুষ, যে মানুষ ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে সামাজিক স্বার্থকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে, ব্যক্তিসম্পত্তি-ভিত্তিক মতাদর্শের বিরুদ্ধে যে মানুষ সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের পক্ষে দাঁড়ায়। এ মানুষ অবশ্যই আকাশ থেকে আবির্ভূত হবে না। শ্রমজীবী জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে যে সমাজ গড়ে ওঠে, সমাজের ভালোমন্দ নিয়ে চিন্তাভাবনা সে সমাজে বেশি থাকার কথা। রাষ্ট্রব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ শ্রমজীবী মানুষের ক্ষমতায়ন করে। এই ক্ষমতায়ন থেকেই আসে সমাজের ভালো-মন্দে অংশীদার হবার বাসনা। এই বাসনা যখন তীব্র হয়, পুরোনো মানুষই তখন ধীরে ধীরে নূতন মানুষে, সমাজতান্ত্রিক মানুষে রূপান্তরিত হতে থাকে। এই মানুষরাই পুঁজিবাদের পুনরুত্থানের বিরুদ্ধে অতন্দ্র প্রহরী হয়ে উঠে সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করে।

ধনতন্ত্র, হেজিমনি ও নৈতিকতা : গ্রামশি ও আলথুসার

শোভনলাল দত্তগুপ্ত

(একটি সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রচিত)

গ্রামশি এবং আলথুসারকে একসঙ্গে নিয়ে হেজিমনির বিষয়টি আলোচনা করলে সুবিধা হয়। ধনতন্ত্রে হেজিমনিকে বোঝার ক্ষেত্রে এই দুজনের যে অবদান, সেটা মাথায় রেখেই আমাদের বিষয়টি ভাবতে হবে। একটা কথা এখানে প্রাসঙ্গিক যে, যখন আমাদের মধ্যে গ্রামশি এবং সঙ্গে সঙ্গে আলথুসার চর্চা শুরু হল, তখন অবস্থাটা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আজকের চেয়ে আলাদা ছিল। তখন পৃথিবীতে যেমনভাবেই হোক একটা সমাজতান্ত্রিক শিবির ছিল। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভিত্তিক আন্দোলন ছিল, সাম্রাজ্যবাদ বনাম সমাজতন্ত্র, এরকম একটা ধারণা বিরাজ করত। সেই পরিবেশটা এখন আর নেই। তাই প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উঠতেই পারে যে যখন আমরা অতীতে গ্রামশি এবং আলথুসার নিয়ে চর্চা করেছি, তখনকার সেই রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিমণ্ডল এখন আর নেই। তা যদি না থাকে, তবে আজকে তাদের চিন্তা নিয়ে নতুন করে চর্চা করার প্রাসঙ্গিকতা কোথায়? এই প্রশ্নটা কিন্তু আজকে অনেকেই করছেন। আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় যে ঐ সময়টা, ঐ সময়ের পৃথিবীটা, যেরকমই থাকুক না কেন, গ্রামশি এবং আলথুসারের বক্তব্য যেরকম, সেটা ঐ সময়ে যেভাবে দেখা হত, আজকে কিন্তু সেটিকে অন্যভাবে দেখতে হবে। এই প্রাসঙ্গিকতার জায়গাটা যদি আমাদের বুঝতে হয়, আমাদের আলোচনাটা একটা বিষয়ের ওপর কেন্দ্রীভূত করতে হবে। তাহলে যাঁরা এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন বা পাঠকরা, যাঁরা বিষয়টি পড়বেন, তাঁদের বিষয়টি বুঝতে সুবিধে হতে পারে।

এই দুই চিন্তকই (গ্রামশি এবং আলথুসার) ধনতন্ত্রের দিনকে দিন উগ্রপন্থী হয়ে ওঠার বিষয়টি সামনে এনেছেন। গ্রামশি-র সময়ে আজকের নিও-লিবারালিজম বা নয়া-উদারনীতিবাদ ছিল না— আলথুসারের সময় তা সবে আসছে। আজকে এই নয়া-উদারনীতিবাদ যে ভয়ংকর আগ্রাসী চেহারা নিচ্ছে, এইটিকে বুঝতে গিয়ে যে দিকটি নিয়ে আমরা বেশি ভাবি তা হল এই নিও-লিবারেলিজম অর্থনীতির দিক থেকে কতটা আগ্রাসী ভূমিকা গ্রহণ করছে। এটা অবশ্যই খুবই দৃশ্যমান, আমাদের দেশে করপোরেটাইজেশন অফ ন্যাশনাল ক্যাপিটাল বা বেসরকারিকরণ, এগুলো আমাদের সহজেই চোখে পড়ছে। কনজিউমারিজম বা ভোগবাদ বলে একটা বস্তু তৈরি হয়েছে তা আমরা রাস্তায়, দৈনন্দিন জীবনে, দূরদর্শনে দেখছি। এগুলি অনেক বেশি দৃশ্যমান। কিন্তু নিও-লিবারেলিজম-এর আরও একটি দিক আছে। আরও ব্যাপক অর্থে তার একটি মতাদর্শগত, মনস্তাত্ত্বিক দিক রয়েছে, যেটি অনেক বেশি সূক্ষ্ম, যেটি চট করে আমাদের চোখে পড়ে না। এই জায়গাটা বোধহয় আমাদের ধরার দরকার আছে। আরও নির্দিষ্ট করে বলতে হয় যে, ধনতন্ত্র মতাদর্শগতভাবে নিজেকে যেভাবে কায়েম করে নিয়েছে, তার বিরুদ্ধে একটা লড়াই করা, মতাদর্শগত স্তরে তার মোকাবিলা করা অনেক কঠিন। এই দিকটি নিয়ে আমাদের বামপন্থী মহল তার স্ট্র্যাটেজিটা ঠিক করতে পারেনি। বামপন্থী মহল যখন নিও-লিবারেলিজম-এর বিরুদ্ধে বলছে, তখন বলছে যে অর্থনৈতিক আগ্রাসন হচ্ছে, উচ্ছেদ হচ্ছে, মাটি বেচার চেষ্টা হচ্ছে— এসব নিয়ে একটা লড়াই জারি আছে। কিন্তু এই নিও-লিবারেলিজম-এর বিরুদ্ধে মতাদর্শগত লড়াইটা ঠিক কীভাবে হবে, সেই আলোচনাটা বামপন্থী মহলে খুব একটা বেশি আসে না।

আমি এখানে সেই আলোচনাটাই করতে চাই। তাহলেই গ্রামশি এবং আলথুসারের চিন্তার তাৎপর্যটা আরও ভালোভাবে বোঝা যাবে। এখানে একটা পদ্ধতিগত দিক আছে, যেটা বলে নেওয়া ভালো। মার্কসবাদী ঘরানার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে গ্রামশি এবং আলথুসার দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত ঘরানার মানুষ। গ্রামশির চিন্তায় অনেক বেশি সাবজেক্টিভিটি, হেজিমনির ধারণা— এই বিষয়গুলি তাঁর চিন্তার মধ্যে অনেক বেশি করে ছিল। আলথুসারের ধারণায় অনেক বেশি নির্মাণবাদ ছিল— যে কারণে তাঁকে স্ট্রাকচারালিস্ট বলা হয়। চেতনার বিষয়টা সেখানে একেবারেই গৌণ। দুটো স্কুল একেবারেই আলাদা ও বিপরীতমুখী।

কিন্তু একটি জায়গাতে এই দুটি বিপরীতমুখী ধারণার এক আশ্চর্য মিল রয়েছে। আলথুসারের একটি বিখ্যাত লেখা On Ideology-র একেবারে গোড়ার দিকে একটি পাদটীকা আছে। এই ফুটনোটে বলা হচ্ছে যে, গ্রামশিই প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, মার্কসবাদের আলোচনায় সুপারস্ট্রাকচার বা উপরিসৌধ-র ভূমিকাটি ঠিক কী। উপরিসৌধের যে একটি নেপথ্য ভূমিকা আছে, যার সঙ্গে ধনতন্ত্রে হেজিমনির প্রশ্নটি ভীষণভাবেই জড়িত, এই ভূমিকার কথা গ্রামশিই প্রথম সামনে আনেন। কিন্তু দুজনের চিন্তাগত বা পদ্ধতিগত ধারণা সম্পূর্ণভাবেই পৃথক ছিল।

একটা সাবেকি মার্কসবাদী ধারণা আছে চিন্তাগত স্তরে। সেটা হল মতাদর্শ বনাম বিজ্ঞান। মতাদর্শের কথা বললে যে প্রশ্নটা ওঠে স্বাভাবিকভাবেই, আইডিওলজি-কে কী অর্থে মার্কস ব্যবহার করেছিলেন? মার্কস এই বিজ্ঞান, মতাদর্শ ইত্যাদির

বিষয়গুলি তুলেছিলেন একেবারে গোড়ার দিকে। তাঁর কাছে আইডিওলজি আসলে বুর্জোয়া আইডিওলজি। বুর্জোয়া আইডিওলজি আমাদের প্রকৃত কোনো পথ দেখায় না, কারণ আখেরে এটি প্রাধান্য দেয় ভ্রান্ত চেতনাকে। মার্কস এই অর্থে আইডিওলজি কথাটা ব্যবহার করেছেন। মার্কস বুর্জোয়া আইডিওলজির পাল্টা হিসেবে আনলেন সায়েন্সকে। সায়েন্স তাঁর কাছে সত্যের সন্ধান দেওয়া— বিজ্ঞান। মার্কসবাদী মতাদর্শ— সেটাই হচ্ছে বিজ্ঞান। অর্থাৎ যদি বিষয়টাকে একবার পুনর্পাঠ করি তাহলে প্রশ্নটা খানিকটা দাঁড়াচ্ছে এইরকম : চিরায়ত মার্কসবাদী বুর্জোয়া ধারণা এবং মার্কসবাদী অর্থে বিজ্ঞান— দুটোই আইডিওলজি। একটি অবৈজ্ঞানিক মতাদর্শ এবং অপরটি বৈজ্ঞানিক মতাদর্শ।

এই চিন্তার মধ্যে কিন্তু একটা বিষয় ছিল। মার্কস এবং বিশেষত এঙ্গেলস-এর লেখায় কথায় কথায় বিজ্ঞান রয়েছে। কেন বিজ্ঞান বার বার এসেছে? মার্কস বা এঙ্গেলস যখন লিখছেন, তার ঠিক আগের পর্বে সারা ইউরোপ জুড়ে রয়েছে এনলাইটেনমেন্ট-এর প্রভাব, এই সময়ে বিজ্ঞানের বিরাট প্রভাব ছিল। সেই সময়ে চিন্তার জগতে যে বিতর্কগুলো চলছে, তার একদিকে রয়েছে অধিবিদ্যা, ধর্ম, বুর্জোয়া আইডিওলজি— এই সমস্ত কিছু মিলিয়ে একটা ধোঁয়াশার জগৎ। তখন সমাজে সাধারণভাবে খ্রিস্টীয় মতবাদ এবং ধারণা-র খুবই প্রভাব ছিল চিন্তার জগতে। সেই সময়কার দর্শন বলতে ছিল মূলত ভাববাদী দর্শন। বিশেষত এই ক্ষেত্রে হেগেল-এর দর্শনের উল্লেখ করতে হয়। সেই সময়ে মার্কস-এর কাছে এসবের প্রতিপক্ষ ছিল বিজ্ঞান। বিরোধী সব কিছুকে অবৈজ্ঞানিক প্রতিপন্ন করেই মার্কস তাঁর বৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। এইভাবেই মার্কসবাদে বিজ্ঞান বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

পরবর্তী সময়ে লেনিন বিশেষত তাঁর *হোয়াট ইস টু বি ডান* গ্রন্থে বার বার বলেছেন যে আইডিওলজি বিষয়টি বাইরে থেকে নিয়ে আসতে হবে। এই আইডিওলজি দিয়ে মানুষের চিন্তার জগতের, তার চেতনার উন্নতি ঘটাতে হবে। মার্কসবাদী আইডিওলজি এই অর্থে বৈজ্ঞানিক।

পরবর্তীকালে গ্রামশি এবং আলথুসার আইডিওলজি বিষয়টির পুনরুত্থাপন করেন। এখানে আলথুসারের কথা খুব বেশি আলোচিত হয় না। এই প্রসঙ্গে আলথুসার কিন্তু একটি খুব নতুন কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে একটি শিশু যখন জন্ম নিচ্ছে, তখন সে একটি মতাদর্শের মধ্যেই জন্ম নিচ্ছে। অর্থাৎ মানুষের জগৎটাই কিন্তু আইডিওলজিক্যাল জগৎ। তার চারপাশ, তার পরিবার, তার লেখাপড়া— এসব নিয়েই, এসবের মধ্যেই রয়েছে তার আইডিওলজিক্যাল জগৎ। অর্থাৎ বুর্জোয়া মতাদর্শ তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। তারা নিজেরাও বুঝতে পারছে না যে বুর্জোয়া আইডিওলজি তাদের গোটা চেতনাটাকে গ্রাস করে নিয়েছে। এই সম্পূর্ণ গ্রাস হয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে যে লড়াইটা চাই, সেটা অতি কঠিন লড়াই। এইখানেই গ্রামশি আবার একই সঙ্গে আলথুসারের সঙ্গে কোথায় যেন মিলে যান।

গ্রামশি যখন হেজিমনি-র কথা বলছেন, তখন তাঁর মূল কথাটা কিন্তু ওই গ্রাস করার বিষয়টিই। সাধারণভাবে একটি উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের মানুষ, তার চিন্তা, ভাবনা, চেতনা— সমস্ত কিছুই যদি হেজিমনি-নিয়ন্ত্রিত হয় তবে একটা হেজিমনিস্টিক সমাজ হবে। এটাই হলো বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সাফল্য। একটি উন্নত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে, রাষ্ট্র যে সমর্থনটা আদায় করে, সেই সমর্থনটা হচ্ছে এই যে, মানুষের চেতনার স্তরে রাষ্ট্র এমন একটা কিছু ঢোকাতে পেরেছে, যার ফলে ধনতন্ত্র যতই ভঙ্গুর হোক না কেন, যতই তার অপূর্ণতা থাকুক না কেন, ধনতন্ত্রের চিন্তা জগতের বাইরে তার পাল্টা একটা বিকল্প ভাবা তার পক্ষে দুরূহ। যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই, সোভিয়েতের বিজয় সেই সমস্ত দেখেও উন্নত ধনতন্ত্রের বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকা সোভিয়েত, ওটাও আমাদের আদর্শ হতে পারে, আমরা আমাদের দেশে ধনতন্ত্রকে উৎখাত করে আমাদের দেশেই ঐ মডেলটাকে চালিয়ে দেব— এই ভাবনা কিন্তু কোনোভাবেই বেশিরভাগ মানুষের চিন্তায় ঠাঁই পায়নি। একটা কারণ হয়ত ছিল, যে ভাবে সোভিয়েতে সমাজতন্ত্র কায়েম হল, যেভাবে সোভিয়েত চলছিল, সেসব নিয়ে প্রশ্ন ছিল। কিন্তু বুর্জোয়া গণতন্ত্রের যে কাঠামো, তার মধ্যেই এদিক ওদিক করে ধনতন্ত্রের বৃত্তের মধ্যেই কিছুটা স্বস্তির কথাই সাধারণভাবে বেশিরভাগ মানুষের মাথায় ছিল। অর্থাৎ বুর্জোয়া ভাবধারা চিন্তার জগতটাকেই একপেশে ভাবার স্তরে আবদ্ধ করে রেখেছে।

এই বিষয়টা নিয়ে গ্রামশি এর বেশি কিছু বলতে পারেননি। আলথুসার আরও খানিকটা এই কথাটাকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন। গ্রামশি যা বললেন তা হলো, বুর্জোয়া ভাবধারায় আচ্ছন্ন চেতনার স্তরে একটা পাল্টা চেতনার প্রয়োজন। গ্রামশি নিয়ে আলোচনা শেষ পর্যন্ত হেজিমনি কাউন্টার-হেজিমনি সংক্রান্ত আলোচনাতেই থেমে যায়। কিন্তু গ্রামশি অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কথাও বলেছেন। গ্রামশি-র ভাবনা থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ কথাটা বেরিয়ে আসে তা হল, এই লড়াই-এ নেতৃত্বটা কে দেবে? কোনো রাজনৈতিক সংগঠন দেবে, নাকি মানুষের কোনো সমন্বয়/স্বতঃস্ফূর্ত সংগঠন দেবে? এ বিষয়ে গ্রামশি-র মত খুব স্পষ্ট। যদিও আমরা জানি যে, গ্রামশি এই সংক্রান্ত যাবতীয় লেখাই লিখেছেন জেলে বসে। অনেক শব্দ তিনি ব্যবহার করতে পারেননি জেল কর্তৃপক্ষকে ফাঁকি দেবার জন্য, কিন্তু তিনি বলেছেন এই নেতৃত্ব আসবে 'মডার্ন প্রিন্স'-এর ধারণা থেকে। আধুনিক পরিভাষায় বলা যেতে পারে, নেতৃত্ব আসবে

নৃপতি-র কাছ থেকে। কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্ব দিলেও আমরা যে ধরনের কমিউনিস্ট পার্টি ভাবতে অভ্যস্ত, দেখতে অভ্যস্ত, গ্রামশি-র ভাবনা তা থেকে অনেকটাই ভিন্ন। নৃপতিকে হতে হবে হেজিমনিক, যার সম্পর্কে তিনি তিনটি শব্দবন্ধ ব্যবহার করেছেন— ন্যাশনাল, পপুলার, কালেকটিভ। অর্থাৎ গোটা সমাজের সামগ্রিক চেতনার প্রতিনিধিত্বকারী হবেন এই নৃপতি। গোটা সমাজের সুখ-দুঃখ, আকাঙ্ক্ষা— তিনি তার প্রতিনিধি। এই যে পার্টিকে এতটা বড় করে দেখা, এটা আসছে গ্রামশি থেকে। গ্রামশি-র সমস্ত লেখা এখনও অনুদিত হয়ে আমাদের হাতে আসেনি। কিন্তু তিনি কমিউনিস্ট পার্টিকে যে এত বড় আকারে জনগণের ও সমাজের সঙ্গে সংযুক্ত করতে চাইছেন— এটাই তাঁর সত্যিকারের বিকল্প যা আধিপত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। চিন্তা-শিক্ষা-কৃষ্টি-চেতনা— এইসব কিছুর ধারক-বাহক কমিউনিস্ট পার্টি হতে পারলেই হেজিমনি সুনিশ্চিত করা সম্ভব। এটাই হলো গ্রামশির বক্তব্য।

আলথুসার এই বিষয়টা নিয়ে যেভাবে চিন্তা করলেন, সেটা একটু আলাদা। আলথুসার তাঁর লেখাতে খুব স্পষ্ট করেই আমাদের বলেছেন যে, রাষ্ট্র (তিনি কিন্তু রাষ্ট্র বলতে বুঝিয়েছেন আধুনিক ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র) আমাদের দুভাবে শাসন করে। একটি হচ্ছে নিপীড়নমূলক— পীড়ন, উৎপীড়ন, অত্যাচারের মাধ্যমে! গ্রামশিও অনেকটা এইভাবেই বলেছিলেন। রাষ্ট্রের হাতে রয়েছে তার পশুশক্তি। অন্যটি হল তার আইডিওলজিক্যাল শাসন প্রক্রিয়া। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার যে মতাদর্শ, সেটা রাষ্ট্র খুব ভালোভাবে কাজে লাগায়। তার জন্য রাষ্ট্র তার হাতে থাকা সব সুযোগের ব্যবহার করে।

ক্ষমতার সঙ্গে আইডিওলজির একটা সম্পর্ক আছে। কমিউনিস্টরা ক্ষমতা এসে মানুষ থেকে যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান, তার কারণটা অনেকটা এখানে নিহিত।

ক্ষমতার নিজস্ব চলন, ক্ষমতার কাঠামো শেষ পর্যন্ত আমার চেতনার স্তরে প্রোথিত হয়ে যাচ্ছে। এটাই আইডিওলজি। এই যে আমি ক্ষমতার খোপে ঢুকে গেলাম, ক্ষমতার ভাষা যে আমাকে খোপে ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য সদাই সচেষ্ট, এই বিষয়টিই আমি বেমালুম ভুলে গেলাম। আমি ধরে নিচ্ছি, সরকারে ঢোকা মানেই আমি জিতে গেলাম, চেতনার জগতে এটাই ঢুকে গেল। এটাই আমাদের চেতনার জগতকে আচ্ছন্ন করে রাখছে।

ক্ষমতার শাসনকে কীভাবে ভাঙ্গা যাবে, ক্ষমতার সঙ্গে নির্বিত্ত মানুষকে কীভাবে যুক্ত করা যাবে, সেটা কমিউনিস্ট শাসকদের একটা বড় অংশ ভুলে যান। লেনিন বারেবারেই তাঁর ভাবনায় ও আচরণে তাঁর সহকর্মীদের এই বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর শরিক হলেন আর কজন?

গ্রামশি এই বিষয়টা খুব ভালো ধরেছেন, যেটা লেনিন বা পরবর্তীকালের চিন্তকদের চোখ এড়িয়ে গেছে। গ্রামশি বলছেন যে, এদের তো বলপ্রয়োগ করে, চোখ রাঙিয়ে মানুষকে শাসন করার প্রয়োজন নেই। এটা অনেকটা অভিমন্যুর চক্রব্যূহে প্রবেশের মতো। একবার আপনাকে ক্ষমতার বৃত্তে ঢুকিয়ে দিতে পারলে আপনি ঐ খোপেই থেকে যাবেন। গ্রামশি একটা গুরুত্বপূর্ণ তফাত করেছিলেন, আধিপত্য (হেজিমনি) আর কর্তৃত্বের (ডমিনেশন) মধ্যে। হেজিমনির মাধ্যমে সুনিশ্চিত হয় জনগণের সম্মতি আর ডমিনেশন প্রশ্রয় দেয় দাপট দেখাবার রাজনীতিকে। কমিউনিস্ট পার্টি হেজিমনির ভাবনা ছেড়ে ডমিনেশনের ভাবনাকে বড় করে দেখে বলেই নিজেকে জড়িয়ে ফেলে ক্ষমতা প্রদর্শনের ভাবনার সঙ্গে আর ডেকে আনে তার নিজের ও সমাজের গভীর সংকট।

সব শেষে বলব, এর থেকে আমরা বার হব কী করে? যে জটিল চক্রের মধ্যে আমরা ঢুকে গেছি, সেই জটিল চক্রের বাইরে আসব কী করে? নতুন-পুরনো সব প্রজন্মই কমবেশি এই আবর্তে পড়ে গেছে। এখানে একটি প্রশ্ন ওঠে, যেটি আমাদের চলতি মার্কসবাদী চর্চায় তেমন একটা আলোচিত হয়নি। এই বিষয়টির বাইরে যেতে পারা আসলে তো একটা উন্নত চেতনার জায়গা। এই উন্নত চেতনার চরিত্রটা কেমন হবে? সেই চরিত্র যদি অর্জন করতে হয়, তবে তার রাস্তাটা কী? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, এই উন্নত চেতনার অর্থ হচ্ছে যদি আমরা নিও-লিবারেল অর্থনীতির দিক থেকে ভাবি, তবে তা একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছে, সেটা হচ্ছে আমাদের সব দিক থেকে প্রচণ্ডভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক করে তুলেছে— আমরা যাতে সংঘবদ্ধ না হতে পারি তার ব্যবস্থা করেছে। স্বতঃস্ফূর্ততা তারা মেনে নেয়। হোক কলরব বা অকুপাই মুভমেন্ট-এর মতো এত বড় আন্দোলন তারা চলতে দিয়েছে, কেননা তারা জানে একমাস-দু'মাস পরে তা আপনা থেকেই ফুরিয়ে যাবে। ওরা চাইছে যে আপনারা রাস্তায় নামুন, আপনারা আন্দোলন করুন। কিন্তু তাতে যেন সংঘবদ্ধ আইডিওলজি না থাকে। পুরোনো মার্কসবাদে একটা কথা বলা হত— অর্থনীতিবাদ। আজকে যা ঘটছে তা কি সেই অর্থনীতিবাদেরই ভিন্ন রূপ? এক একটা সাময়িক বিষয় উঠে আসছে, আর আমরা সেই সাময়িক বিষয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়ছি। প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছি। প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে রাস্তায় নামছি, আন্দোলন করছি। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলে দেখবো যে এটা হচ্ছে কিন্তু কোনো বৃহত্তর বিষয়কে সামনে রেখে নয়—আমার একটা স্বার্থে ঘা লাগছে, আমি প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছি।

এর থেকে বেরিয়ে আসতে হলে তাহলে আমার দরকার চেতনার জায়গায় একটা পরিবর্তন, একটা নতুন স্থান। সেই নতুন স্থানটি হচ্ছে একটি উন্নত নৈতিক চেতনা। এটা একটা মরাল কোশ্চেন। এই মরাল কোশ্চেনটা আসছে কারণ এর একটা বিরাট পরম্পরা রয়েছে। মার্কসবাদে একটা সমস্যা রয়ে গেছে। মার্কসবাদ সর্বদাই নৈতিকতাকে আপেক্ষিক বলে মনে

করে। নৈতিকতার বিষয়টি মার্কস-এর লেখায় খুব একটা উপস্থিত নেই। এটা যেন একটা বুর্জোয়া মরালিটি-র বিষয়।

মার্কসীয় পরিভাষা ব্যবহার করে একটা কথা বলাই যায় যে, উন্নত নৈতিক চেতনা মানে আমাকে আমার ব্যক্তিস্বার্থের বাইরে সামগ্রিকতার ভাবনায় যেতে হবে। মার্কসীয় ধারণার পেছনে রয়েছে ইউরোপের দীর্ঘদিনের বৌদ্ধিক চর্চা, একটা পরম্পরা। তার সঙ্গে মার্কসবাদ সংযুক্ত।

যেমন ধরুন অ্যারিস্টটল। তাঁর ভাবনায় কিন্তু এই বিষয়টি ছিল যে আগে সামগ্রিকতা, তার পরে ব্যক্তি। আগে সমাজ, তারপর ব্যক্তি। হেগেল-এও তাই। ইউরোপীয় পুঁজিবাদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে এটা কিন্তু একটা পাল্টা ধারণা। মার্কস এই পালটা ধারণাই আত্মস্থ করেন। এটা মোটেই ঠিক নয় যে, মার্কস-এর আগে কারুরই সামগ্রিকতার ধারণা ছিল না। ছিল, কিন্তু সেটা কখনই প্রাধান্য পায়নি। মার্কস-এর চিন্তাতে আমরা প্রথম এই প্রাধান্য পাই। মার্কস যেটা করেছেন, এই নৈতিকতার, সামগ্রিকতার, সামাজিকতার ভাবনাকে ব্যক্তির স্বার্থের ওপরে স্থান দিয়েছেন। এই প্রশ্নগুলিকে মার্কস রাজনৈতিক দিক থেকে বিশ্লেষণ করেছেন, কিন্তু মার্কস-এর কাছ থেকে এই উন্নত নৈতিক চেতনার বিষয়ে কোনো তত্ত্বগত কাঠামো আমরা পাচ্ছি না।

উন্নত চেতনার এই যে ধারণা (সামগ্রিকতা, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার পাল্টা হিসেবে) তার বাস্তবায়ন করতে গেলে সেই রাস্তাটা কী? এইখানেই আসছে গ্রামশি-র ভাষায় কমিউনিস্ট পার্টির মরাল টিউটরের ভূমিকার কথা। তাহলে বোধহয় কমিউনিস্ট পার্টির অ্যাজেন্ডার মধ্যে এই মরালিটি-র কথাটা আনতে হবে। যেটা কিন্তু '৪০-এর দশকের কমিউনিস্ট পার্টি করেছিল। কমিউনিস্ট পার্টির কাজ কি কেবল নির্বাচন, শুধুমাত্র ক্ষমতায় আসা— এইটুকুই মাত্র? নাকি এই কাজগুলিকে যুক্ত করতে হবে কোনো বৃহত্তর সামাজিক কাজের সঙ্গে? আজকে নানা দিক থেকে মানুষ বিপন্ন। এই বিপন্ন, আর্ত মানুষকে সাহস দেওয়া, তার পাশে দাঁড়ানো, এটাও তো খুব বড় কাজ। আমরা জানি '৪০-এর মন্বন্তরে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকার কথা, আইপিটিএ-র কথা— এগুলো সমস্ত মানুষকে স্পর্শ করেছিল। এইভাবে সামগ্রিকভাবে সামাজিকতার বিষয়টি কিন্তু সংযুক্ত করা যায়।

কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতিটা মানুষের কাছে পৌঁছাবে সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। এই কাজগুলি মানুষকে খানিকটা সচেতন করে তোলে। আমি যে ভোটের লড়াইটার কথা ভাবছি, সেটাকে আমি নিছকই ভোটের লড়াই-এর মধ্যে রাখতে চাই না। আমার আসলে একটা বৃহত্তর মরাল অ্যাজেন্ডা আছে। এই বিষয়টি যদি কমিউনিস্ট পার্টি করতে পারে তবে বিষয়টা অন্যরকম হতে পারে। চীনে কিন্তু বিষয়টা অনেকটা এদিক দিয়েই ঘটেছে। চীনে ক্ষমতায় আসার পর তারা মানুষের ঘরে ঘরে শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কেরালায় যেমন অনেক ক্ষেত্রে পাড়ায় পাড়ায় জঞ্জাল ভাগ ভাগ করে জড়ো করে রাখার কাজটা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে হয়, যাতে পুরসভার পক্ষে জঞ্জাল সাফাই-এর কাজটা অনেক দ্রুত এবং সহজ হয়। অর্থাৎ মানুষকে তার ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতার বাইরে এনে বৃহত্তর সামাজিকতার সঙ্গে সংযুক্ত করার চেষ্টা চলছে।

কমিউনিস্টদের বৃহত্তর উন্নত নৈতিক ভাবনা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে— স্লোগানের মাধ্যমে মোটা দাগে নয়। গ্রামশি এবং আলথুসার অনেক দিন প্রয়াত, কিন্তু এই উন্নত নৈতিক চেতনার দিক থেকে ভাবলে এঁদের আবার নতুন করে অধ্যয়নের প্রয়োজন রয়েই যাচ্ছে।

ধনতন্ত্র : ফিরে দেখা

বিস্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়ন সম্পর্কিত একটি আলোচনা

অমিত ভাদুড়ি

১। সমস্যাটির উপস্থাপনা

রূপান্তরের একটি প্রক্রিয়া হিসাবে পুঁজিবাদী উন্নয়নকে যুগ যুগ ধরে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অ্যাডাম স্মিথের দৃষ্টিতে এটা মূল্য প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে বাজার ব্যবস্থার ক্রমবিস্তার, যা শ্রমবিভাজন এবং বিশেষীকরণের মাধ্যমে শ্রমোৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উপযুক্ত কাঠামো প্রদান করে। ডেভিড রিকার্ডো, এই প্রক্রিয়ার আনুষঙ্গিক পরিণাম হিসাবে সীমাবদ্ধ প্রাকৃতিক উৎসের (জমি) উপর ক্রমবর্ধমান চাপ বিষয়ে পূর্বানুমান করেছিলেন— যা জমিদার এবং পুঁজিপতিদের মধ্যে বণ্টনজনিত দ্বন্দ্বের কারণে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি রোধ করে। পুঁজিপতি এবং শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টনজনিত দ্বন্দ্বকে তাঁর বিশ্লেষণের কেন্দ্রে স্থান দেওয়ার জন্য যদিও ছিল কার্ল মার্কসের পরিচিতি, তিনি কিন্তু 'আদি সঞ্চয়ের' হিংস্রতার মধ্যেই এই রূপান্তরের সূত্রপাত চিহ্নিত করেছিলেন, যার জন্য রাষ্ট্রীয় সহযোগিতায় পুঁজিপতিদের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার জোরে চিরাচরিত জীবনযাত্রার উপায়গুলি থেকে বহুল সংখ্যক মানুষের উচ্ছেদ প্রয়োজন হয়েছিল। অধুনা, অর্থনীতিবিদদের মধ্যে ধনতন্ত্রের চলমান অভিযানকে 'সৃজনশীল ধ্বংস'-এর (creative destruction) প্রক্রিয়া হিসাবে অভিহিত করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। বিশেষত শুমপিটার ধারাবাহিক উদ্ভাবন এবং উদ্যোগ-তাড়িত এই পদ্ধতিকে পুঁজিবাদের জীবনীশক্তি হিসাবে তারিফ করেছিলেন। অনুন্নত অর্থনীতির প্রেক্ষিতে, আর্থার লিউইস, একই বিষয় ভিন্নভাবে উপস্থাপিত করে দেখিয়েছিলেন, কীভাবে বাজার প্রক্রিয়া চিরাচরিত ক্ষেত্র থেকে অপরিমিত শ্রম আধুনিক মজুরি-শ্রম অর্থনীতিতে ক্রমশ শোষণ করে এবং একটি দ্বৈত অর্থনৈতিক কাঠামোর রূপান্তর ঘটায়।

নানাভাবে এই সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গি রূপান্তর প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে। একই সঙ্গে প্রত্যেক দৃষ্টিভঙ্গি ধনতান্ত্রিক উন্নয়নের বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে পর্যবেক্ষকের স্থান ও কাল বৈশিষ্ট্যও সূচিত করে। খুব স্বাভাবিক যে, কোনটাই বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে অর্থনৈতিক কাঠামো আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টায় রত বিশাল দারিদ্র্য সম্বলিত প্রধানত কৃষি-অর্থনীতি ভিত্তিক আধুনিক ভারতের বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এই নিবন্ধে আমাদের উদ্দেশ্য, বিশেষত ১৯৯১ সালে বাজার-কেন্দ্রিক অর্থনীতিক উদারীকরণ মোটামুটি সরকারি নীতি হিসাবে গৃহীত হওয়ার পর, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিশ্লেষণ করা।

পুঁজিবাদী উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে পুঁজিবাদের সতত সহগামী 'বিস্থাপনের মাধ্যমে পুঞ্জীভবন'-এর ধারণা দ্বারা অতীতে 'আদি সঞ্চয়' বা পুঁজিবাদের উৎস সম্পর্কিত মতটিকে প্রতিস্থাপিত করতে হবে (দ্রষ্টব্যঃ David Harvey, *The New Imperialism*, Oxford 2003)। ভারতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপে জমি অধিগ্রহণ তার সব থেকে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জল, জঙ্গল, নদী, পর্বত, উপকূল, খনিজ সম্পদ— সবকিছুর জন্যই যেহেতু কোন না কোন ভাবে জমিতে অভিগম্যতা প্রয়োজন (access to land), 'জমি' সেহেতু (রিকার্ডোর মডেল অনুযায়ী) প্রায় সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতিভূ হিসাবে গণ্য হয়।

প্রাকৃতিক সম্পদের উৎস হিসাবে 'জমি'-র এক আপাতবিরোধী অবস্থান আছে। প্রায়শ দেখা যায়, একই ধরনের কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলে জমি কম লাগে, যেমন শহরে বহুতল আবাসন কিংবা শহরের বাজার ও শপিং মল নির্মাণ। এটা সাধারণভাবে অসত্য, কারণ পরোক্ষভাবে শহরাঞ্চলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিপূরক পরিকাঠামোগত নির্মাণকার্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বিদ্যুতের জন্য প্রয়োজন নদীবাঁধ থেকে জলবিদ্যুৎ; কয়লার (তাপবিদ্যুতের প্রয়োজনে) জন্য খনি; পরিবহন সুবিধা সহ দূরবর্তী স্থান থেকে লৌহ আকরিক, বক্সাইট আহরণের জন্য প্রয়োজন সুবিশাল জমি এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয় প্রত্যক্ষ নাগরিক সুবিধা ও রাস্তা, দ্রুত চলাচল, সেতু ইত্যাদির মতো পরিকাঠামোর জন্য জমি। এর অর্থ, শহরাঞ্চলে জমিতে অভিগম্যতার মতো প্রত্যক্ষ পরিসর নির্মাণে পরোক্ষভাবে জমির প্রয়োজন এবং শহরে জমি-রক্ষার কার্যক্রমের পরিসর টিকিয়ে রাখতে পরোক্ষভাবে প্রয়োজন নদী, উপকূল, বনাঞ্চল, পাহাড় ও খনিজের মতো ভূ-সম্পদ আহরণে অভিগমন। এই বৃহত্তর অর্থে সাধারণ উন্নয়নকার্যে জমিতে অধিগম্যতার প্রশ্নটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। একারণেই জমি থেকে বিস্থাপন পুঁজিবাদী উন্নয়নের কেন্দ্রীয় বিষয়।

জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে বিস্থাপন শ্রম সরবরাহের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে, তা করে মূলত (শ্রমিকের) অংশগ্রহণের অনুপাতের প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে। লিউইস প্রস্তাবিত প্রকৃত স্থির মজুরিতে অপরিমিত শ্রম সরবরাহের পরিবর্তে চিরাচরিত জীবিকাগুলির ধ্বংসসাধন মানুষকে যে কোনো উপায়ে বিকল্প এক অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্ররোচিত করে এবং তার পরিণতি হলো অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের (informal sector) অভাবনীয় বৃদ্ধি। (শ্রমক্ষেত্রে) অংশগ্রহণের অনুপাত এবং লিঙ্গ ও জনপরিসংখ্যানের বিচারে তার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে 'আকর্ষণ'(pull factor)-এর তুলনায় তুলনায় 'তাড়না' (push

factor)-র অবদান বেশি।

সাধারণত, 'বিশিষ্ট এক্তিয়ার' (eminent domain) ক্ষমতাবলে, ব্যক্তিগত ও কৌম সম্পত্তি অধিকার অস্বীকার ক'রে, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ ক'রে 'জনস্বার্থে' জমি অধিগ্রহণের কাজ চলতে থাকে। এই প্রেক্ষিতে, বাজারে দামের ওঠাপড়ার (price mechanism) ক্ষেত্রে, রাষ্ট্র না পালন করে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা, না গ্রহণ করে দক্ষ কার্যকর ব্যবস্থা। তার ভূমিকা 'জনস্বার্থ' নির্দিষ্ট সংজ্ঞার সঙ্গে এটাকে খাপ খাইয়ে নেওয়া। অ্যাডাম স্মিথ, তাঁর অনেক অনুগামীদের বিপরীতে, নৈতিক বাঁধনের জন্য সামাজিক 'প্রথার' প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, যা দাম নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়াটিকে ধরে রাখত। অদ্ভুতভাবে, রাষ্ট্র অন্তত জমি-বাজারের ক্ষেত্রে এই কাজটা সম্পাদন করে, সম্ভবত বাজারকে উন্নয়ন-বান্ধব করার জন্য! রাষ্ট্র উন্নয়নের নামে জনস্বার্থকে সংজ্ঞায়িত করে এবং আপাতভাবে উন্নয়নে উৎসাহ জোগাতে জমি অধিগ্রহণে হস্তক্ষেপ করে। কাকে অনুগ্রহ করা হবে এবং কীভাবে, রিকার্ডো বর্ণিত সেই পুরোনো জমিমালিক (অথবা জমি মালিকদের অধিকার) এবং পুঁজিপতির দ্বন্দ্ব, এইভাবে রাষ্ট্রশক্তির অন্তর্ভূত হয়। রাষ্ট্র ঠিক করে কার পক্ষে এবং কীভাবে সে কাজ করবে।

বাজারের ভূমিকা বিস্তৃত করার জন্য নয়া-উদারনীতি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভূমিকা বিভিন্ন ছলে যেহেতু কমানোর চেষ্টা করে, (এক্ষেত্রে) তা এক আপাতবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে। বাজারের কর্মক্ষেত্র বিস্তারের জন্য প্রায়ই সক্রিয় রাষ্ট্রের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। এভাবে দেখলে জমি-বাজারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। যে রাষ্ট্র পুঁজিবাদী উন্নয়নের অগ্রগতি কামনা করে, স্বাভাবিক কারণে সে সংশ্লিষ্ট পুঁজিবাদী শ্রেণীকে সাহায্য করবে। এই নীতির মূল কথা হলো, পুঁজিপতি শ্রেণীর জন্য 'বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ' গড়ে তুলতে হবে। সরকারের আর্থিক নীতি, বিশেষত বেকারত্ব রোধে বাজেট ঘাটতির প্রতি প্রতিকূল মনোভাব, করছাড় অথবা ব্যক্তিগত ব্যবসার স্বার্থে সরকারি উদ্যোগগুলির বেসরকারিকরণের মতো আর্থিক ভর্তুকি— প্রচলিত রেওয়াজে এগুলোই (সরকারি নীতির) প্রধান উপাদান (কালেকি ১৯৪৩; আলেকজান্ডার ১৯৪৮)। 'জনস্বার্থে' রাষ্ট্র কর্তৃক জমি অধিগ্রহণ নতুন এক পন্থা বাতলে দিল। রাষ্ট্র যে জমি অধিগ্রহণ করে, বিনিয়োগে উৎসাহ দেওয়ার জন্য তা বৃহৎ ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থাগুলির হাতে তুলে দেওয়া হয়। অনুষঙ্গ হিসাবে প্রায়শ এর সঙ্গে যুক্ত হয় নিখরচায় জল, বিদ্যুৎ, সড়ক যোগাযোগ এবং অন্যান্য পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা। এবং এটাই মার্কস কথিত অনুন্নত পুঁজিবাদের প্রাথমিক স্তরে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় আদি সঞ্চয় এবং সমকালীন ভারতবর্ষে বিস্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়নের মধ্যে সুস্পষ্ট সম্পর্ক।

যাই হোক, ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থাগুলি অকিঞ্চিৎকর মূল্যে জমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ এইভাবে যে হস্তগত করে, তার দ্বিবিধ তাৎপর্য আছে। প্রথমত, যখন তারা শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজনে জমিটি ব্যবহার করে, অত্যন্ত উচ্চ যান্ত্রিক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়। চিরাচরিত ক্ষেত্র, যেখান থেকে মানুষ বিস্থাপিত হয়েছে, তার তুলনায় শ্রমের উৎপাদনশীলতা প্রভূত বৃদ্ধি পায়। এতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, কিন্তু কর্মসংস্থান ও জীবিকার্জনের সুযোগ হ্রাস পায়। দ্বিতীয়ত, উৎপাদিত দ্রব্যের প্রতি ইউনিট পিছু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ আধুনিক সংগঠিত, বিশেষত কর্পোরেট ক্ষেত্রে অনেকটা বেশি— খানিকটা ব্যবহৃত প্রযুক্তি ও উৎপাদিত দ্রব্যের প্রকৃতির কারণে, আর খানিকটা এ কারণে যে এগুলির অবস্থান সাধারণত শহর ও আধা-শহরাঞ্চলে, যেখানে ব্যাপক পরিকাঠামোগত বিনিয়োগ ঘটে থাকে। ধনতন্ত্র সম্বন্ধে শুমপিটারের সৃজনশীল ধ্বংসের তত্ত্ব কাজ করতে শুরু করে— কিন্তু এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম সহ। কর্পোরেট কবলিত শিল্পোন্নয়নে নতুন কর্মসংস্থানের তুলনায় উচ্ছিন্ন মানুষের জীবিকাবিনাশ অনেকটাই বেশি। এরই সঙ্গে ধ্বংস হয় প্রকৃতি; প্রাকৃতিক সম্পদের খোঁজে অরণ্য, পর্বত, উপকূল, নদী এবং চিরাচরিত আদিবাসী ও গ্রামীণ গোষ্ঠীগুলি ক্রমাগত ধ্বংস হতে থাকে।

সম্পদহরণের অন্য দিকটি হলো, চিরাচরিত জীবিকাগুলির অবসানের সাথে সাথে ধারাবাহিকভাবে উদ্বৃত্ত শ্রমিক বাহিনী সৃষ্টি। এদের অধিকাংশ যেহেতু সংগঠিত শিল্পে নিয়োজিত হতে পারেনা, তাদের এক উল্লেখযোগ্য অংশকে জীবিকার্জনের জন্য অন্য পথ খুঁজতে হয়। অনেকেই শহর এবং আধা-শহরাঞ্চলে অসংগঠিত অ-প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে যোগদান করে। বেআইনি, অননুমোদিত ঝুপড়ি-বস্তিতে তাদের বাস। জল, বিদ্যালয়, হাসপাতাল ইত্যাদি শহুরে সুবিধা নেওয়ার প্রচেষ্টা করে তারা। জল, বিদ্যুৎ ও পরিবহনের মতো শহুরে অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর উপর তাদের অর্থনেতিক কর্মকাণ্ড চূড়ান্তভাবে নির্ভরশীল। শহরে তারা বেআইনি দখলদার, সুতরাং তাদের কোনো বৈধ অধিকার নেই (দ্রষ্টব্য : Partha Chatterjee, *Lineages of the Political Society: Studies in Post-Colonial Democracy*, Columbia University Press, 2011)। সম্পদহরণের মাধ্যমে উন্নয়ন এভাবে বিশাল এমন এক শ্রেণীর জন্ম দেয়, যারা প্রকৃত অর্থে এক গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক, কিন্তু তাদের আইন লঙ্ঘন করে বাস করতে বাধ্য করা হচ্ছে। এটা খুব একটা আশ্চর্যজনক নয় যে এর ফলে নতুন এক ধরনেরা রাজনীতিবিদদের আবির্ভাব হলো, যারা গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে প্রবেশ করলো 'পরিষেবা প্রদানকারী' হিসাবে। নাগরিক পরিষেবা প্রদান করা যাদের দায়িত্ব সেই পৌরপ্রতিষ্ঠান এবং উচ্ছিন্ন মানুষগুলির মধ্যে মধ্যস্থতাকারী এজেন্ট হিসাবে

তারা কাজ করে। আইনত যা তাদের প্রাপ্য নয়, সেই পরিষেবা সরবরাহের এই নয়া রাজনীতির সঙ্গে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি জড়িয়ে গেছে এবং এটা এই সংস্থাগুলির মধ্যেকার প্রায় অপরিহার্য দুর্নীতির একটা কারণ। এটাও বিস্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়নের একটা ফল।

উচ্ছিন্ন মানুষদের মধ্যে যারা গ্রামে পড়ে রইলেন, তাঁরা সাধারণত বৃদ্ধ, বহির্জগৎ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ এবং এমনকি স্থানান্তরের পক্ষে ভাষাগতভাবেও বিচ্ছিন্ন (যেমন কেবল আদিবাসী ভাষা বলতে অভ্যস্ত)। এরাই ভারতের দরিদ্রদের প্রধানতম অংশ। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, আধুনিক শিল্পোন্নয়নের বেদিমূলে এরা বলিপ্রদত্ত।

মানুষ ও প্রকৃতির বিস্থাপনের মাধ্যমে যাদের জন্য বিনিয়োগ-পরিবেশ উন্নত করা হচ্ছে, সেই বেসরকারি কর্পোরেটগুলি কিন্তু মুনাফার পিছনে তাড়া করে বেড়ায়। মুনাফা যাতে বেশি হয়, সেই ভাবেই তারা হস্তান্তরিত জমি ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়। এর ফলে প্রায়শ, দেশীয় শিল্পের জন্য নির্দিষ্ট খনিজ বৈধ ও অবৈধ পথে রপ্তানী হয়ে যায়, শিল্পের বদলে জমিজমার কারবার, শপিং কমপ্লেক্স এবং মল-এর কারবারে রমরমা বৃদ্ধি পায়। কর্পোরেট সংস্থাগুলি জমি নিয়ে ফাটকাবাজি করে। বক্সাইট, অশ্মীভূত জ্বালানি ইত্যাদি খনিজ তারা ফাটকা বাজারে বিক্রি করে দেয় অথবা মূলধনি লাভের জন্য খনি হাতে ধরে রাখে কিংবা খনিজ উত্তোলনে বিলম্ব ঘটায়। এর অনেকগুলোই বিস্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়নের অপরিকল্পিত ফলাফল, কিন্তু ক্রমেই বেশি বেশি করে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয়ে যায়। হস্তান্তরিত জমিরূপ প্রাকৃতিক সম্পদ বিপুল মুনাফার উৎস। জমি অধিগ্রহণের নীতি প্রণয়নের সঙ্গে যে রাজনৈতিক শ্রেণী জড়িত, রূপায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সেই আমলা এবং প্রধান সুবিধাভোগী কর্পোরেট সংস্থাসমূহ— এদের সম্মিলনে দুর্নীতি ও বিশাল কেলেঙ্কারির উত্থান ঘটে। কর্পোরেটগুলি সংশ্লিষ্ট রাজনীতিক ও আমলাদের অনুগ্রহের বিনিময়ে ঘুষ দিয়ে 'রফা' করে। কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলিকে মোটারকম অনুদান প্রদান। বহুদলীয় রাজনীতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনী খেলায় কোন দলই বেশিদিন পিছিয়ে থাকেনা এবং নির্বাচনে অর্থসংস্থান দুর্নীতির ঘূর্ণিচক্রে পরিণত হয়, যেটা সমগ্র ব্যবস্থাটিকে ধীরে ধীরে গোষ্ঠীশাসিত গণতন্ত্রের পথে নিয়ে যায়। পারস্পরিক মদতদানের দুটি রাস্তায় এটা ঘটে। অর্থসাহায্যপ্রাপ্ত রাজনৈতিক দলগুলি 'জনপ্রতিনিধি' হিসাবে দাঁড়াবার টিকিট দেওয়ার ফলে, বৃহৎ শিল্পপতি অথবা তাদের এজেন্টরা সরাসরি সংসদে ঢুকে তাদের নিজস্ব স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। একই সাথে রাজনৈতিক দলগুলির নির্বাচনী তহবিলে তাদের অবদানের ফলে নির্বাচনী ব্যয় ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। নির্বাচনী রাজনীতিতে প্রবেশমূল্য সাধারণ নাগরিকের পক্ষে প্রবল প্রতিবন্ধক। একমাত্র কোনো এক রাজনৈতিক দলে যোগদান করে তারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে এবং এইভাবে তারা সেই একই দুর্নীতিপূর্ণ ব্যবস্থার শরিক হয়ে পড়ে। বিস্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়ন ক্রমে ক্রমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আবরণটুকু রেখে তার ভিতরটাকে ফাঁপা করে দেয়।

গণতন্ত্রের সাথে সাথে, বৃহৎ ব্যবসার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য রূপান্তর ঘটে যায়। মুনাফাবৃত্তির সঞ্চারবিন্দু উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে জমি ব্যবসার মাধ্যমে চটজলদি সম্পদবৃদ্ধির দিকে ঘুরে যায়। ডলার বিলিয়নেয়ারের উচ্চতম সংখ্যাবৃদ্ধিপ্রাপ্ত দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষ অন্যতম (এক দশকে তাদের সংখ্যা ৮ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৫২)। রাশিয়ার (এবং চীন-এর) মতো রাষ্ট্রিয় উদ্যোগগুলির বেসরকারিকরণের তুলনায় ভারতীয় পথ ছিল বরং বেসরকারি বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নত করার নামে বৃহৎ পুঁজির নিকট জমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ হস্তান্তর। কিন্তু উচ্ছিন্ন মানুষ, শহরের জায়গা ও রাস্তাঘাটের 'অবৈধ' দখলকার অধ্যুষিত অপ্রাতিষ্ঠানিক এবং অসংগঠিত শিল্পের বাড়বাড়ন্তের ফলে সৃষ্ট অত্যধিক ভিড় ও ঘিঞ্জি অবস্থার দরুণ শহরের সুবিধাগুলির ক্রমঅবক্ষয় কর্পোরেট শ্রমোৎপাদনশীলতার উপর ক্ষতিকারক প্রভাব বিস্তার করে। প্রায় আপাতবৈপরীত্যভাবে, বিস্থাপনের মাধ্যমে বিনিয়োগযোগ্য পরিবেশের উন্নতি উৎপাদন শিল্পকে অপটু করে তোলে এবং রাজনৈতিক সংযোগের মাধ্যমে দ্রুত সম্পদ বৃদ্ধির প্রতি (বিনিয়োগকারীরা) আরও বেশি ঝুঁকে পড়ে।

২. মডেল

পূর্বোক্ত আলোচনায় যে সমস্ত আন্তঃসংযোগগুলি স্বীকার করা হয়েছে, সেগুলি একটি সুসঙ্গত বিশ্লেষণাত্মক কাঠামোয় বর্ণনা করা প্রয়োজন। জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে যে প্রক্রিয়া বিস্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়নকে চালিত করে, তা আরও বিশ্লেষণে সাহায্য করবে।

সংগঠিত শিল্প এবং উন্নত কর্পোরেট ক্ষেত্রের পার্থক্য না করে, প্রাকৃতিক ক্ষেত্র এবং কর্পোরেট ক্ষেত্রকে যথাক্রমে 'n' এবং 'c' অক্ষরদ্বয়ের দ্বারা চিহ্নিত করা হলো। ক্ষুদ্র কৃষি ও অসংগঠিত ক্ষেত্র প্রাকৃতিক ক্ষেত্রের অন্তর্ভূক্ত। জমি অধিগ্রহণ আমাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার কারণে, কৃষি, মাছ ধরা ও পশুপালনের মতো প্রাকৃতিক অর্থনীতি থেকে বিস্থাপনের উপরই আমরা বেশি করে মনোনিবেশ করবো।

ধরা যাক—

'n' - জমি বা প্রাকৃতিক ক্ষেত্র এবং 'c'- কর্পোরেট ক্ষেত্র
'x_n'- জমি বা প্রাকৃতিক ক্ষেত্রের উৎপাদনশীলতা
'x_c'- কর্পোরেট ক্ষেত্রের উৎপাদনশীলতা
'ΔL_n'- জমি বা প্রাকৃতিক ক্ষেত্র থেকে বিস্থাপিত মানুষ

'ΔL_c'- কর্পোরেট ক্ষেত্রে নিয়োজিত মানুষ
ধরে নেওয়া হচ্ছে—

$x_c > x_n$ এবং $\Delta L_c < \Delta L_n$

'a_n' - জমি বা প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে প্রতি ইউনিট উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জমি কেন্দ্রিক প্রাকৃতিক সম্পদ

'a_c' - কর্পোরেট ক্ষেত্রে প্রতি ইউনিট উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জমি কেন্দ্রিক প্রাকৃতিক সম্পদ

'$a_n x_n$' = k_n - জমি বা প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রম একক পিছু উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জমি কেন্দ্রিক প্রাকৃতিক সম্পদ

'$a_c x_c$' = k_c - কর্পোরেট ক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রম একক পিছু উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জমি কেন্দ্রিক প্রাকৃতিক সম্পদ

প্রথমে সরল এক পাটিগণিত উদাহরণ বিবেচনা করা যাক—

	কর্পোরেট ক্ষেত্র	জমি বা প্রাকৃতিক ক্ষেত্র
কর্মসংস্থান, জীবিকা—	$\Delta L_c = +4$	$\Delta L_n = -10$
শ্রম উৎপাদনশীলতা—	$x_c = 6$	$x_n = 2$
উৎপাদনজনিত লাভ/ক্ষতি—	$x_c.\Delta L_c = 6x4 = 24$	$x_n.\Delta L_n = 2x(-10) = -20$

সূচিত হচ্ছে যে—

উৎপাদন বৃদ্ধি— (24-20)/20 = 20% এবং

কর্মসংস্থান হ্রাস— (4-10)/10 = - 60%

প্রতি ইউনিট উৎপাদনের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ—

$a_{c1} = 1/3$ $\quad a_n = 1/2$

$a_{c2} = 1/2$ $\quad a_n = 1/2$

$a_{c3} = 2$ $\quad a_n = 1/2$

শ্রমিক পিছু প্রাকৃতিক সম্পদ—

$k_{c1} = a_{c1}x_c = 2$ $\quad k_n = a_n x_n = 1$

$k_{c2} = a_{c2}x_c = 3$ $\quad k_n = a_n x_n = 1$

$k_{c3} = a_{c3}x_c = 12$ $\quad k_n = a_n x_n = 1$

উৎপাদন ক্ষেত্রের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ—

$k_{c1}\Delta L_c = 2x4 = 8$ $\quad k_n\Delta L_n = 1x10 = 10$

$k_{c1}\Delta L_c = 3x4 = 12$ $\quad k_n\Delta L_n = 1x10 = 10$

$k_{c1}\Delta L_c = 12x4 = 48$ $\quad k_n\Delta L_n = 1x10 = 10$

প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষেত্রে ভারসাম্যহীনতা—

১ম ক্ষেত্র (10-8) = +2

২য় ক্ষেত্র (10-12) = -2

৩য় ক্ষেত্র (10-48) = -38

উপরোক্ত বিশ্লেষণ ইঙ্গিত করে যে, বিস্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়ন যুগপৎ দুইটি ভারসাম্যহীনতা দ্বারা চিহ্নিত। চিরাচরিত জীবিকাক্ষেত্র থেকে যারা বিতাড়িত হয়, তাদের জন্য উচ্চ উৎপাদনক্ষমতা সম্পন্ন কর্পোরেট ক্ষেত্রে যথেষ্ট কর্মসংস্থান সৃষ্টি না হওয়ার কারণে শ্রম সরবরাহে অতিরিক্ত আধিক্য ঘটে। উপরোক্ত উদাহরণে (4-10)= - 6 যেমন অতিরিক্ত শ্রমজীবী। একই সাথে প্রাকৃতিক সম্পদের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়, কারণ প্রাকৃতিক-সম্পদ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উৎপাদন প্রাকৃতিক-সম্পদ নিবিড় (a_{c3}= 2 উচ্চমান দ্বারা সূচিত) হওয়ার কারণে প্রাকৃতিক সম্পদের চাহিদা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায় (10-48) = - 38। কর্মসংস্থানগত ভারসাম্যহীনতা এবং বাস্তুতন্ত্রগত ভারসাম্যহীনতা— এই দুটি মৌলিক সমস্যা বিস্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়নের মডেলটিকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

প্রাকৃতিক সম্পদ নিষ্কাশনের পরিমাণ মানুষের জীবিকা ধ্বংসের সমানুপাতিক— এই অভিমত অনুযায়ী প্রবৃদ্ধির হার যত বেশি হবে, এই সমস্ত সমস্যা ততই তীব্র হবে। আবার রাষ্ট্র যতটা জমি অধিগ্রহণ করে, তার একটা অংশ সরাসরি উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রদান করা হয়না, কারণ তা নগরায়নের কাজে লাগে। যদি মোটারকম মূলধনী লাভের আশা থাকে, তাহলে বেসরকারি সংস্থাগুলি 'জনস্বার্থে' প্রত্যর্পিত জমির অপর এক অংশ সাধারণভাবে তারা ভবিষ্যত ফাটকাবাজির জন্য ধরে রাখে অথবা খনিজগুলি ভবিষ্যতে বিক্রয়ের সুযোগ নেয়।

উচ্ছিন্ন মানুষের একাংশ, সংগঠিত কর্পোরেট ক্ষেত্র কিংবা প্রাকৃতিক ক্ষেত্র, উভয় ক্ষেত্রে জীবিকা হারিয়ে অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে কায়ক্লেশে টিকে থাকার চেষ্টা করে। শহর এবং গ্রামে পরিব্যাপ্ত বিচিত্র কার্যক্রমের সমন্বয়ে এই অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র গঠিত। নিখুঁতভাবে বর্ণনা করা কঠিন হলেও, প্রসঙ্গক্রমে এই ক্ষেত্রটির তিনটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। মজুরি শ্রমের বিপরীতে, 'স্ব-কর্মসংস্থান' শিশু সহ একসাথে সমগ্র পরিবারের অথবা পরিবারের একাংশের শ্রম ইউনিট গঠন করে। এর ফলে ঘণ্টা পিছু প্রতি ব্যক্তির আয় হ্রাস পায়। লাভ এবং মজুরির পার্থক্য করার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়ত, অনেকেই বেঁচে থাকার জন্য নানা ধরণের আংশিক সময়ের পেশা গ্রহণ করে যে কারণে তাদের একক নিয়োগকর্তা অমিল। তাদের পেশাকে প্রধান (principal status) আখ্যা দেওয়া কঠিন কারণ সমগ্র পেশাগুলির সম্মিলিত আয় এবং ব্যয়িত সময়ের হিসাবে বৈষম্য দেখা দেয়। তৃতীয়ত, অনেক সময়ে তাদের পেশার এবং এমনকি তাদের জীবনযাত্রার 'বৈধতা' নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। শুধু যে শ্রমচুক্তিগুলি আইনসিদ্ধ করা হয়না তা নয়, শহুরে বস্তিতে তারা 'জবরদখলকারী', রাষ্ট্র কিংবা কিছু ব্যক্তির অনুগ্রহে জমিতে তারা অননুমোদিত কৃষক। উচ্চতর

প্রবৃদ্ধির জন্য বিস্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়নের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রূপে এই বিস্তৃত অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়।

মূল রচনা 'A Study in Development by Dispossession'। নিবন্ধটি পূর্ণাঙ্গ রচনা নয়। বরং কিছুটা পরিমাণে টেকনিক্যাল আলোচনা। এখনও পর্যন্ত অপ্রকাশিত প্রবন্ধটি পরবর্তী সময়ে কোনো উপযুক্ত জার্নালে প্রকাশিত হবে।

মার্কসবাদ ও দারিদ্র্যের রাজনীতি : দু-একটা জরুরি কথা

রাজেশ ভট্টাচার্য

ভূমিকা

পুঁজিবাদী বাজার-অর্থনীতিতে তার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলো অধিকাংশ সময়ই এক বিশ্রী অতি-পরিচিত সামাজিক সংকটের জন্ম দেয়— অকল্পনীয় সম্পদ-এর পাশাপাশি গভীর দারিদ্র্য বা বৈষম্যের সহাবস্থান। মার্কসবাদীরা চিরকাল-ই দারিদ্র্যকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সামাজিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে বা নেতৃত্বে দিয়েছে, কিন্তু কোন তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর দাড়িয়ে নয়। কী কারণে ধনতন্ত্রে দারিদ্র্য এক স্বাভাবিক সমস্যা-র রূপ নেয়, তার কোন মার্কসীয় ব্যাখ্যা ছাড়াই আন্দোলনে অংশগ্রহণ নেওয়ার ফলে মার্কসবাদীরা সাধারণত নিজেদের অজান্তেই অ-মার্কসীয় তাত্ত্বিক বর্গের শরণাপন্ন হয়েছে। যেমন, দারিদ্র্যের আলোচনায় বারবার পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে আক্রমণের নিশানা করলেও, সেই সমালোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দারিদ্র্যের কারণ হিসেবে শ্রেণী-দ্বন্দ্বের রূপটিকে নির্দিষ্ট করেনি। ফলে, দারিদ্র্যের আলোচনার জোর পড়েছে মুক্ত বাণিজ্য, অর্থনীতির ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ, শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা, মানুষের সাংবিধানিক ও মানবিক অধিকার এবং সম্পদের পুনর্বণ্টন-বিষয়ক দেশীয় আর্থিক নীতি ইত্যাদির ওপর। এই বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ নিশ্চয়ই, কিন্তু যতক্ষণ না এই বিষয়গুলো শ্রেণী-দ্বন্দ্বের সঙ্গে সম্পর্কিত হচ্ছে, ততক্ষণ দারিদ্র্যের রাজনীতি মার্কসীয় পরিসরের বাইরেই নির্ধারিত হচ্ছে।

দারিদ্র্যের রূপ একটি নয়, অনেক। কারখানায় কম মজুরিতে চাকরি করা শ্রমিকের দারিদ্র্য, অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমজীবী মানুষের দারিদ্র এবং জঙ্গল বা আদিভূমি থেকে বিস্থাপিত আদিবাসীদের দারিদ্র্য এক নয়। তাই, ধনতন্ত্রে রাষ্ট্র 'দরিদ্র'-দের বিভিন্ন বর্গে ভাগ করে প্রতিটি বর্গের দারিদ্র্যের আলাদা আলাদ কারণ নির্দিষ্ট করে এবং সেই অনুযায়ী দারিদ্র্য-দূরীকরণ প্রকল্প গ্রহণ করে। যেমন, কারখানার শ্রমিকদের দারিদ্র্য মজুরি ও চাকরির নিশ্চয়তা সংক্রান্ত, যা শেষ বিচারে শ্রম আইন (সংস্কার) এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত। এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্র মালিক ও শ্রমিক-এর সম্পর্ক নির্ধারক দেশীয় নীতিগুলোকে আলোচনার মূল বিষয় করে তোলে। অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমজীবী মানুষদের ব্যাপারটা আলাদা— এখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় সামাজিক বিমা প্রকল্প, শ্রমিকদের দক্ষতা-বৃদ্ধি, উৎপাদকদের প্রযুক্তিগত ও ব্যবসায়িক ঋণ-সংক্রান্ত সহযোগিতা ইত্যাদি। বিস্থাপন ও জমি-অধিগ্রহণের শিকার কৃষকদের জন্য দরকার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ নীতি। আবার, জঙ্গল-অধিবাসী এবং আদিবাসীদের ক্ষেত্রে প্রয়োজন অরণ্যের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর তাদের অধিকার স্বীকার ও নথিকরণ করা, যাতে এই জনজাতিগুলো বঞ্চনা বা প্রতারণার শিকার না হয়।

দারিদ্র্যের এই বিভিন্নকরণের মধ্য দিয়ে সমাজে, বিশেষ করে সমাজের দরিদ্র অংশের মধ্যে, রাষ্ট্রের এই বিপুল, বহুরূপী এবং জটিল উপস্থিতি দারিদ্র্যের রাজনীতিকে মার্কসবাদীদের এক কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে ফেলে দিয়েছে। কীভাবে সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমজীবী মানুষ এবং প্রকৃতি-নির্ভর আদিবাসী কৌমসমাজকে কোন একটি সুনির্দিষ্ট তাত্ত্বিক বর্গের সাহায্যে পুঁজিবাদের মার্কসীয় ক্রিটিকে উপস্থাপন করা যায়? ব্যাপারটা নেহাত-ই আরামকেদারায় বসে তাত্ত্বিক জাবরকাটা নয়— ভারতবর্ষের মত দেশে অধিকাংশ সময়েই সমাজের ওপর পুঁজির অভিঘাত মূলত দারিদ্র্যের রূপ নিয়ে হাজির হয় এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যর কারণে গরিবেরা অনিবার্যভাবে প্রাত্যহিক রাজনীতির অংশ হয়ে ওঠে। কোন মার্কসীয় তত্ত্বের অনুপস্থিতিতে মার্কসবাদীরা অনেক সময়েই এই দৈনন্দিন এবং বিরামহীন দারিদ্র্যের রাজনৈতিক চর্চায় অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হয় অ-মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে— সাধারণত প্রগতিশীল বুর্জোয়া লিবারাল দর্শনের প্রভাবে। উদাহরণস্বরূপ ভারতবর্ষে সাম্প্রতিককালে জমি-অধিগ্রহণ বা অরণ্যের অধিকার সংক্রান্ত রাজনৈতিক বিতর্কে বামপন্থীদের অবস্থান মনে করা যেতে পারে।

খুব সহজভাবে বুঝতে গেলে, দারিদ্র্য জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উৎপাদনের ও ভোগের উপকরণের অপ্রতুলতা-কে নির্দেশিত করে। জীবনের ভিত্তি যদি শ্রম ও প্রাকৃতিক সম্পদের ঐক্য হয়, তাহলে দারিদ্র্যের মূলে রয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদ (যা উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়) থেকে শ্রমিক-উৎপাদকের বিচ্ছিন্নকরণ। পুঁজিবাদী অর্থনীতি-র উৎপত্তির কারণ হিসেবে কার্ল মার্কস এই বিচ্ছিন্নকরণের প্রক্রিয়াকে পুঁজি-র আদি(ম) সঞ্চয়ন নাম দিয়েছিলেন। এই আদি(ম) সঞ্চয়ণের ফলেই পুঁজি আর শ্রমশক্তি-র একটি নির্দিষ্ট (পুঁজিবাদী মজুরি-শ্রমের) সম্পর্কের ভিত্তি রচনা হয়। পুঁজিবাদী সমাজে কিন্তু পুঁজি-শ্রমের সম্পর্ক বহুমাত্রিক, তাই দারিদ্র্যেরও বিভিন্ন রূপ। কিন্তু বিভিন্নতা সত্ত্বেও একথা বলা যেতে পারে যে, দারিদ্র্যের সাধারণ ও মূল কারণ একটাই— পুঁজির আদি(ম) সঞ্চয়ন।

এই প্রবন্ধে পুঁজি ও শ্রমের সম্পর্ক নির্ধারণে আদি(ম) সঞ্চয়নের ভূমিকা নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

উদ্দেশ্য, পুঁজি আর শ্রমের অন্তর্দ্বন্দ্বগুলোকে সুনির্দিষ্ট করা, যতটা সম্ভব তার বহুমাত্রিকতায়। আশা, এর সুবাদে পুঁজিবাদী সমাজে দারিদ্র্যের এক মার্কসীয় ব্যাখ্যার দিকে কয়েক কদম এগোন যাবে।

মার্কসের আলোচনায় পুঁজির আদি(ম) সঞ্চয়ন

মার্কস তার সময়কার প্রভাবশালী বুর্জোয়া ইতিহাসের সমালোচনা করতে গিয়ে ''তথাকথিত আদি সঞ্চয়নের''-এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। বুর্জোয়া ইতিহাসবিদদের মতে ধনতন্ত্র মানবসমাজের জন্য স্বাভাবিক, শাশ্বত ও যথার্থ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এই ব্যাখ্যায় ধনতন্ত্রের দুই মূল শ্রেণীর— মালিক ও শ্রমিক— উদ্ভবের পিছনে রয়েছে ''পূর্ববর্তী সঞ্চয়ন''। অর্থাৎ, এক শ্রেণীর মিতব্যয়ী, পরিশ্রমী, সঞ্চয়ী মানুষ সময়ের সাথে পুঁজির মালিক-এ রূপান্তরিত হয়, আর অন্য এক শ্রেণীর কুঁড়ে, উচ্ছৃঙ্খল ও অমিতব্যয়ী মানুষ একই ভাবে সর্বহারা প্রলেতারিয়েত-এ রূপান্তরিত হয়, যারা এরপর জীবিকা নির্বাহের জন্য পুঁজিপতিদের কাছে মজুরি-র বিনিময়ে শ্রমশক্তি বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এর ফলে জন্ম নেয় আধুনিক ধনতন্ত্রের মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক।

এর বিপরীতে মার্কস ধনতন্ত্রের উদ্ভবের ইতিহাসকে উপস্থিত করেন হিংসা, জুলুম ও দখলের এক রক্তাক্ত আখ্যান হিসেবে, যার সবচেয়ে নাটকীয় উপাদান হলো উৎপাদনের উপকরণের ওপর যাবতীয় সম্পত্তিগত (ব্যক্তিগত বা সর্বজনীন) অধিকার থেকে শ্রমিকদের বিচ্ছিন্ন করা। প্রাক-পুঁজিবাদী সমাজে জমি বা প্রাকৃতিক সম্পদ-ই উৎপাদনের মূল ভিত্তি বা উপকরণ ছিল এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি অনেকাংশেই সর্বজনীন সম্পত্তির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। তাই মূলত জমি, জঙ্গল বা অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি-র আওতায় নিয়ে এসে কৌমসমাজ-এর ভিত্তি যে সর্বজনীন সম্পত্তি, তাকে ধ্বংস করা হল। এর ফলস্বরূপ যৌথ সমাজজীবন থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে শুধু নিজের শ্রমশক্তির ওপর ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারী এক নিঃসঙ্গ শ্রমিকে পরিণত করা হলো।

প্রকৃতি ও শ্রমশক্তির স্বাভাবিক ঐক্য ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে জন্ম নিল দুটি নতুন পণ্য— জমি (অর্থাৎ, যাবতীয় প্রাকৃতিক সম্পদ) এবং শ্রমশক্তি। ধনতন্ত্রের বাজার-ব্যবস্থায় শ্রমশক্তি আর জমি দুই-ই আর পাঁচটা সাধারণ পণ্যের মতো বিবেচিত হয়, তারা বাজারদরের নিয়মে চালিত ও মূল্যায়িত হয়। অথচ, এদের পণ্যে রূপান্তকরণের ইতিহাস অন্য আর পাঁচটা সাধারণ পণ্যের ইতিহাসের মত নয়, একেবারেই বলপ্রয়োগ ও আইনি বাধ্যতার ইতিহাস। কার্ল পোল্যানি এই ধরনের পণ্যকে ''অলীক পণ্য'' আখ্যা দিয়েছেন। প্রাকৃতিক সম্পদ মানবসমাজ উপহার হিসেবে পেয়েছে, পণ্য উৎপাদন ও বিনিময়ের সামাজিক পরিসরে তার উৎপত্তি নয়; একইভাবে শ্রম জীবনযাপনের-ই একটি প্রক্রিয়া, তা প্রধানত পণ্য হিসেবে উৎপাদিত হয় না, বা পণ্য না হয়েও সে জীবনযাপনের অপরিহার্য প্রক্রিয়া হিসেবে থেকে যায়। তাই মার্কস যাকে তথাকথিত আদি সঞ্চয়নের ''গুপ্তকথা'' বলেছেন তা আসলে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে এই ''অলীক পণ্যের'' সৃষ্টি।

মার্কসের আলোচনায় আদি(ম) সঞ্চয়নের এক বিশেষ ঐতিহাসিক ভূমিকা রয়েছে। আদি(ম) সঞ্চয়নের মধ্যে দিয়ে পুঁজিবাদের জন্ম হয়, আবার পুঁজিবাদের জন্মের সাথে সাথে আদি(ম) সঞ্চয়নের প্রয়োজনীয়তা লোপ পায়। মার্কস দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই আলোচনা করেছেন *ক্যাপিটাল গ্রন্থের* প্রথম খণ্ডে এবং *গ্রুন্ড্রিসে গ্রন্থে*। যেমন *গ্রুন্ড্রিসে গ্রন্থে* মার্ক্স বলছেন যে আদি(ম) সঞ্চয়ন পুঁজিবাদী শ্রেণী-সম্পর্কের প্রাগৈতিহাসিক পর্যায়। উদ্বৃত্ত পুঁজি তার নিজের বাস্তবতার ওপরে দাঁড়িয়ে নিজের পুনরুৎপাদন ও স্ব-প্রসারণের শর্তগুলো নিজেই আহরণ করতে পারে। এই ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বুঝতে গেলে ক্যাপিটাল গ্রন্থের প্রথম খন্ডের ''পুঁজিবাদী সঞ্চয়নের সাধারণ নিয়ম'' শীর্ষক অধ্যায়ে মার্কসের আলোচনার দিকে নজর দিতে হবে।

এই অধ্যায়ে মার্কস ''শিল্পের সংরক্ষিত শ্রমিক-বাহিনী''-র ধারণাটি হাজির করছেন এবং এর সাহায্যে পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থায় শ্রমিক-বাহিনী যে সাধারণ পুঁজিবাদী নিয়মের অনুশাসনে বাঁধা থাকে তার ব্যাখ্যা করছেন। মার্কসের মতে শিল্পের সংরক্ষিত শ্রমিক-বাহিনী পুঁজিবাদী সঞ্চয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। পুঁজিবাদী সঞ্চয়নের প্রক্রিয়ায় হঠাৎ করে শ্রমিকের চাহিদা বেড়ে গেলে, এই সংরক্ষিত বাহিনী থেকে শ্রমিকের যোগান আসে, বাহিনী সঙ্কুচিত হয়। এ কারণে বাড়তি শ্রমিকের যোগানের জন্য পুঁজিকে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির ওপর নির্ভরশীল থাকতে হয় না। বা অ-পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ক্ষেত্র থেকে আদিম সঞ্চয়নের মধ্যে দিয়ে উৎপাদনের উপকরণ থেকে উৎপাদনকারীদের বিযুক্ত ক'রে শ্রমিকের যোগানের দরকার পড়ে না। অর্থাৎ পুঁজির সঞ্চয়নের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিকের যোগান পুঁজি তার অভ্যন্তরেই সুনিশ্চিত করতে পারে, অন্য অ-পুঁজিবাদী ক্ষেত্রের ওপর তাকে নির্ভর করতে হয় না। আবার, পুঁজিবাদী সঞ্চয়ন ও প্রতিযোগিতার বাধ্যবাধকতায় পুঁজির আঙ্গিক গঠন (অরগানিক কম্পোজিশন অফ ক্যাপিটাল) বেড়ে যায় এবং শ্রমিক ছাঁটাই-এর ফলে সংরক্ষিত শ্রমিক-বাহিনী পুনরায় প্রসারিত হয়, যাতে ভবিষ্যতে প্রয়োজনে শ্রমিকের যোগান সুনিশ্চিত থাকে। লক্ষণীয় যে পুঁজির উদ্ভবকালে ব্যাপারটা অন্যরকম ছিল। তখন শ্রমিকের যোগান একমাত্র আদি(ম) সঞ্চয়নের মধ্য দিয়ে হতো। অর্থাৎ পুঁজির উদ্ভবের সাথে সাথে আদি(ম) সঞ্চয়নের প্রয়োজনীয়তাও চলে যায়।

পুঁজিবাদী সঞ্চয়ন আর আদিম সঞ্চয়নের তাত্ত্বিক পার্থক্যের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার দেখা যায়। অ-পুঁজিবাদী পরিসর থেকে সম্পদ (জমি এবং অন্যান্য উৎপাদনের উপকরণ) অধিগ্রহণের মধ্যে দিয়ে পুঁজির উদ্ভব। এই প্রক্রিয়ারই নাম আদি(ম) সঞ্চয়ন। অন্য দিকে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে সৃষ্ট উদ্বৃত্ত মূল্যকে পুঁজির সম্প্রসারণে ব্যবহার করাকেই পুঁজির সঞ্চয়ন বলে। উৎপাদনশীল পুঁজির M-C-C'-M' চক্রের শেষে যে মুনাফা হয় (M''-M = Δ M; ΔM/M = পুঁজি সঞ্চয়নের হার) সেটাই সঞ্চয়নের ভিত্তি অর্থাৎ, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পুঁজির অভ্যন্তরেই সম্পদের সম্প্রসারণ।

মার্কসের এই ভাষ্যে পুঁজির এক পূর্ণতার বা সামগ্রিকতার চিত্র ফুটে ওঠে, যেন পুঁজি স্বয়ংসম্পূর্ণ। অন্যভাবে বলতে গেলে, আদি(ম) সঞ্চয়ন যেন পুঁজির অসম্পূর্ণতার লক্ষণ, যা তৃতীয় বিশ্বের (যেখানে পুঁজি এখনও সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি বা উদ্ভূত হচ্ছে) মার্কসবাদীদের মাথাব্যথার বিষয়। আদি(ম) সঞ্চয়ন সংক্রান্ত মার্কসের এই ভাষ্যটিই সাধারণভাবে মান্য ছিল। রোজা লুক্সেমবুর্গের আলোচনায় উন্নত পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে পূর্ণতাপ্রাপ্ত পুঁজির সম্প্রসারণের শর্ত হিসেবে কাঁচামাল বা উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারের প্রয়োজনে অ-পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ধ্বংসের কথা বলা হলেও তা আদি(ম) সঞ্চয়নের গৃহীত তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাকে স্পর্শ করেনি। একইভাবে লেনিনের আলোচনায় পুঁজিবাদের সর্বোন্নত পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে, পুঁজির মুনাফার হারের নিম্নমুখী প্রবণতার সংকট কাটানোর উপায় হিসেবে অনুন্নত (বা অ-পুঁজিবাদী) দেশে বা উপনিবেশে পুঁজি রপ্তানির কথাও বলা হয়েছে, এমনকি আফ্রিকা মহাদেশকে উপনিবেশের আকারে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। অথচ, এই যাবতীয় আলোচনায় আদি(ম) সঞ্চয়নের ভূমিকা অনুল্লেখিত থেকে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী কয়েক দশকে উন্নত পুঁজিবাদী বিশ্বের মার্কসীয় আলোচনা থেকে আদি(ম) সঞ্চয়নের ধারণাটি সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে কল্যাণকামী রাষ্ট্রব্যবস্থা (ওয়েলফেয়ার স্টেট)প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে আদি(ম) সঞ্চয়নের বাস্তবতার ভিত্তি আর রইল না, এরকমই ধারণা গড়ে উঠল।

কিন্তু ১৯৮০-পরবর্তী সময়ে পুঁজিবাদের চরিত্র বদলের সঙ্গে সঙ্গে এই পরিস্থিতিটা রাতারাতি বদলাতে শুরু করল। উন্নত দেশগুলোতে উদারনৈতিক সংস্কারের ধাক্কায় কল্যাণকামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর সুরক্ষার দেওয়ালগুলো হুড়মুড় করে ভাঙতে শুরু করল। আশ্চর্যের কিছু নেই যে উন্নত পুঁজিবাদী দেশের মার্কসবাদীদের চর্চায় আবার আদি(ম) সঞ্চয়নের ধারণাটা ফিরে আসতে শুরু করল। এই পর্যায়ে আদি(ম) সঞ্চয়নের তাত্ত্বিক আলোচনায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান ডেভিড হার্ভি-র। উনি আদি(ম) সঞ্চয়ন শব্দবন্ধটি ব্যবহারের পক্ষপাতী নন, কারণ আদি(ম) সঞ্চয়ন যে প্রক্রিয়াকে নির্দেশিত করে তা শুধু পুঁজিবাদের প্রাগৈতিহাসিক পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য নয়, পুঁজিবাদী সংস্থান-প্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। হার্ভি লুক্সেমবুর্গের আলোচনা থেকে সূত্র টেনেই বললেন যে, পুঁজি নিজেই অ-পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক পরিসরের জন্ম দেয় কোন এক সময়ে, যাতে অন্য কোনও সময়ে তার সংকট এড়াতে সে সেই অ-পুঁজিবাদী পরিসরকে ভেঙে দিতে পারে। অর্থাৎ, পুঁজির সঞ্চয়নের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার পাশাপাশি এবং সম্পর্কিত ভাবে কাজ করে চলে আদি(ম) সঞ্চয়নের প্রক্রিয়া। এই ধারণার ফলে আদি(ম) শব্দ প্রয়োগের আর অর্থ রইল না। হার্ভি তাই নতুন শব্দবন্ধ ব্যবহার করলেন —''অধিকারহরণের মাধ্যমে সঞ্চয়ন'' (অ্যাকুমুলেশন বাই ডিসপজেশন)। বিগত দুই দশকে আদি(ম) সঞ্চয়নের আলোচনা এক নতুন অধ্যায় শুরু হল, যে আলোচনা তাত্ত্বিক ভাবে মার্কসের ধারণা থেকে সরে আসতে শুরু করল।

হার্ভি এবং অন্যান্য মার্কসবাদীদের, এমনকি মার্কসবাদী নন এমন অনেকের আলোচনাতেও আদি(ম) সঞ্চয়নের নতুন ধারণাটা বারবার ব্যবহৃত হলেও, এটা যে একটা নতুন তাত্ত্বিক সমস্যার জন্ম দিচ্ছে সেটার স্বীকৃতি দেখা গেল না। মার্কসের আলোচনায় আদি(ম) সঞ্চয়নের একটা বিশেষ এবং যুক্তিপূর্ণ আলোচনা আছে। সেটা থেকে বেরোতে গেলে, নতুন একটি তাত্ত্বিক পদক্ষেপের প্রয়োজন, যাতে আদি(ম) সঞ্চয়নের নতুন ধারণার ফলে সাধারণভাবে পুঁজির মার্কসীয় ধারণা কী পরিবর্তন এল সেটা পরিষ্কার হয়। সেটা যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ আদি(ম) সঞ্চয়ন বা অধিকার-হরণের মাধ্যমে সঞ্চয়ন মার্কসীয় তাত্ত্বিক কাঠামোয় একটা অনিশ্চিত অবস্থানে থেকে যাচ্ছে। যেটা উল্লেখযোগ্য সেটা হলো, মার্ক্সের আলোচনাতেই, এমনকি *ক্যাপিটাল* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডেই এই তাত্ত্বিক পদক্ষেপের সম্ভাবনা দেখা যায়।

মার্ক্সের আলোচনায় আদি(ম) সঞ্চয়নের এক অন্য পাঠ

ক্যাপিটাল গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে যে পরিচ্ছেদগুলো জুড়ে আদি(ম) সঞ্চয়নের আলোচনা রয়েছে, তার শেষ পরিচ্ছেদটির শিরোনাম হলো ''উপনিবেশ বিস্তারের আধুনিক তত্ত্ব''। শুরুতেই মার্কস উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর সাথে উপনিবেশের পার্থক্য করলেন এই ভাবে।

> অর্থতত্ত্বের (পলিটিক্যাল ইকনমি) জন্মভূমি পশ্চিম ইউরোপে আদি(ম) সঞ্চয়নের প্রক্রিয়া মোটামুটি সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। এখানে পুঁজিবাদী রাজত্ব হয় জাতীয় উৎপাদনের সমস্ত ক্ষেত্রকে জয় করে নিয়েছে, নয়তো যেখানে অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলো অপেক্ষাকৃত কম পরিণত, সেখানে তা অন্তত সমাজের সেই স্তরগুলো পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ

করে, যেগুলো যদিও সেকেলে উৎপাদন-পদ্ধতির অন্তর্গত, তা হলেও পাশপাশি ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় টিকে আছে। ...উপনিবেশগুলোতে পরিস্থিতি অন্যরকম। সেখানে পুঁজিবাদী রাজত্ব সর্বত্র উৎপাদনকারীদের প্রতিরোধের সঙ্গে সংঘর্ষে আসে, যে তার নিজের শ্রমের অবস্থাবলির মালিক হিসেবে সেই শ্রম নিয়োগ করে নিজেকে ধনী করার জন্য, পুঁজিপতিকে ধনী করার জন্য নয়। এই দুই পরস্পর-বিরোধী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেকার দ্বন্দ্ব এখানে কার্যত প্রকাশ পায় এই দুইয়ের সংগ্রামে। ...ই জি ওয়েকফিল্ডের বিরাট কৃতিত্ব হল উপনিবেশের ব্যাপারে নতুন কিছু আবিষ্কার নয়, বরং উপনিবেশগুলোতে মাতৃদেশের পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার শর্তাবলী সংক্রান্ত সত্য আবিষ্কার করা। (মার্কস, *ক্যাপিটাল*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৭১৬-৭১৭)

কী সেই সত্য?

তিনি (ওয়েকফিল্ড) দুঃখ করে বলেন যে মিঃ পীল ইংল্যান্ড থেকে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার সোয়ান রিভারে তার সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন ৫০,০০০ পাউন্ড মূল্যের জীবনধারণ আর উৎপাদনের উপায়-উপকরণ। তা ছাড়া, মিঃ পীলের দূরদৃষ্টি ছিল তার সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর পুরুষ, নারী ও শিশু মিলিয়ে মোট ৩০০০ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে যাবার। একবার তার গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যাবার পরে, "মিঃ পীলের বিছানা করার মতো বা নদী থেকে জল আনার মত কেউ রইল না"। অভাগা মিঃ পীল, যিনি সব কিছুর ব্যবস্থা করেছিলেন, একমাত্র ইংরেজ উৎপাদন-পদ্ধতিকে সোয়ান রিভারে রপ্তানি করা ছাড়া। (মার্কস, *ক্যাপিটাল*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৭১৭)

অর্থাৎ, উপনিবেশগুলোতে (এখানে উপনিবেশ বলতে যেখানে সাদা চামড়ার মানুষরা আদি জনজাতিদের হটিয়ে অঞ্চল, দেশ বা মহাদেশ দখল করে বসতি স্থাপন করেছে সেইসব জায়গায় কথা বলা হচ্ছে) যখন পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা আমদানি করা হচ্ছে, তখন জমির (বা, প্রাকৃতিক সম্পদের) সহজলভ্যতার ফলে শ্রমিকদের উৎপাদন এবং জীবনধারণের উপকরণের জন্য আর মালিকদের ওপর নির্ভরশীল থাকতে হচ্ছে না। সে সহজেই পুঁজিবাদী শ্রেণীসম্পর্ক ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারছে। অর্থাৎ, যেখানেই জমি আর শ্রমের স্বাভাবিক ঐক্যর পথ রুদ্ধ করা যাচ্ছে না সেখানেই শ্রমশক্তির পণ্যায়ন সম্ভব হচ্ছে না। উপনিবেশের উদাহরণে যেটা দেখা গেল, পূর্ণবিকশিত পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক কী অনায়াসে ভেঙে পড়তে পারে, যদি তার অস্তিত্বের শর্তগুলো কোনও কারণে পূরণ না হয়।

এইভাবে বিচার করলে, শ্রমশক্তির পণ্যায়ন কখনই সম্পূর্ণ বা চূড়ান্ত হয় না। বিকল্প বাস্তবতার সামনে শ্রমশক্তির পণ্যরূপ নেহাতই ঠুনকো। তাহলে, কী অর্থে আদি(ম) সঞ্চয়নকে— যা আদতে উৎপাদনের শর্ত বা উপায়গুলো থেকে উৎপাদনকারীর বিচ্ছিন্নকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়— পুঁজির প্রাক্-ইতিহাস বলা যেতে পারে? কেনই বা তা পুঁজির অস্তিত্বের বাস্তব ভিত্তি নয়? এখানেই মার্কসের আলোচনায় অসঙ্গতি। একদিকে, মার্কসের মতে পশ্চিম ইউরোপে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় জমি ও শ্রমশক্তি স্থিতিশীল পণ্যের রূপ নিয়েছে; এতএব আদি(ম) সঞ্চয়নের ঐতিহাসিক যৌক্তিকতা ফুরিয়েছে। অন্যদিকে, সমকালীন ঘটমান ইতিহাসে অন্যত্র অর্থাৎ উপনিবেশে, শ্রমশক্তির পণ্যরূপ বিপন্ন, আদি(ম) সঞ্চয়নের নির্মম আঘাতে সেই পণ্যরূপ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হচ্ছে।

কীভাবে পশ্চিম ইউরোপে পুঁজির পণ্যরূপ স্থিতিশীল হলো? নিশ্চয়ই এর কারণ, পুঁজির বাইরে অন্য কোনও পরিসরে শ্রমের বিকল্প বাস্তবতা ও তাৎপর্য নির্মাণের কোনও অবসর রইল না। এইভাবে যুক্তির বৃত্তটি লক্ষ্য করুন। আদি(ম) সঞ্চয়নের ফলে পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থার জন্ম হলো— পুঁজির অস্তিত্বের শর্ত হলো পুঁজির সঞ্চয়ন— স্ব-প্রসারণের মধ্য দিয়ে পুঁজি বিশ্বজনীন হল, তার বহির্দেশ বলে কিছু পরে থাকল না— ফলে শ্রমশক্তির বিকল্প কোনও বাস্তবতা রইল না— ফলে আদি(ম) সঞ্চয়নের কোনও বাস্তব প্রয়োজন বা যৌক্তিকতা রইল না। মার্কসের হাতে পশ্চিম ইউরাপের বাস্তব ইতিহাসের ধারা বিশুদ্ধ যুক্তির বিকাশের ধারায় পর্যবসিত হলো, ঐতিহাসিক সত্য আর যৌক্তিক আবশ্যিকতা মিলেমিশে গেল। অর্থাৎ, আদি(ম) সঞ্চয়ন যে যুক্তিকে, অর্থাৎ পুঁজির যুক্তিকে জন্ম দিচ্ছে, সেই যুক্তিই আদি(ম) সঞ্চয়নকে অযৌক্তিক করে তুলছে। পুঁজির এই ভাষ্যে কোনও অনিশ্চয়তা, কোনও অনিত্যতা, কোনও ব্যতিক্রম নেই।

কীভাবে উপনিবেশে পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা বিপন্ন হলো? কারণ সেখানে শ্রমশক্তির বিকল্প বাস্তবতার পরিসর রয়েছে, প্রচুর সহজলভ্য জমি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে, যা ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রীয় মালিকানার আওতায় এখনও আসেনি, ফলে শ্রমিকেরা সহজেই সেখানে স্বাধীনভাবে উৎপাদন এবং জীবনধারণ করতে পারছে। তাই উপনিবেশে আদি(ম) সঞ্চয়নের যৌক্তিকতা রয়েছে। কিন্তু যদি শ্রমিকেরা এরকম একটা কাণ্ড উপনিবেশে ঘটাতে পারে, তাহলে তারা নিশ্চয় নিজেদের স্বার্থ বিচার করতে পারে, কারণ তারা এমন একটা উৎপাদন-ব্যবস্থা বেছে নিচ্ছে যেখানে, মার্কসের ভাষায় তারা "শ্রম নিয়োগ করে নিজেকে ধনী করার জন্য, পুঁজিপতিকে ধনী করার জন্য নয়," অথবা তাদের নিজেদের শ্রমশক্তিকে পণ্য-রূপ থেকে, এবং ফলত মালিকের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। *গ্রুন্ড্রিসে* গ্রন্থে মার্কস লিখছেন, "সত্যই, জীবন্ত শ্রম যার শ্রম, যার জীবনের বহিঃপ্রকাশ, সেই

জীবন্ত শ্রমশক্তির কাছেই সে অচেনা হয়ে ওঠে, কারণ তা তার নিজের সৃষ্ট বস্তু, যে বস্তুতে তার শ্রম রূপান্তরিত, সেই বস্তুর বিনিময়ে সে পুঁজির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে'' (পৃ. ৩৯৪)। জীবন্ত শ্রমের এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যেই তার মুক্তির আকাঙ্ক্ষার বাস্তবতা নিহিত আছে। শ্রমিকের স্বার্থই হোক বা আকাঙ্ক্ষাই হোক, শ্রমশক্তির পণ্যায়ণের পথে তা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। স্বার্থ বা আকাঙ্ক্ষা রাজনীতির ভিত্তি, তাই শ্রমিক-রাজনীতির অসংখ্য উদাহরণ *ক্যাপিটাল* গ্রন্থ জুড়ে মার্কস রেখে গেছেন। মার্কস একইসঙ্গে শ্রমশক্তির পণ্যায়ণের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ বলে হাজির করছেন (অন্তত পশ্চিম ইউরোপে), আবার শ্রমশক্তির চূড়ান্ত পণ্যায়নের অসম্ভাব্যতাকেও স্বীকার করছেন। এখানেই মার্কসের আলোচনায় অসঙ্গতিটা ধরা পড়ছে। পুঁজির বিকাশের যুক্তিতে আদি(ম) সঞ্চয়ন তার যৌক্তিকতা হারাচ্ছে, আবার শ্রমিক-রাজনীতির বাস্তবতা তাকে অপরিহার্য করে তুলছে।

আদি(ম) সঞ্চয়নকে পুঁজির বাস্তব ভিত্তি ধরলে, আমাদের পুঁজির ''বর্হির্দেশ''-এর ধারণাটি মুখোমুখি হতে হবে। পুঁজির বর্হির্দেশ মানে অ-পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আলোচনায় আমরা আদি(ম) সঞ্চয়নকে সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিতন্ত্রে উত্তরণের এক নির্দিষ্ট ও অনিবার্য পর্যায় হিসেবে দেখেছি। এখানে অ-পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক বলতে আমরা সাধারণত প্রাক-পুঁজিবাদী সামন্তপ্রথা বা দাসপ্রথার নিজস্ব উৎপাদন-সম্পর্কের কথা ভেবে এসেছি। কিন্তু পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে পরিষ্কার যে আদি(ম) সঞ্চয়ন পুঁজির প্রাক্-ইতিহাস নয়, তার অস্তিত্বের বাস্তব ভিত্তি। তাই প্রাক্-পুঁজিবাদী (যেমন সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীশোষণের অন্তর্গত) উৎপাদন ব্যবস্থা— যা বিশ্ব জুড়ে অনেকাংশেই মুছে গেছে বা দুর্বল হয়েছে— থেকে সরে এসে সমকালীন অ-পুঁজিবাদী উৎপাদনের ক্ষেত্রগুলোর দিকে তাকানো যাক।

মার্কসবাদীদের আলোচনায় পুঁজির ''বর্হির্দেশ''-এর তিন ধরনের ধারণা পাওয়া যায়। প্রথমত, বর্তমান পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেই শ্রমজীবী মানুষের এক বিশাল অংশ এখনও পারিবারিক শ্রমের ওপর নির্ভরশীল ও নিজের জমিতে চাষ করা ক্ষুদ্র স্বাধীন কৃষক হিসেবে টিকে আছে, এদের প্রাক-পুঁজিবাদী নানা বৈশিষ্ট্য এখনও টিকে থাকলেও এরা বহুলাংশেই সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-মুক্ত। এর সঙ্গে যোগ করা যেতে পারে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর সরাসরি নির্ভরশীল, অনেকাংশে সর্বজনীন সম্পত্তি এবং অন্যান্য চিরাচরিত অধিকারের ভিত্তির ওপর টিকে থাকা আদিবাসী ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের। ভারতবর্ষের মত দেশে এদের সংখ্যা বিপুল। জনসংখ্যার এই অংশটি প্রাক-পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার অন্তর্গত হলেও বর্তমানে প্রাক-পুঁজিবাদী কোনও শোষণ ব্যবস্থার অন্তর্গত নয়। এই অংশটিকে ঐতিহাসিক অবশিষ্ট হিসেবে ভাবাটা ঠিক না। কারণ পুঁজিবাদের বিকাশের ধারাতেই এদের পরিবর্তিত রূপে টিকে থাকার কারণ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়ত, পুঁজিবাদকে প্রতিরোধের মধ্যে দিয়ে এক ধরনের বহির্দেশের সৃষ্টি হয়। যেমন, জমি-অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে কৃষকরা আন্দোলন করে তাদের নিজস্ব জীবনধারা এবং প্রাকৃতিক সম্পদকে রক্ষা করার জন্য। একইভাবে যখন শ্রমিকরা কারখানা পরিচালনার ভার তুলে নেয়, বা কম্পিউটারের জগতে ওপেন সোর্স সফটওয়ারের সৃষ্টিকর্তারা কর্পোরেট সংস্থার কপিরাইট রাজত্বের বাইরে নিজেদের ও অপরের সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখতে সচেষ্ট হয়, বা গরিব শ্রমজীবী মানুষেরা রাষ্ট্রীয় বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি দখল করে গড়ে তোলে বস্তি, যেখানে নানারকম স্বাধীন উৎপাদন করে তাদের জীবিকার বন্দোবস্ত করার অবিরাম লড়াই চালায় তারা, বা যখন কপিরাইটের তোয়াক্কা না করে এবং রাষ্ট্রের শাসানি উপেক্ষা করে পুঁজিবাদী পণ্যর নকল বিক্রি করে বেঁচে থাকে অসংগঠিত ক্ষেত্রের উৎপাদকরা, তখন আসলে সম্পত্তির রাজত্ব-কে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পুঁজির এক বহির্দেশ সৃষ্টি হয়। সচেতন রাজনীতিতে এগুলো পুঁজিবাদ-বিরোধী নাও হতে পারে, এমনকি আন্দোলনকারী বা প্রতিরোধকারীদের স্বার্থ বা আকাঙ্ক্ষাও পুঁজি-বিরোধী না হতে পারে, তবুও এই প্রতিরোধের ফলে বাস্তবে বারবার পুঁজির সীমারেখা চিহ্নিত করে দেওয়া হয়, যার বাইরে একটি অ-পুঁজিবাদী উৎপাদনের পরিসরকে সৃষ্টি করা হয় বা টিকিয়ে রাখা হয়।

পুঁজির বহির্দেশের তৃতীয় ধারণাটি একটু জটিল, কারণ তা আমাদের স্বীকার করতে বাধ্য করে যে পুঁজিবাদের বিকাশের প্রক্রিয়াতেই এবং সম্পর্কিতভাবেই অ-পুঁজিবাদী ক্ষেত্রের জন্ম হয় বা প্রসার হয়। অর্থাৎ, পুঁজি নিজেই অ-পুঁজির জন্ম দেয় বা জিইয়ে রাখে। এই ধারণাটি নানাভাবে বিভিন্ন মার্কসীয় তাত্ত্বিকদের লেখায় উঁকিঝুঁকি মেরেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালের দুটি লেখায় এই ধারণাটির একটি স্পষ্ট রূপ পাওয়া যায়। ডেভিড হার্ভি-র উল্লেখ আগেই করেছি। ওনার মতে এটা ভুল ধারণা যে পুঁজি স্বয়ংসম্পূর্ণ— যে সে তার নিজের অভ্যন্তরেই নিজের পুনরুৎপাদনের (বা স্ব-প্রসারণের) যাবতীয় প্রয়োজনীয় শর্তগুলো মেটাতে পারে। (ডেভিড হার্ভি, *দ্য নিউ ইম্পিরিয়ালিজম*) পুঁজির স্ব-প্রসারণের প্রক্রিয়ায় অনেক সময়েই তাকে সংকটের মুখোমুখী হতে হয়— হার্ভির মতে পুঁজি বারবার অতিসঞ্চয়নের সমস্যার মুখোমুখী হয়। এই সংকটের মুহূর্তে পুঁজির দরকার একটি অ-পুঁজিবাদী বহির্দেশ, যার থেকে সে অত্যন্ত স্বল্পমূল্য বা বিনামূল্যে শ্রমশক্তি সহ প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণ করতে পারবে এবং তাতে উদ্বৃত্ত পুঁজি (অতি-সঞ্চয়নের সংকটের মূল কারণ) বিনিয়োগের মধ্যে দিয়ে মুনাফার নতুন উৎস ও সংকটমোচনের পথ খুঁজে নিতে

পারবে। হার্ভি মার্কস থেকে সরে এসে বললেন যে পুঁজি অতিসঞ্চয়নের সংকট সামলাতে প্রাক-বিদ্যমান কোনও বহির্দেশকে ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু দরকারে সে সক্রিয়ভাবে তার বহির্দেশ নিজে সৃষ্টিও করতে পারে, যাতে সংকটকালে সে তাকে ব্যবহার করতে পারে। হার্ভি এই জায়গায় খুব স্পষ্ট করে বলেননি পুঁজি কীভাবে তার বহির্দেশ সক্রিয় ভাবে সৃষ্টি করে। যে তুলনা তিনি ব্যবহার করেছেন সেটা হলো পুঁজির সঞ্চয়নের স্বার্থে শিল্পের সংরক্ষিত শ্রমিক বাহিনীর ব্যবহার, যাকে একবার প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সাহায্যে বেকারত্ব বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে স্ফীত করা হয়, তার মধ্যে দিয়ে মজুরির হার কমিয়ে আনা যায়, আবার বিনিয়োগের নতুন নতুন সম্ভাবনা দেখা দিলে তার থেকেই অল্প মজুরিতে শ্রমিক নিয়োগ করা হয়। অর্থাৎ, পুঁজি একবার শ্রমশক্তিকে তার বাইরে *ঠেলে* দেয় (তার বহির্দেশে নির্বাসিত করে), তার অবমূল্যায়ন ঘটায়, আবার দরকারে অবমূল্যায়িত শ্রমশক্তিকে তার ভিতরে অন্তর্ভুক্ত করে।

আবার কল্যাণ সান্যাল তাঁর *রিথিংকিং ক্যাপিটালিস্ট ডেভালপমেন্ট* গ্রন্থে পুঁজির বহির্দেশ অন্যভাবে হাজির করেছেন। তাঁর মতে, পুঁজি তার পুনরুৎপাদনের অর্থনৈতিক শর্তগুলোর ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে, কিন্তু রাজনৈতিক শর্তগুলোর দরকারে তাকে সক্রিয়ভাবে বহির্দেশ নির্মাণ করতে হয়। এখানে পুঁজির সংকট অন্যরকম। উনি উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রেক্ষিতে দেখিয়েছেন কীভাবে পুঁজিবাদের বিকাশে এক উদ্বৃত্ত জনগণের সৃষ্টি হচ্ছে যাদের পুঁজির অভ্যন্তরে শ্রমিকবাহিনীতে কোনও স্থান নেই— পুঁজির প্রয়োজনের অতিরিক্ত তারা, নেহাতই বাড়তি, ফালতু। আদি(ম) সঞ্চয়নের আঘাতে উৎপাদন ও জীবনধারণের উপায়-উপকরণ হারানো এইসব শ্রমজীবী মানুষ পুঁজির অভ্যন্তরে শোষিত হওয়ার ভাগ্য থেকেও বঞ্চিত, তাঁরা পুঁজিবাদী অর্থনীতির বহিষ্কৃত অংশ। এখন, গণতান্ত্রিক দেশে রাজনীতির নিজস্ব বাধ্যবাধকতার কারণে এই বহিষ্কৃত অংশকে অর্থনৈতিক ভাবে পুনর্বাসিত করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু, পুঁজির ভেতরে নয়, বাইরে কোনও অ-পুঁজিবাদী পরিসরে। এই উদ্বৃত্ত জনগণই সেলফ-হেল্প গ্রুপ, মাইক্রোফিনান্স ইত্যাদি নানা উন্নয়নমূলক এবং দারিদ্র্য-দূরীকরণ প্রকল্পের লক্ষ্য। এই প্রকল্পগুলো চালাতে যে অর্থের প্রয়োজন তার একটা বড় অংশ পুঁজিবাদী অর্থনীতির অভ্যন্তরে সৃষ্ট মুনাফা বা অন্যান্য প্রকারের আয় থেকেই আসে। অর্থাৎ, এখানে যেন বা আদি(ম) সঞ্চয়নের পরিণামের একটা প্রতিবর্তন হচ্ছে। আবার, দরকারে এই অ-পুঁজিবাদী পরিসরকে আবার আদি(ম) সঞ্চয়নের আঘাতে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে... ভাঙ্গা-গড়ার এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকছে। যেহেতু এই তাত্ত্বিক কাঠামোয় পুঁজির স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠা অসম্ভব, তাই পুঁজি তার বহির্দেশকে নিয়েই পুনরুৎপাদিত হচ্ছে।

পুঁজির বহির্দেশ নিয়ে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হলো এটাই দেখানো যে পুঁজির স্বয়ংসম্পূর্ণতার ধারণা থেকে শুরু করলে আমরা আদি(ম) সঞ্চয়নের একটি নির্দিষ্ট ধারণায় এসে পৌছব, অন্যদিকে পুঁজির স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে প্রশ্ন করলে আমরা আদি(ম) সঞ্চয়নের মূলগতভাবে ভিন্ন ধারণায় এসে পৌছব। পুঁজির বহির্দেশের উপস্থিতি মানেই শ্রমশক্তির বিকল্প বাস্তবতা ও তাৎপর্যের উপস্থিতি, এবং আগের আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি যে শ্রমশক্তির বিকল্প বাস্তবতার সামনে আদি(ম) সঞ্চয়ন সক্রিয় হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, আদি(ম) সঞ্চয়ন পুঁজির প্রাক-ইতিহাস— এই ধারণাটাকে ছাড়তে হবে, মানতে হবে আদি(ম) সঞ্চয়ন পুঁজির বাস্তব ভিত্তি, পুঁজি স্বভাবতই জীবনবিনাশী। মনে রাখতে হবে *ক্যাপিটাল* গ্রন্থে মার্কসের উদ্দেশ্য ছিল পুঁজির ব্যাখ্যা করা, সেখানে অন্য সবকিছু থেকে পুঁজিকে আলাদা করার পর তাকে তার বিশুদ্ধতায় বোঝার চেষ্টা হয়েছে, তাতে মনে হয়েছে মার্কস যেন পুঁজিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হিসেবেই বুঝেছেন। কিন্তু, হতেই পারে যে পুঁজিকে বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক বর্গ হিসেবে বোঝার প্রয়োজনে মার্কসকে যে তাত্ত্বিক বিমূর্ততার আশ্রয় নিতে হয়েছে, তাতে পুঁজির বাইরের আর কিছুই (অর্থাৎ, পুঁজির বহির্দেশ) দৃশ্যমান হয়নি।

এই আলোচনার এখানেই ইতি টানা যাক। আমরা এবার যেখান থেকে শুরু করেছিলাম— পুঁজিবাদী সমাজে দারিদ্রের রাজনীতি— সেইখানে ফেরা যাক।

পুঁজির সঞ্চয়ন, উদ্বৃত্ত জনগণ ও দারিদ্র্যের সাধারণ তত্ত্ব

প্রথম যেটা লক্ষ্য করার ব্যাপার, সেটা হল যে দারিদ্র্যের আলোচনাতে সবসময়েই পুঁজির অসম্পূর্ণতার কথা টেনে আনা হয়। যেমন আন্তর্জাতিক তুলনায় উন্নয়নশীল দেশ = পুঁজির অসম্পূর্ণতা = দারিদ্র, আবার উন্নয়নশীল দেশের ভেতরে, কৃষিক্ষেত্র = পুঁজির অসম্পূর্ণতা = দারিদ্র্য— এরকমই দারিদ্র্যের সর্বজনীন উপস্থাপনা। পুঁজির অসম্পূর্ণতা মানেই অ-পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা, তাই দারিদ্র্য আর অ-পুঁজিবাদী উৎপাদন সমার্থক হয়ে দাড়ায়। আবার পূর্বোক্ত আলোচনাতে আমরা দেখেছি যে পুঁজি নিজেই অ-পুঁজির জন্ম দেয়, তাকে টিকিয়ে রাখে বা প্রসারিত করে। তাহলে, দারিদ্র্য আর অ-পুঁজিকে সমার্থক করে তোলার মধ্যে একটা উপস্থাপনার রাজনীতি আছে— যাতে আমরা ক্ষুদ্র কৃষকদের, অসংগঠিত ক্ষেত্রের ছোট উৎপাদকদের বা আদিবাসী জনজাতিদের দারিদ্র্যের লেন্স দিয়েই দেখি। অথচ, ঠিক আগের আলোচনাতেই আমরা দেখলাম সে স্ব-প্রসারণ পুঁজির যুক্তি হলেও, পুঁজি সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে অপারগ। পুঁজি যেহেতু তার বহির্দেশের ওপর নিজের অস্তিত্বের শর্তাবলির জন্য নির্ভরশীল, তাই এই অ-পুঁজিবাদী বহির্দেশ আসলে পুঁজির দুর্বলতার, ভঙ্গুরতার, খর্বতার প্রতীক— পুঁজি আসলে বিশ্বজয় করতে

পারে না। উপস্থাপনার রাজনীতিটা এখানেই যে, পুঁজি নিজের দুর্বলতা আড়াল করে দারিদ্র্যের দায়ভার 'অপরের' (অর্থাৎ, অ-পুঁজির) ওপর চাপিয়ে দিতে পারছে। দারিদ্র্যকে দুভাবে দেখা যেতে পারে। এক, পুঁজি দারিদ্র্যকে সৃষ্টি করে, টিকিয়ে রাখে শ্রমিকশ্রেণীকে শাসনে রাখার জন্য, এক্ষেত্রে দারিদ্র্যকে সামাজিকভাবে ব্যবহার করতে পারার ক্ষমতার মধ্যে পুঁজির শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। দুই, পুঁজির সঞ্চয়ন ও দারিদ্র্য সম্পর্কিতভাবে একই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পুনরুৎপাদিত হয়, অর্থাৎ পুঁজি দারিদ্র্যকে অতিক্রম করতে পারে না। ফলে সামাজিকভাবে পুঁজির কর্তৃত্ব কখনই প্রশ্নাতীত হয় না— এটা পুঁজির দুর্বলতা। পুঁজিবিরোধী আন্দোলনে দ্বিতীয়টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। যেহেতু যে কোনও পাঠই রাজনৈতিক, তাই এই দ্বিতীয় পাঠের দেখানো পথেই এগোনো যাক।

ক্যাপিটাল গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে মার্কস পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে শ্রমজীবী মানুষের পুঁজির সাপেক্ষে বিভিন্ন অবস্থানের কথা আলোচনা করেছেন। পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের ভিত্তি হলো শ্রমশক্তির পণ্যায়ন। কিন্তু, একই সঙ্গে মার্কসের আলোচনায় পাওয়া যায় যে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে অতিরিক্ত জনসংখ্যার সমস্যাটি একটি নির্দিষ্ট সামাজিক রূপ নেয়। এ ব্যাপারে টমাস ম্যালথাস-এর প্রভাবশালী লেখায় প্রাকৃতিক কারণ এবং মানুষের স্বভাবগত আচরণের ফলাফল হিসেবে অতিরিক্ত জনসংখ্যার যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তার তীব্র সমালোচনা মার্কসের বিভিন্ন লেখায় পাওয়া যায়। মার্কসের মতে "ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির ও অতিরিক্ত জনসংখ্যারও ভিন্ন ভিন্ন সাধারণ সূত্র পাওয়া যায়" (মার্কস, *গ্রুন্দ্রিসে*, পৃ. ৬০৪)। মার্কসের মতে, পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে উদ্বৃত্ত জনগণের ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট রূপ হচ্ছে শিল্পের সংরক্ষিত শ্রমিক বাহিনী। কিন্তু তার মানে এই নয় যে শিল্পের সংরক্ষিত শ্রমিক বাহিনী পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে উদ্বৃত্ত জনগণের একমাত্র বা এমনকি প্রধান রূপ। একমাত্র বিশুদ্ধ পুঁজিবাদী অর্থনীতিতেই (যা মার্কসের *ক্যাপিটাল* গ্রন্থের তাত্ত্বিক অলোচনার বিষয়বস্তু) উদ্বৃত্ত জনগণ সংরক্ষিত বাহিনীর বিশুদ্ধ রূপ ধারণ করে। কিন্তু, আমরা যেহেতু আগেই বিশুদ্ধ পুঁজিবাদী অর্থনীতির ধারণাটাকেই ত্যাগ করেছি, তাই উদ্বৃত্ত জনগণের ধারণাটাকেও ভাবতে হবে পুঁজি এবং অ-পুঁজির মিশ্র অর্থনৈতিক পরিসরে। কিন্তু অধিকাংশ মার্কসীয় লেখায় উদ্বৃত্ত জনগণ বলতে সংরক্ষিত বাহিনীই প্রধানত বোঝা হয়েছে। এর ফলে সময়ের সাথে সাথে সাধারণভাবে শ্রমশক্তির এবং বিশেষ করে উদ্বৃত্ত জনগণের একটি অত্যন্ত পুঁজিকেন্দ্রিক ভাষ্য দানা বেধেছে। যেন সমাজে সামগ্রিকভাবে শ্রমশক্তি পুঁজির শোষণ-যন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থার অন্তর্গত শ্রমিক প্রত্যক্ষভাবে শ্রেণী-শোষণের সম্পর্কে অন্তর্ভুক্ত।

সংরক্ষিত বাহিনীর শ্রমিক শুধু যে সেই শ্রেণী-শোষণের অস্তিত্বের শর্ত তাই নয়, বাস্তবেও সে কখনো সেই সম্পর্কের ভেতরে তো পরের মুহূর্তেই বাইরে। অর্থাৎ, সক্রিয় আর সংরক্ষিত শ্রমিক বাহিনী মিলে আসলে একটাই সামাজিক বাহিনী উপস্থিত *হচ্ছে*, যা পুঁজির সঞ্চয়নের মূল শর্ত হিসেবে কাজ করছে। আরেকটি অর্থেও সংরক্ষিত বাহিনী পুঁজির অন্তর্গত। সংরক্ষিত বাহিনী টিকে থাকে পুঁজির অভ্যন্তরে সৃষ্ট সামগ্রিক উৎপাদনের ওপর। শ্রমশক্তির বাজারে কোনও ক্রেতা না থাকলে তার জীবনধারণের জন্য বেকার শ্রমিকদের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সামাজিক সুরক্ষাজালের ওপর নির্ভর করতে হয়। পুঁজির অভ্যন্তরে যে সম্পদ সৃষ্টি *হচ্ছে* প্রতিনিয়ত তার একটা অংশ সামাজিক সুরক্ষানীতির কল্যাণে এই বেকার শ্রমিকবাহিনীকে টিকিয়ে রাখার জন্য ব্যবহার হয়। অর্থাৎ সংরক্ষিত বাহিনী শুধু পুঁজির সঞ্চয়নের শর্ত নয়, পুঁজি আক্ষরিক অর্থেই সংরক্ষিত বাহিনী পোষে। এই বিশেষ বন্দোবস্তের উদাহরণ ধনী পুঁজিবাদী দেশগুলোর কল্যাণকামী রাষ্ট্র এবং বেকারত্ব সামলানোর আর্থিক নীতিগুলো।

পুঁজিবাদী সমাজে উদ্বৃত্ত জনগণের ধারণাটি কিন্তু আরও ব্যাপ্ত। কল্যাণ সান্যালের আলোচনায় শোষিত শ্রমশক্তির পাশাপাশি বহিষ্কৃত শ্রমশক্তির একটা ধারণাও পাওয়া যায়। এই বহিষ্কৃত শ্রমশক্তি আক্ষরিক অর্থেই পুঁজির প্রয়োজনের অতিরিক্ত। বর্তমান অবস্থায় এদের পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই, এবং শ্রমশক্তির এই অংশটিকে শুধুমাত্র পুঁজির সম্পদের উপর নির্ভর করে কল্যাণমূলক নীতির সাহায্যে টিকিয়ে রাখাও অসম্ভব। অতএব, না এই অংশটি পুঁজির সঞ্চয়নের শর্ত হিসেবে কাজ করছে, না এ টিকে থাকার জন্য পুঁজির ওপর নির্ভরশীল। উদ্বৃত্ত জনগণের এই অংশটিকে বুঝতে গেলে তাকাতে হবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর দিকে, যে দেশের অর্থনীতিতে পুঁজির সামাজিক কর্তৃত্ব আছে, কিন্তু অর্থনৈতিক ব্যাপকতা নেই। অর্থাৎ, যে দেশগুলোয় পুঁজির বাস্তব সর্বজনীনতা ছাড়াই মতাদর্শগত কর্তৃত্ব লক্ষ্য করা যায়। আমি এটা বলতে চাই না যে উদ্বৃত্ত জনগণের এই সামাজিক রূপটা শুধুমাত্র উন্নয়নশীল, তুলনামূলকভাবে গরিব দেশগুলোরই বৈশিষ্ট্য, ধনী উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর নয়। কিন্তু, যে কোনও কারণেই হোক (সেটি একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হতে পারে) উন্নত দেশে এর সামাজিক রূপ এতটা প্রকট বা স্পষ্ট নয়। এই বহিষ্কৃত শ্রমিকবাহিনী টিকে থাকে কী করে? মূলত এক অ-পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় জীবিকার সংস্থান ক'রে। উন্নয়নশীল দেশের বিশাল অসংগঠিত ক্ষেত্রের (ভারতবর্ষের শ্রমজীবী মানুষের ৯০ শতাংশ) শ্রমিক-উৎপাদকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আসলে এক অ-পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। এই দিকটা বিচার করলে আসলে

উন্নয়নশীল দেশে সংরক্ষিত বাহিনী এই ধারণাটারই কোনও মানে হয় না। খানিকটা সরলীকরণের ঝুঁকি নিয়ে বলা যেতে পারে যে উন্নয়নশীল দেশে শ্রমজীবী মানুষদের দুটি মূল ভাগে ভাগ করা যেতে পারে— সক্রিয়ভাবে পুঁজি-দ্বারা শোষিত শ্রমিকশ্রেণী এবং উদ্বৃত্ত, পুঁজি-দ্বারা বহিষ্কৃত শ্রমজীবী মানুষ।

উদ্বৃত্ত, বহিষ্কৃত— এই বিশেষণগুলোর ব্যবহার করার মানে এই নয় যে বহিষ্কৃত শ্রমজীবী মানুষের সাথে পুঁজির কোন যোগ নেই। বহিষ্কৃত শ্রমজীবী মানুষের সৃষ্টির মূলে আছে আদি(ম) সঞ্চয়ন, যার ধাক্কায় সে উৎপাদনের উপায়-উপকরণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, কিন্তু মজুরি শ্রমিকে পরিণত হয়নি। অর্থাৎ, জমি (বা প্রাকৃতিক সম্পদ) ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসেবে পণ্যায়িত হয়েছে, কিন্তু জমির ওপর অধিকার-হারানো উৎপাদকের শ্রমশক্তি-র পণ্যায়ন হয়নি। ভারতবর্ষে এই প্রক্রিয়ার শুরু ঔপনিবেশকালে, কিন্তু উত্তর-ঔপনিবেশিক অর্থনীতির বিকাশে সে একটি স্থায়ী অর্থনৈতিক কাঠামোর অংশ হিসেবে টিকে থেকেছে, এমনকি প্রসারিত হয়েছে।

এটা ঠিকই যে পুঁজির অভ্যন্তরে উৎপাদিত সম্পদের একটি অংশ এই বহিষ্কৃত অংশটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই বহিষ্কৃত শ্রমজীবী অংশটি মূলত একটি অ-পুঁজিবাদী ক্ষুদ্র উৎপাদনভিত্তিক অর্থনৈতিক পরিসরে অবস্থিত। সেখানে যেমন আমাদের অতি-পরিচিত নিজস্ব ক্ষুদ্র জমির ওপর আইনগত অধিকার-ভোগী কৃষিপরিবারের অর্থনৈতিক কাজকর্ম রয়েছে, তেমনই মূলত পারিবারিক শ্রম এবং উৎপাদনের উপকরণের ওপর অত্যন্ত ভঙ্গুর, অস্বীকৃত সম্পত্তিগত অধিকারকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা শহুরে অসংগঠিত ক্ষেত্রের উৎপাদকেরা রয়েছে। (বস্তিতে বা দখল করা জমিতে গরিবদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডর কথা ভাবুন), আবার আদিবাসী সমাজের অস্পষ্ট অপ্রাতিষ্ঠানিক সর্বজনীন সম্পত্তির ওপর নির্ভরশীল উৎপাদনও রয়েছে। বেকার-ভাতার ওপর নির্ভরশীল সংরক্ষিত বাহিনীর নিষ্ক্রিয় শ্রমিক বাহিনী এবং অ-পুঁজিবাদী পরিসরে জীবিকা-নির্বাহকারী বহিষ্কৃত শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে একটা মিল হচ্ছে— দুক্ষেত্রেই শ্রমশক্তি অ-পণ্যায়িত থাকছে, কিন্তু এখানেই মিলের শেষ। সংরক্ষিত বাহিনীর নিষ্ক্রিয় অংশটি যে কোনও উৎপাদন ব্যবস্থারই বাইরে, পুঁজির বণ্টিত সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু বহিষ্কৃত শ্রমজীবী সমাজ একটি (অ-পুঁজিবাদী) উৎপাদব্যবস্থার অন্তর্গত, পুঁজির বণ্টিত সম্পদ মূলত সেই উৎপাদনের পরিসরের অস্তিত্বের শর্ত, সরাসরি শ্রমশক্তির পুনরুৎপাদন শর্ত নয়।

অন্য একভাবে দেখা যেতে পারে ব্যাপারটা। বহিষ্কৃত শ্রমজীবী মানুষ যেহেতু একটা উৎপাদনের ক্ষেত্র তৈরি করে, সেটা পুঁজির ''বহির্দেশ'' হিসেবে সমাজে উপস্থিত থাকে। এবং এই বহির্দেশের উপস্থিতি, উৎপাদনের উপকরণের বা প্রাকৃতিক সম্পদের উপর তার দাবির মধ্যে দিয়ে সে পুঁজির সামাজিক সীমারেখা নির্দিষ্ট করে। পুঁজি এই সীমারেখা অতিক্রম করতে চায় আদি(ম) সঞ্চয়নের নতুন আঘাতের মধ্যে দিয়ে। সুতরাং, বহিষ্কৃত শ্রমজীবী মানুষ ছায়ার মতোই অবিরাম পুঁজিকে অনুসরণ করে, পুঁজিকে অস্থির করে তোলে। পুঁজি তাকে বহিষ্কার করলেও, তার থেকে পালাতে পারে না। শ্রমিক শ্রেণী পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থার অন্তর্গত, পুঁজির অভ্যন্তরে সে যা সম্পদ সৃষ্টি করে তার ওপর প্রাথমিক উৎপাদক হিসেবে তার বৈধ অধিকার আছে। এমনকি যেহেতু সংরক্ষিত শ্রমিক বাহিনীও পুঁজির সঞ্চয়নের শর্ত, তাই সংরক্ষিত বাহিনীর অন্তর্গত বেকারদেরও সামাজিক সুরক্ষার ওপর ন্যায্য দাবি আছে। কিন্তু বহিষ্কৃত শ্রমজীবী মানুষের পুঁজির অভ্যন্তরে যে সম্পদ সৃষ্টি হয়, তার ওপর কোনও অধিকার নেই, কারণ সেই সম্পদ উৎপাদনে তার কোনও ভূমিকা নেই। একইভাবে সামাজিক সুরক্ষার ওপর তার দাবিও দুর্বল, কারণ সামাজিক সুরক্ষার তহবিলে তার কোনও অবদান নেই। সে বাহ্যত পুঁজির বদান্যতার ওপর নির্ভরশীল; কিন্তু যে প্রক্রিয়ায় সে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর তার অধিকার হারায় এবং সেই হৃত সম্পদের ওপর দাঁড়িয়ে পুঁজির সম্পদ সৃষ্টি হয়, সেই প্রক্রিয়ার ইতিহাস অলিখিত থেকে যায়— সেটা আদি(ম) সঞ্চয়নের গুপ্তকথা ও পুঁজিবাদী সমাজে দারিদ্র্যের সাধারণ ইতিহাস।

উপসংহার

আর্জেন্টিনা-মেক্সিকোর মার্কসিস্ট তাত্ত্বিক এনরিকে দুসেলের মতে, মার্কসের লেখার প্রচলিত পাঠে ''সম্পূর্ণতা'' একটি মৌলিক তাত্ত্বিক ধারণা হিসেবে গৃহীত। কিন্তু, পুঁজির বিপরীতে শ্রমিককে দাঁড় করালে— যে বিশেষ ভাবে দাঁড় করালে পুঁজি-শাসিত তাৎপর্যের বাইরে 'শ্রমিকের' অন্য কোনও তাৎপর্য উঠে আসার সম্ভাবনা থেকে যায়— পুঁজির সাপেক্ষে শ্রমিক হাজির হয় সর্বাঙ্গে ''বাহ্যিকতার'' চিহ্ন নিয়ে। দুসেলের মতে, ''সম্পূর্ণতা''র পরিবর্তে বাহ্যিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে পুঁজি-শ্রমের সম্পর্ক দেখা উচিত।

> ''সম্পূর্ণতা'' যদি একমাত্র ধারণা হয়, তাহলে পুঁজির অভ্যন্তরে যারা নির্যাতিত তারা শোষিত শ্রেণী হিসেবে নির্যাতিত; কিন্তু যদি বাহ্যিকতার ধারণাকেও নির্মাণ করা যায়, তাহলে যে নির্যাতিত সে মানুষ রূপে, পুরুষ রূপে (মজুরি-শ্রম নয়), জীবন্ত শ্রম রূপে, যা এখনও জড় পদার্থে রূপান্তরিত হয়নি, (একাকী) বা জনগণ হিসেবে (সম্প্রদায় হিসেবে) দরিদ্র হতে পারে। পুঁজির অন্তর্গত নির্যাতিতদের (সম্পূর্ণতার অংশ হিসেবে) সামাজিক অবস্থা হচ্ছে ''শ্রেণী''; বাহ্যিকতার অবস্থায় নির্যাতিতদের সম্প্রদায়গত অবস্থা হলো ''জনগণ''। (দুসেল, *টুওয়ার্ডস অ্যান আননোন মার্কস*, পৃ. ২৪৫।

দুসেলের আলোচনায় শ্রমিকের জীবন্ত শ্রম পুঁজির সাপেক্ষে বাহ্যিকতা; পুঁজি তাকে অন্তর্গত করে, আর শ্রমিক সেই বাহ্যিকতাকে অনুভব করে তার বিচ্ছিন্নতাবোধের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু, তার এই বাহ্যিকতা পুঁজির বাইরের অন্য কোন বাস্তবতা (= অ-পুঁজির) বস্তুগত ভিত্তিও বটে। এখানে আমাদের পূর্বের আলোচনা দুসেলের খুব কাছাকাছি এসে পরে।

আমরা দেখেছি, আদি(ম) সঞ্চয়নেব ধাক্কায় নগ্ন ও নিঃশেষিত উদ্বৃত্ত জনগণের পুঁজির অভ্যন্তরে উৎপাদিত সামাজিক সম্পদের ওপর ন্যায্যত কোনও দাবি নেই। তাই সে কাঙাল। আদি(ম) সঞ্চয়নের ফলে মজুরি-শ্রমিক নয়, প্রাথমিকভাবে কাঙালের জন্ম হয়। মার্কসের ভাষায়, "মুক্ত শ্রমিকের ধারণার মধ্যে কাঙাল অন্তর্ভুক্ত" (মার্কস, গ্রুন্ডিসে, পৃ. ৬০৪)। পুঁজির প্রভাবে শ্রমশক্তির মৌলিক ও প্রাথমিক রূপ হল কাঙালের। কিন্তু কাঙাল যখন বহিষ্কৃত জনগণের অন্তর্গত হয়, অর্থাৎ মজুরি-শ্রমিকে রূপান্তরিত হতে পারে না, তখন তার বাহ্যিকতা বিকল্প বাস্তবতার (যাকে আমরা পুঁজির বহির্দেশ বলে এই লেখায় চিহ্নিত করেছি) সৃষ্টির উৎস হিসেবে কাজ করার সম্ভাবনা বহন করে। অর্থাৎ, কাঙালকে দারিদ্র্যের চোখ দিয়ে দেখলে আসলে পুঁজির ফাঁদে পা দিতে হয়, কারণ পুঁজি নিজেকে সম্পদের, সমৃদ্ধির প্রতিনিধি হিসেবে হাজির করে আর কাঙালকে হাজির করে উষর, বন্ধ্যা, অপ্রাকৃত কোনও শক্তির প্রতিনিধি হিসেবে। অন্যদিকে, কাঙালকে বাহ্যিকতার দৃষ্টিতে দেখলে সে সম্পদের এক এবং একমাত্র উৎস— তা সে পুঁজিবাদী সম্পদই হোক বা অ-পুঁজিবাদী সম্পদই হোক।

তাহলে আমরা কীভাবে দেখব বিষয়টাকে? —পুঁজিবাদে মজুরি-শ্রমই শ্রমজীবী মানুষের সাধারণ অবস্থা এবং কাঙালদশা এক বিশেষ অস্বাভাবিক অবস্থা (একমাত্র দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশেই যা ব্যাপক আকারে দেখতে পাওয়া যায়), নাকি পুঁজিবাদের শ্রমজীবী মানুষের সাধারণ রূপ হল কাঙাল আর তার বিশেষ রূপ হল মজুরি-শ্রমিক (এর থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলোই ব্যতিক্রম, যেখানে মজুরি-শ্রম কাঙালের সাধারণ অবস্থা)? বোঝাই যাচ্ছে, সামগ্রিকতাকে মার্কসের মৌলিক ধারণা ধরলে প্রথম অবস্থানে এসে পৌঁছব আর বাহ্যিকতাকে মার্কসের মৌলিক ধারণা ধরলে দ্বিতীয় অবস্থানে এসে পৌঁছব।

এই দুই অবস্থান থেকে, অন্তত উন্নয়নশীল দেশে, দারিদ্র্যের রাজনীতিতে মার্কসবাদীদের অংশগ্রহণও দুরকম হবে। প্রথম অবস্থানে দাঁড়ালে রাজনীতিটা হবে এরকম: পুঁজির ভেতরে, অর্থাৎ মজুরি-শ্রমিকদের নিয়ে শ্রেণী-সংগ্রাম আর পুঁজির বাইরে,কাঙাল জনগণ নিয়ে রাষ্ট্রকে লক্ষ্য করে জীবন-জীবিকার অধিকারকে বা মানবাধিকারকে ভিত্তি করে আন্দোলন। এক্ষেত্রে শ্রমজীবী জনগণের এই কৃত্রিম বিভাজনটি মেনে নিয়ে এই দুটি অংশকে ঘিরে রাজনীতির মধ্যে চরিত্রগত পার্থক্য আনা হয়। একদিকে, শ্রমিকের উৎপাদিত সম্পদের ওপর একমাত্র শ্রমিকেরই (কোন অংশেই মালিকের নয়) দাবির ন্যায্যতাকে মূল রাজনৈতিক স্লোগান করে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে শ্রেণীসংগ্রাম চালিত হয়। পাশাপাশি কাঙাল জনগণের জন্য বিভিন্ন সামাজিক অধিকার ভিত্তিক সুরক্ষাব্যবস্থার দাবিকে মূল রাজনৈতিক স্লোগান করে লিবেরাল বুর্জোয়া আদর্শে আন্দোলন চালিত হয়।

এক্ষেত্রে কাঙালকে সম্পদের উৎস হিসেবে না দেখে, সুরক্ষা প্রার্থী, অসহায় নগ্ন জীবনের প্রতিরূপ হিসেবে দেখা হচ্ছে (আমি সম্পদ বলতে পুঁজিবাদী সম্পদের কথাও বলছি না, প্রাচুর্যের ইঙ্গিতও দিচ্ছি না, সমাজবদ্ধ জীবনকে সুনিশ্চিত করার জন্য যে সম্পদের প্রয়োজন তার কথা বলছি, যদিও কাঙাল মজুরি-শ্রমিক রূপে পুঁজিবাদী সম্পদও সৃষ্টি করে)। পুঁজি এই ধরনের রাজনীতিতে নিজের অনুকূলে খুব সহজেই টেনে আনতে পারছে। পুঁজি এই দ্বৈত রাজনীতির একটিকে (লিবেরাল বুর্জোয়া অংশটিকে) ব্যবহার ক'রে দ্বিতীয়টিকে (সমাজতান্ত্রিক অংশটিকে) অনৈতিক বলে উপস্থাপন করে, কারণ সে সমাজের সামনে এই বক্তব্য হাজির করে যে কাঙালকে রক্ষা করা আধুনিক রাষ্ট্রের ধর্ম, আর সেই কাজ করতে গেলে পুঁজিকে শক্তিশালী বা সম্প্রসারিত করতে হবে, কারণ তার-ই সৃষ্ট সম্পদের সাহায্যে কাঙালের জীবনরক্ষা হয়। ঠিক এই কারণেই পুঁজিবাদী সমাজে অধিকার-ভিত্তিক আন্দোলনের এত রমরমা। মার্কসবাদীদের এই দ্বৈত রাজনীতির নিট ফল হলো যে সমাজে তারা চিহ্নিত হলো এক সুবিধাকারী চক্রান্তকারী দল হিসেবে যারা পুঁজিবাদের বিরোধিতা করে কারণ তারা আসলে দারিদ্র্যকে টিকিয়ে রাখতে চায় নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে।

পুঁজির এই তীব্র রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া অনেক সময়েই মার্কসবাদী দলগুলোকে এমনই সংশয়িত করে তোলে যে সে জ্ঞানত বা অজ্ঞানত পুঁজির কাছে আত্মসমর্পণ করে। এর শিকার কমবেশি সব মার্কসবাদী দলই। সেই কারণেই যেসব জায়গায় মার্কসবাদী আন্দোলন শক্তিশালী সেসব জায়গা ছেড়ে পুঁজিপতিরা অন্যত্র বিনিয়োগ সরিয়ে নিয়ে গেলে, মার্কসবাদীরা বিপন্ন বোধ করে। এই বিপন্নতা বোধের দুটি কারণ— মজুরি-শ্রমিক না থাকলে পুঁজি-বিরোধী শ্রেণীসংগ্রাম কী করে হবে? আবার, পুঁজি চলে গেলে উদ্বৃত্ত জনগণের যে বিপুল প্রসার ঘটবে, সরকার সেই ধাক্কা কীভাবে সামলাবে? এইটাই কি সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে সরকারে থাকা বামফ্রন্টের চিন্তা ছিল না? কী নিদারুণ পুঁজিকেন্দ্রিক চিন্তা, কী নিবিড়ভাবে পুঁজি-আশ্রয়ী এই রাজনীতি। অবশ্যই, এটা শুধু পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্টের রাজনৈতিক সমস্যা নয়, এটা সাধারণভাবেই মার্কসবাদী রাজনীতির সমস্যা।

দারিদ্র্যের রাজনীতিতে অন্য যে অবস্থান নেওয়া যেতে পারে সেটা এরকম : পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থার সম্পদ সৃষ্টির সামাজিক প্রক্রিয়াটি অবৈধ, কারণ তার ভিত্তি আদি(ম) সঞ্চয়ন— যা আদতে লুঠতরাজ, এবং জবরদখলের প্রক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। এই আদি(ম) সঞ্চয়নের ফলে উৎপাদনকারীদের স্বাধীন উৎপাদন এবং জীবনধারণের উপায়-উপকরণ থেকে বিযুক্ত করে কাঙালে পরিণত করা হয়। এই কাঙাল মানুষদের একটি অংশ মজুরি-শ্রমিকে পরিণত হয়; এদের জীবনধারণের নিশ্চয়তা মালিকের মুনাফার নিশ্চয়তার ওপর শর্তাধীন। কাঙাল মানুষদের অন্য অংশটি উদ্বৃত্ত জনগণ হিসেবে পুঁজির বহির্দেশে অ-পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থায় জীবনধারণ করে, বারবার আদি(ম) সঞ্চয়নের ধাক্কায় সেই অ-পুঁজিবাদী পরিসর ভেঙে পরে এবং পুনরায় গড়ে ওঠে। এই উদ্বৃত্ত জনগণ টিকে থাকার জন্য আপাতদৃষ্টিতে পুঁজির বদান্যতার ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ শ্রমজীবী মানুষ পুঁজির অন্তর্ভুক্ত হোক বা উদ্বৃত্ত হোক, তার জীবনধারণ পুঁজির অস্তিত্বের ওপর শর্তাধীন। যেহেতু পুঁজির অস্তিত্বের শর্ত হল সম্প্রসারণ, তাই পুঁজিবাদে সামগ্রিকভাবে শ্রমজীবী মানুষ বেঁচে থাকতে পারে একমাত্র যদি সে পুঁজিকে বাড়তে সাহায্য করে (শ্রমজীবী মানুষের সম্মিলিত প্রয়াসের ফল আর্থিক বৃদ্ধির হারের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে জনগণের সামনে পেশ করা হয়)। কিন্তু যেহেতু জীবনের পুনরুৎপাদন কোনও কিছুর শর্তাধীন হতে পারে না, তাই পুঁজিবাদের কোনও সামাজিক ন্যায্যতা নেই।

শোষিত শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির পথ কারখানার দেওয়ালের বাইরে, ভেতরে নয়। পুঁজির বহির্দেশের সঙ্গে পুঁজির দ্বন্দ্বই মূল দ্বন্দ্ব, মজুরি-শ্রমিকের সঙ্গে মালিকের দ্বন্দ্ব নয়। এই সিদ্ধান্তে এসে আমরা পৌছতে বাধ্য যদি শ্রমের বাহ্যিকতাকে আমরা মার্ক্সের মৌলিক তাত্ত্বিক ধারণা মেনে নিই। যে আদি(ম) সঞ্চয়নের ওপর ভিত্তি করে পুঁজির অভ্যন্তরে সম্পদ সৃষ্টি হয়, তাকে প্রতিরোধ করাটাই পুঁজি-বিরোধী আন্দোলনের মূল হাতিয়ার। সামগ্রিকভাবে শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি পুঁজির বহির্দেশের সমৃদ্ধিতে, যাতে করে পুঁজির বাইরে শ্রমশক্তির বিকল্প বাস্তবতা শ্রমিকের আকাঙ্ক্ষার বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। পুঁজির সম্প্রসারণের পথ রুদ্ধ করা শুধু নয়, অ-পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থার সম্প্রসারণই আসল লক্ষ্য হওয়া উচিত, যা হতে পারে একমাত্র উৎপাদনের উপায়-উপকরণের আরও বেশি বেশি করে পুঁজির গ্রাস থেকে মুক্ত করার মধ্যে দিয়ে। কল্যাণ সান্যালের আলোচনায় এই ধরনের একটা রাজনীতির আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে এই বিষয়ে ওনার আলোচনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও অবিকশিত।

এই নির্দিষ্ট রাজনৈতিক অবস্থান নিলে পুঁজির অভ্যন্তরে শ্রমিকশ্রেণীর (অর্থাৎ, পুঁজির অভ্যন্তরে শোষিত মজুরি-শ্রমিকদের) রাজনীতির চরিত্র বদলাতে বাধ্য; শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতি আরও বেশি বহির্মুখী হতে বাধ্য। শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিবাদ-বিরোধী সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবে এবং বাকি শ্রমজীবী মানুষ শ্রমিকশ্রেণীর পিছনে এসে দাঁড়াবে এই মার্কসবাদী রাজনৈতিক সরলীকরণও আর থাকবে না। উলটে বলা যেতে পারে, শ্রমিকশ্রেণী বৃহত্তর শ্রমজীবী মানুষের পিছনে এসে দাঁড়াবে, আদি(ম) সঞ্চয়নের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন সেই আন্দোলনে তারা সক্রিয় অংশ নেবে, যেটা আজকে মার্কসবাদীদের দ্বারা সংগঠিত শ্রমিক রাজনীতিতে সাধারণভাবে অনুপস্থিত। এটা মনে রাখতে হবে, পুঁজিবাদী সম্পদ সৃষ্টির প্রক্রিয়া যদি গোড়াতেই অবৈধ এবং সামাজিক ভাবে অন্যায্য হয় (যা বহিষ্কৃত জনগণের চোখে অনেক পরিষ্কারভাবে ধরা পরে), তাহলে সেই সম্পদের বন্টনকে কেন্দ্র করে যে রাজনীতি (ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন) বা সেই সম্পদের ওপর শ্রমিকশ্রেণীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বা অধিকার কায়েমের যে রাজনীতি (সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন) তা পুঁজির অন্ধকার ইতিহাস থেকে মুক্ত নয়। তাই মার্কসবাদীদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে মজুর-শ্রমিকদের নিজস্ব ইতিহাসকে সামগ্রিক শ্রমজীবী মানুষের বৃহত্তর ইতিহাসের অংশ হিসেবে বোঝা এবং শ্রমিক আন্দোলনকে পুঁজির এই কলঙ্কিত ইতিহাস থেকে কীভাবে রাজনৈতিক ভাবে বিচ্ছিন্ন করা যায় সেটা ভাবা।

এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্যে একটাই। আদি(ম) সঞ্চয়নের নতুন ধারণা থেকে পুঁজিবাদী সমাজে দারিদ্র্যের এক সাধারণ তত্ত্বে এসে পৌঁছনো যায়। এই সাধারণ তত্ত্বের চর্চা মার্কসবাদীদের দারিদ্র্যের লিবেরাল বুর্জোয়া চর্চা থেকে মুক্ত করতে পারে। সেই চর্চা চালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রবন্ধটি লেখা।

তথ্যসূত্র

David Harvey, *The New Imperialism*, New York, Oxford University Press, 2003.

Enrique Dussel, *Towards an Unknown Marx: A commentary on the manuscripts of 1861-63*, Routledge, 2002.

Kalyan Sanyal, *Rethinking Capitalist Development: Primitive Accumulation, Governmentality and Post-Colonial Capitalism*, Routledge, 2014.

Karl Marx, *Grundrisse*, Penguin, 1993.

Karl Marx, *Capital,* Vol I, LeftWord Books, 2010

Karl Polanyi, *The Great Transformation*. Boston, Beacon Press,1944.

Rajesh Bhattacharya, *Capitalism in Post-Colonial India: Primative Accumulation Under Dirigiste and Laissez Faire Regimes*, PhD Dissertation, University of Massachusetts, Amherst, 2010.

ধনতন্ত্র : ফিরে দেখা

ক্যাপিটাল-এর ভিন্ন পাঠ

প্রণব কান্তি বসু

বহু যুগ আগে, ৮০-এর দশকের গোড়ায়, *অনীক* পত্রিকার পাতায়, অজিত চৌধুরীর সঙ্গে মার্কসবাদের সূত্র নিয়ে আমার একটা বিতর্ক হয়।* অজিত চৌধুরীর বক্তব্য ছিল মার্কসবাদী চিন্তা শ্রমিক শ্রেণীর প্রাত্যহিক জীবন আর তার সংগ্রামের অভিজ্ঞতা প্রসূত বা প্রভাবিত নয়। এই দর্শন প্রসব বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী ছাড়া সম্ভব ছিল না। আমার যত দূর মনে পড়ে যুক্তির সমর্থনে তিনি বিশেষ ভাবে লেনিনের *What is to be Done* আর *Three Sources and Three Components of Marxism* উদ্ধৃত করেন। আমার বক্তব্য ছিলো মানুষের সংগ্রামের অভিজ্ঞতা এই চিন্তার মৌলিক উৎস। অভিজ্ঞতা মার্কসবাদী ধারাকে পরিপুষ্ট করে। আমার দুর্বল স্মৃতির ভিত্তিতে এই আলোচনার উল্লেখ করা উচিত কি না সে বিষয়ে আমার এখনও সংশয় আছে। তবু আজকে আবার ঐ বিষয় নিয়ে লিখতে বসে মনে হয় পুরনো প্রসঙ্গ উল্লেখ করা দরকার। আগ্রহী পাঠক যদি বিতর্কটি খুঁজে পান হয়তো কাজে আসতে পারে। অল্প কিছু ব্যতিক্রমী দেশ বাদ দিলে মার্কসবাদী পার্টিগুলি প্রথম ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী।

অনেক বছরের পঠন-পাঠন, বন্ধু-গবেষকদের সঙ্গে আলোচনা, নতুন নানা তত্ত্বের আবির্ভাব, সব মিলে আমার অবস্থানের কিছু পরিমার্জন, সম্পূরণ ঘটেছে। একমাত্রিকতার ধার কমেছে। সাধারণ ভাবে তাত্ত্বিক বিতর্কগুলি নতুন ভাবনা, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, দর্শনের উদয়ের ফলে সমৃদ্ধ হয়। উত্তর-আধুনিকতা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করেছে। অপর শুধু একের পরিপূরক নয়; একও অপরের পরিপূরক— এই চেতনা এসেছে। পুঁজিবাদের (দ্বান্দ্বিক) যুক্তিসর্বস্ব আখ্যান এবং *ক্যাপিটাল*-এ পুঁজিবাদের ঐতিহাসিক বিবরণ, একে অপরের পরিপূরক, প্রজনক। ঐতিহাসিক বিবরণ যৌক্তিক বিশ্লেষণের ফাঁক ভরাট করে; যৌক্তিক বিশ্লেষণ ঐতিহাসিক বিবরণের দিক নির্দেশ করে, একটি বর্গ (যেমন একটি শব্দ) অর্থবহ হয় অপর বর্গের (অপর শব্দ) সঙ্গে পার্থক্যে, তাই একের অর্থ অপরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে, অপরের অর্থ একের সঙ্গে। উত্তর-আধুনিক চিন্তনে বিশুদ্ধতা অবান্তর। সুতরাং বিশুদ্ধ দ্বন্দ্বতত্ত্ব বলে কিছু হয় না, যেমন হয় না বিশুদ্ধ ইতিহাস।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী অবস্থান উপস্থাপন করছি মার্কসের *ক্যাপিটাল* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের পাঠের মধ্যে দিয়ে। এর সঙ্গে অবশ্য অবিচ্ছেদ্য প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় ভাগ এবং দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম ভাগ। *ক্যাপিটাল*-এর যৌক্তিক (দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী) পাঠ সম্ভবত এই প্রস্তাব সমর্থন করে যে মার্কসবাদ বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর চর্চার ফসল। কিন্তু, এই পাঠের যুক্তিতে কতগুলি ফাঁক থাকে যা ভরাট হয় *ক্যাপিটাল*-এর অন্যান্য অংশে আলোচিত বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সংঘর্ষের ইতিহাস দিয়ে। এই হিংসা নিছক তথাকথিত দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিতে অধরা থেকে যায়। তাই হিংসার অভিজ্ঞতা বা ইতিহাস দিয়ে যুক্তিগত (বা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী) বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ বা পরিমার্জিত করা একান্ত প্রয়োজন। এই ইতিহাস মার্কস দেখেছেন আন্দোলনের সংগঠনের চোখ দিয়ে। এ পর্যন্ত আমার অবস্থান অপরিবর্তিত। যা বলা হয়নি তা হল ইতিহাস যেমন পুঁজিবাদের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী চিত্রণের ফাঁক ভরাট করেছে, অন্য দিকে কোন ঐতিহাসিক হিংসার ঘটনা পুঁজিবাদের মার্কসীয় আখ্যানে ঠাঁই পাবে তা নির্দিষ্ট হয়েছে যৌক্তিক কাহিনীর অপূর্ণতা দিয়ে। সংগঠক মার্কস শ্রমিকদের যেকোনো অনির্দিষ্ট আন্দোলনের সংগঠক ছিলেন না— তিনি সাম্যবাদী সমাজ গঠনের পক্ষে আন্দোলনে সামিল ছিলেন। আর সাম্যবাদ কাকে বলে তার একটা বিশেষ ধারণা মার্কস প্রস্তাব করেছিলেন তার তাত্ত্বিক আলোচনার ভিত্তিতেই। উদ্বৃত্ত শ্রম, উদ্বৃত্ত শ্রম মূল্য, শোষণ, ইত্যাদি বর্গ সংজ্ঞায়িত হয় *ক্যাপিটাল*-এর তাত্ত্বিক আলোচনায়। এবং এই ধারণাগুলি প্রয়োগ করেই মার্কস শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ কল্পনা করেন। সমাজতন্ত্রের ধারণার স্রষ্টা মার্কস নন। শিল্প বিপ্লবের পরবর্তী পর্যায়ে শ্রমিক শ্রেণীর আর্থিক এবং সামাজিক বিপর্যয়ের ফলে নানা প্রতিবাদী আন্দোলন সংগঠিত হয়। অনেক আন্দোলনকারী-তাত্ত্বিক বিকল্প সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেন। এই মতগুলি 'সমাজতন্ত্র' ধারণাটির নানা বিস্তার। সমাজতন্ত্রের অন্যান্য চিন্তকদের সঙ্গে মার্কসের মৌলিক তফাৎ : মার্কসের তাত্ত্বিক প্রস্তাবে 'প্রমাণ' হয় যে আর্থিক বৈষম্যের মূল, উৎপাদন ব্যবস্থার অভ্যন্তরে অবস্থিত; অন্যান্য সমাজতন্ত্র-বাদীরা সাধারণত উৎপন্ন বণ্টনের ওপর জোর দিয়েছেন। তাই সংগঠক মার্কসের উদ্দেশ্য ছিল উৎপাদন ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন। ফলে সংগঠক মার্কস আর তাত্ত্বিক, বুদ্ধিজীবী মার্কসের মধ্যে একটা নিবিড় যোগ আছে।

রচনার প্রথম ভাগে *ক্যাপিটাল, প্রথম খণ্ড* থেকে আমরা পুঁজিবাদের যৌক্তিক কাঠামো নির্মাণ করব। দ্বিতীয় ভাগে এই যৌক্তিক পাঠ মার্কস কীভাবে সংযোজন করেছেন তার

* *অনীক*, মার্চ-এপ্রিল ১৯৮৪ সংখ্যায় বেরোয় অজিত চৌধুরীর প্রবন্ধ, এক লেনিনবাদীর ক্যাপিট্যাল পাঠ। সেটা নিয়ে একটি বিতর্ক হয়। বিতর্কে অংশ নেন বিনয় পাঠক, রতন খাসনবিশ, প্রণব বসু ও অজিত চৌধুরী। *অনীক*, আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

আলোচনা করব। তৃতীয় ভাগে রাজনৈতিক চর্চার ক্ষেত্রে দুটি পৃথক পাঠের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করব। গোড়াতেই পাঠককে সতর্ক করা ভাল যে দুটি পাঠের মধ্যে আমার দুর্বলতা আছে ঐতিহাসিক পাঠের প্রতি। এই দুর্বলতা হয়তো রচনার ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে যা অভিপ্রেত নয় কারণ তা আমার বর্তমান অবস্থানের বিরোধী।

১। *ক্যাপিটাল*-এর বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক পাঠ : পুঁজিবাদের যৌক্তিক বৃত্তান্ত

ক্যাপিটাল (প্রথম খণ্ড)-এ মার্কস পণ্য বৃত্তের (commodity circuits) ক্রমবিবর্তনের মধ্যে দিয়ে পুঁজিবাদের যৌক্তিক বিকাশ (দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অনুসরণ করে) ব্যাখ্যা করেছেন। এই ব্যাখ্যার মুখ্য উদ্দেশ্য : তৎকালীন প্রচলিত অর্থনীতির মূল ধারায় (ক্লাসিকাল পলিটিকাল ইকনমি) প্রস্তাবিত মুনাফার উৎস সংক্রান্ত বক্তব্য খণ্ডন। প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতির বক্তব্য ছিল যে মজুরি আর মুনাফার উৎসে মূলগত কোন ফারাক নেই। উভয়েরই উৎস ত্যাগ : মজুরির উৎস পরিশ্রম বা অবসর ভোগ থেকে বিরত থেকে ত্যাগ স্বীকার; মুনাফার উৎস বর্তমান ভোগ থেকে বিরত থেকে সঞ্চয় করে ত্যাগ স্বীকার অথবা বিনিয়োগের ঝুঁকি বহনের ত্যাগ স্বীকার। মার্কসীয় অর্থনীতি এই প্রস্তাবের বিপরীতে প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে সামন্তপ্রভুর খাজনার মত মুনাফার উৎসও শ্রমজীবী মানুষের উৎপন্ন উদ্বৃত্ত। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতে এই উদ্বৃত্ত মূল্যের (surplus value) রূপ ধারণ করে যা প্রকাশ পায় মুনাফা হিসাবে।

১.১ প্রথম বিনিময় বৃত্ত : পণ্য বিনিময় (C-C)

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী পথ অনুসরণ করে *ক্যাপিটাল* গ্রন্থে পুঁজিবাদের বিবর্তনের বিবরণ গ্রথিত হয়েছে বিমূর্ত শ্রম মূল্যের (Abstract Labour Value) আত্মবিকাশের কাহিনী রূপে। আলোচনার সূচনা অর্থের মধ্যস্থতা ছাড়া বিনিময় ব্যবস্থা থেকে। এই ব্যবস্থায় যারা পরিশ্রম করে উৎপাদন করে তারাই উৎপাদন সামগ্রীর মালিক। বিমূর্ত শ্রম-মূল্যকেই মার্কসীয় পরিভাষায় 'মূল্য' (value) বলা হয়। ধরা যাক একজন ছুতোর একটি টেবিল একজন তাঁতির সঙ্গে বিনিময় করল দুটি জামার পরিবর্তে। এই বিনিময় ঘটল কেন? ছুতোর যে টেবিলটি বিক্রি করল সে টেবিলটির নিশ্চয় তার কাছে কোন ব্যবহারিক মূল্য (use value) ছিল না। সে টেবিলটি প্রস্তুত করেছে বিক্রি করারই উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ, তার কাছে টেবিলটির শুধু বিনিময় মূল্য (exchange value) আছে। একই রকম ভাবে তাঁতির কাছে জামার বিনিময় মূল্য আছে, ব্যবহারিক মূল্য নেই। এই অর্থনীতিতে সামাজিক শ্রম বিভাজন উপস্থিত: কেউ এ বস্তু উৎপাদন করে, কেউ ও বস্তু। কেউ উৎপাদন বা ভোগের বিচারে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়: নিজের যা প্রয়োজন তার সবটা নিজে প্রস্তুত করে না; নিজে যা উৎপাদন করে তার পুরোটা নিজে ভোগ করে না। ফলে এখানে অর্থনৈতিক সমন্বয়ের প্রয়োজন। তবে এই সমন্বয় বিনিময়ের মাধ্যমেই হতে হবে এমন নয়। জনগোষ্ঠীতে যেমন সবাই সব কিছু উৎপাদন করে না কিন্তু গোষ্ঠী সামগ্রিকভাবে সমস্ত উৎপন্নের মালিক। গোষ্ঠীর নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের মধ্যে সমগ্র উৎপন্ন বণ্টন হয়। তাই সামাজিক শ্রম বিভাজন বিনিময়ের জন্য যথেষ্ট নয়। উৎপন্নের ওপর ব্যক্তি-মালিকানাও প্রয়োজন। এই প্রস্তাবটির যাথার্থ্য বোঝা যায় বিনিময়ের সংজ্ঞা থেকে। ছুতোর আর তাঁতির মধ্যে কী ঘটল? ছুতোর আর তাঁতি পরস্পরের মধ্যে টেবিলের আর জামার মালিকানা হস্তান্তর করল। ছুতোর ছিল টেবিলের মালিক আর তাঁতি ছিল জামার মালিক। বিনিময়ের শেষে ছুতোর হলো জামার মালিক আর তাঁতি হল টেবিলের মালিক।

কিন্তু বিনিময় ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে অর্থনৈতিক সমন্বয় কী ভাবে ঘটে? (বিমূর্ত শ্রম) মূল্যের নিয়ম অনুসারে বিনিময়ের ফলে। নিয়মটা বিশদ ব্যাখ্যার দাবি রাখে। সমস্ত পণ্যের তিনটি গুণ থাকে: তাদের বিনিময় মূল্য বা দাম থাকে; তাদের উপযোগিতা বা ব্যবহারিক মূল্য থাকে; আর পণ্য মাত্রই মানুষের শ্রম প্রসূত। তাই দাম নিশ্চয় নির্ভর করে বস্তুর উপযোগিতা অথবা তার মধ্যে নিহিত শ্রমের ওপর। ব্যবহারিক মূল্য তুলনা করা যায় না। একটি টেবিলের উপযোগিতা আর একটি জামার উপযোগিতা তুলনা অসম্ভব। অর্থাৎ, 'কটা জামা একটি টেবিলের কাজ করবে?' এ প্রশ্নটি অবান্তর। তাই বিনিময় মূল্যের (যা অবশ্যই তুলনীয়, একটি টেবিল = ২ জামা) উৎস ব্যবহারিক মূল্য হতে পারে না। সুতরাং, তার উৎস বস্তুতে নিহিত শ্রম। কিন্তু বাস্তবে ছুতোর টেবিল তৈরি করতে কত ঘণ্টা কাজ করেছে আর তাঁতি জামা তৈরি করতে কত ঘণ্টা খেটেছে তার বিচারে তাদের আপেক্ষিক দাম (১ টেবিল = ২ জামা) ঠিক হয় না।

> যদি বস্তু থেকে তার ব্যবহারিক, বাস্তবিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ বাদ দেওয়া হয়, তা হলে কী পড়ে থাকে? তা হলে উৎপন্ন শুধু মাত্র শ্রম দ্বারা উৎপন্ন বস্তু, কোন বিশেষ বাস্তবিক পরিশ্রমের না, বরঞ্চ বিমূর্ত শ্রমের। (*ক্যাপিটাল*, খণ্ড ১, পৃ.১৩১)

বাস্তবিক পরিশ্রম তুলনীয় না হওয়ার দুটি কারণ আছে। প্রথমত, টেবিল আর জামার উপযোগিতা যেমন তুলনা করা যায় না, তেমন ছুতোরের শ্রম আর তাঁতির শ্রমও তুল্য নয়। দ্বিতীয়ত, এক এক ছুতোরের এক এক রকম দক্ষতা এবং কাজের গতি; একই কথা তাঁতিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাই দাম ঠিক হয় নিহিত বাস্তবিক শ্রম দিয়ে নয়, নিহিত বিমূর্ত অথবা বিশেষত্বহীন শ্রম দিয়ে, যা বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনের গুণ রহিত, বিশেষ দক্ষতা রহিত। বিমূর্ত শ্রমের একটাই বিশেষত্ব আছে; এই শ্রম ব্যক্তিগত সম্পত্তি উৎপাদন করে। এই শ্রম পরিমাপ

করা যায় না কারণ তা নির্গুণ, পণ্যের অন্তর্নিহিত সত্য বা সারসত্ত্ব (essence)। তার প্রকাশ— দাম— থেকে তা অনুমান করা যায়। সামাজিক চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনকারী শ্রমের মূল্যায়নে তারতম্য পণ্যের দামের ভিত্তিতে সমান করা হয়। কারখানা শ্রমিকের দক্ষতার বা তার সামাজিক মূল্যায়নে তফাৎ মজুরির পার্থক্য দিয়ে সমান করা হয়। (অবশ্য, আপাতত আমরা যে উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি তাতে উৎপাদনকারী শ্রমিক নয়, স্ব-নিযুক্ত। তাই তার মজুরি হয় না। এ ক্ষেত্রে একই কাজে নিযুক্ত, একই দক্ষতা সম্পন্ন শ্রমিকের মজুরি থেকে স্ব-নিযুক্ত ব্যক্তির পারিশ্রমিক আরোপ (impute) করা যেতে পারে। আপনি যদি ধর্মে বিশ্বাস করেন তা হলে একটা সহজ উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বোঝানো যায়। ভগবান সমস্ত বস্তু আর প্রাণীর নিহিত সত্য। ভগবানকে দেখা যায় না, কিন্তু ধার্মিক তার প্রকাশ— সমগ্র সৃষ্টির— মধ্যেই ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করে।

যেহেতু (বিমূর্ত শ্রম) মূল্য পৃথক ভাবে পরিমাপ করা যায় না, তা দাম থেকেই অনুমান করা সম্ভব মাত্র, তাই মূল্য প্রকাশ করা হয় টাকায়, শ্রম-ঘণ্টায় নয়। ধরা যাক একটি টেবিল উৎপাদনে একটি শ্রম দিবস অর্থাৎ ১০ ঘণ্টা শ্রম লাগে এবং তা বিক্রি হয় ৪০০ টাকায়। এ ক্ষেত্রে টেবিলটির মূল্য ১০ ঘণ্টা নয়, ৪০০ টাকার সমানুপাতিক। এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ সাপেক্ষ নয়। এই সিদ্ধান্ত মূল্যের সংজ্ঞায় নিহিত।

ভ্যালু বা মূল্যতত্ত্বের ব্যাখ্যা সহজ করার জন্য আমরা বাস্তব শ্রম আর বিমূর্ত শ্রমের মধ্যে পার্থক্য ভুলে যাচ্ছি। তা হলে কোন বস্তু নির্মাণে যতটা শ্রম বাস্তবে লাগে তার মূল্য তত ঘণ্টা শ্রমের সমানুপাতিক। ধরা যাক যে একদিনের শ্রম দিয়ে ছুতোর একটি টেবিল বানায় আর তাঁতি দুটি জামা বানায়। ধরা যাক উভয়ই দিনে ১০ ঘণ্টা কাজ করে। মার্কসের তত্ত্ব অনুসারে ১ টেবিলের বা দুটি জামার মূল্য ১০ ঘণ্টা শ্রমের সমতুল্য। ফলে ১ টেবিল = ২ জামা। এখন যদি এমন হয় যে সামাজিক শ্রম বণ্টন সঠিক হয় নি: প্রয়োজনের অতিরিক্ত শ্রম টেবিল তৈরিতে নিযুক্ত হয়েছে। অতিরিক্ত টেবিল উৎপাদন হওয়ার ফলে টেবিলের আপেক্ষিক মূল্যের থেকে ছুতোর কম আপেক্ষিক দাম পাবে। ধরা যাক সে একটা টেবিলের বিনিময়ে মাত্র একটি জামা পেল। তাহলে যে ছুতোর জামা চায় সে টেবিল বানিয়ে তার বিনিময় জামা আর কিনবে না কারণ একটি দিনের শ্রম দিয়ে সে দুটি জামা তৈরি করতে পারে কিন্তু একদিনের শ্রম দিয়ে সে যদি টেবিল তৈরি করে বাজারে তার বিনিময় জামা কেনে তা হলে সে মাত্র একটি জামা পায়। মনে রাখতে হবে যে আমরা ধরে নিয়েছি যে শ্রমের কোন বৈশিষ্ট্য নেই। ফলে, ছুতোর চাইলে তাঁতির কাজ করতে পারে আবার তাঁতিও ছুতোরের কাজ করতে পারে।

সামাজিক শ্রমের পুনর্বণ্টনের ফলে টেবিলের যোগান কমে যায় আর জামার যোগান বাড়ে। ফলে টেবিলের আপেক্ষিক দাম বাড়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত না আপেক্ষিক দাম আপেক্ষিক মূল্যের সমান হচ্ছে (১ টেবিল = ২ জামা) ততক্ষণ পর্যন্ত সামাজিক শ্রমের পুনর্বণ্টন চলতে থাকে। তাই মূল্যের নিয়মের মধ্যে দিয়ে মানুষের কোন সামাজির সিদ্ধান্ত ছাড়া যথাযথ সামাজিক শ্রম বণ্টন ঘটে। একই কথা অবশ্য অ্যাডাম স্মিথ বলেছিলেন : বাজারের অদৃশ্য হাতের তত্ত্ব।

১.২ দ্বিতীয় বিনিময় বৃত্ত: অর্থের মাধ্যমে বিনিময় (C-M-C)

ছুতোর জামা চায় আর তাঁতি টেবিল। এটা নেহাতই আকস্মিক ঘটনা। তাঁতি যদি টেবিল না চাইত তা হলে জামার চাহিদা মেটাতে ছুতোরকে একের পর এক বিনিময় করে যেতে হত। হয়তো ১টা টেবিল দিয়ে সে হয়তো ১০ কেজি চাল কিনল, ১০ কেজি চাল দিয়ে আবার ১৫ কেজি গম কিনল, শেষে এক তাঁতিকে পেল যে ১৫ কেজি গম নিয়ে দুটি জামা দিতে রাজি হলো। এক তো বিনিময় প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হল; সঙ্গে অনেক আপেক্ষিক দাম নির্দিষ্ট হল : ১ টেবিল = ১০ কেজি চাল; ১০ কেজি চাল = ১৫ কেজি গম; ১৫ কেজি গম = ২ জামা।

পুঁজিবাদের ক্রম বিকাশের দ্বান্দ্বিক কাহিনীতে বিনিময়ের সমস্যা প্রশমনের জন্য অর্থের উদ্ভব। অর্থের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে সমস্ত পণ্যের দাম অর্থে পরিমাপ করা হয়। ছুতোর একটি টেবিল বিক্রি করে, ধরা যাক, ৮০০ টাকা পেল। আমাদের আগের আলোচনার থেকে বলা যায় যে দুটি জামারও দাম ৮০০ টাকা হবে। তাই ৮০০ টাকা দিয়ে দুটি জামা কিনল। তার সময়ের অপচয় কমল আর তাকে অনেক আপেক্ষিক দামও জানতে হল না: প্রত্যেকটি পণ্যের অর্থ মূল্য জানলেই যথেষ্ট। এটাকেই বলে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় উত্তরণ : বহুর থেকে এক। বহু আপেক্ষিক দাম ছিল, তারা এক বর্গে উত্তীর্ণ হল : অর্থ মূল্য। ১ টেবিল = ৮০০ টাকা; ১০ কেজি চাল = ৮০০ টাকা; ১৫ কেজি গম = ৮০০ টাকা; ২ জামা = ৮০০ টাকা।

শুধু অর্থের উদ্ভবেই কিন্তু ছুতোরের সমস্যার সমাধান হয় নি। আমরা ধরে নিয়েছি এর সঙ্গে বণিক সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটেছে। ছুতোর জানে আসবাবের ব্যবসাদার আর জামা-কাপড়ের দোকানি কোথায় আছে। তাই তার সময়ের অপচয় হয় না। আসবাবের দোকানদারকে সে টেবিল বিক্রি করে যে টাকা পেল তাই নিয়ে সে জামা-কাপড়ের ব্যবসাদারের থেকে জামা কিনল।

১.৩ বিনিময় ও উৎপাদন বৃত্ত : উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদন (M-C-M→M-C-M', M'>M)

অর্থ শুধু দামের মাপকাঠি নয় (যেমন কেজি শুধু ওজনের মাপকাঠি)। শুধু দামের মাপকাঠি হিসাবে অর্থের বাস্তবিক অস্তিত্ব নিষ্প্রয়োজন— যেমন কেজির বাস্তবিক কোন অস্তিত্ব নেই : নির্দিষ্ট বাটখারার ওজন ১ কেজি, ১০০ গ্রাম, ইত্যাদি।

কিন্তু অর্থ শুধু দামের মাপকাঠি নয়, বিনিময়ের মাধ্যমও। অর্থাৎ, টাকা দিয়ে জিনিস কেনা যায় অথবা জিনিস বিক্রি করে টাকা পাওয়া যায়; কেজি পাওয়াও যায় না দেওয়াও যায় না। তাই টাকার বাস্তবিক অস্তিত্ব আছে। আবার পণ্যের মত বিনিময় বৃত্তের সমাপ্তিতে ভোগে তার শেষ নয়। টেবিলটি ক্রেতা ব্যবহারের জন্য কেনে, জামাও তাই, কিন্তু টাকা আবার বিনিময়ের বৃত্তে প্রবেশ করে। বণিক বার বার বিনিময়ের বৃত্তে টাকা বিনিয়োগ করে। বস্তুত, অর্থের আবির্ভাব আর বণিক সম্প্রদায়ের জন্ম অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত। বিনিময় বৃত্তের অন্তে অর্থের শেষ হয় না। তাই এমন কোন অর্থনৈতিক কর্মীর দরকার যাদের কাছে অর্থই ঈপ্সিত। তারা বিনিময়ে অংশ নেয় বিনিময়ের মাধ্যমে অন্য বস্তু লাভের জন্য না। তারা বিনিময় শুরু করে অর্থ দিয়ে, আবার বিনিময়ের শেষে তারা অর্থই চায়। পণ্যের ক্রেতা-বিক্রেতা একটি পণ্য বিক্রি করে আর একটি পণ্য কিনতে চায়: দুটির ব্যবহারিক মূল্য ভিন্ন, উপরন্তু টেবিলের বিক্রেতাদের কাছে টেবিলের কোন ব্যবহারিক মূল্যই নেই, আছে শুধু বিনিময় মূল্য, কিন্তু তার কাছে জামার ব্যবহারিক মূল্য আছে। কিন্তু ব্যবসাদার বিনিময়ের বৃত্তে যে বস্তু নিয়ে প্রবেশ করে, একই বস্তু নিয়ে সে বৃত্ত থেকে প্রস্থান করে। গুণগত ভাবে পৃথক পণ্য পাওয়া যদি তার উদ্দেশ্য না হয়, তা হলে নিশ্চয় পরিমাণগত ভাবে বেশি পাওয়াই তার লক্ষ্য। অর্থাৎ, M-C-M নয় M-C-M', $M'>M$ এই উদ্বৃত্ত (M' বিয়োগ M) পুঁজিবাদী মুনাফা। আসবাবের ব্যবসাদার টেবিল কিনল ৮০০ টাকা দিয়ে আর বিক্রি করল ১০০০ টাকা নিয়ে। অথবা সে টেবিল কিনল ৭০০ টাকা দিয়ে আর বিক্রি করল ৮০০ টাকা নিয়ে। উভয় ক্ষেত্রেই বণিক যে পরিমাণ টাকা নিয়ে বিনিময় শুরু করছে, তার থেকে বেশি পরিমাণ অর্থ সে পাচ্ছে বিনিময় বৃত্তের সমাপ্তিতে। দুটি ক্ষেত্রেই কিন্তু অসম বিনিময় হচ্ছে। প্রথম ক্ষেত্রে ক্রেতা মূল্যের থেকে বেশি দাম দিচ্ছে (১০০০ > ৮০০), দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিক্রেতা মূল্যের থেকে কম দাম পাচ্ছে (৭০০ < ৮০০)। বনিক যে মূল্য বিনিয়োগ করেছিল, বৃত্ত শেষে তার হাতে অতিরিক্ত মূল্য আসে, কিন্তু বিনিময় প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সামগ্রিক ভাবে মূল্য বৃদ্ধি ঘটে না।

১.৪ বিনিময় ও উৎপাদন বৃত্ত : উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদন (M-C-C'-M'), $C'>C \rightarrow M'>M$

মার্কস সেই পুঁজিপতিদের উৎপাদনশীল পুঁজিপতি বলে চিহ্নিত করেছেন যাদের মুনাফার উৎস উদ্বৃত্ত শ্রমমূল্য উৎপাদন, অসম বিনিময় নয়। উৎপাদনশীল পুঁজিপতি অর্থ-পুঁজি (M) বিনিয়োগ করে পণ্য-পুঁজি (C) কেনে। উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে পণ্য-পুঁজি উৎপন্নে রূপান্তরিত হয়। উৎপন্নের মূল্য C' যা C-এর থেকে বেশি : $C'>C$, ফলে মূল্যানুপাতিক দামে উৎপন্ন বিক্রি হলে পুঁজিপতি বাজারে M' লাভ করে যা অর্থ-পুঁজির থেকে বেশি : $M'>M$, তাই C-এর মধ্যে এমন কোন পণ্য নিশ্চয় থাকে যা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহারের ফলে উৎপন্ন পণ্যে তার নিজস্ব মূল্যের অতিরিক্ত মূল্য (C' বিয়োগ C) যুক্ত হয়। এই উদ্বৃত্ত মূল্যই উৎপাদনশীল পুঁজিপতির মুনাফার উৎস।

এই বিশেষ গুণ সম্পন্ন পণ্য হলো শ্রমশক্তি। শ্রমশক্তি তার নিজস্ব মূল্যের অতিরিক্ত মূল্য উৎপন্নে যোগ করে। ব্যাখ্যার জন্য আমরা আবার ঐ সরলীকরণের আশ্রয় নিচ্ছি : প্রকৃত শ্রম আর বিমূর্ত শ্রম সমান। ফলে মূল্য (যা, আমরা আগেই দেখেছি, বিমূর্ত শ্রমের ক্ষেত্রে 'বাস্তব' অর্থনীতিতে টাকার অঙ্কে নির্দিষ্ট হয়, কারণ তা বাজারে বিভিন্ন দাম থেকে অনুমান করা যায় মাত্র) সময়ের মাপে পরিমাপ করা যায়। যে কোন পণ্যের মূল্য সেই পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত শ্রম-সময়। ধরা যাক, আলোচ্য অর্থনীতিতে সাধারণ ভাবে এক দিনে শ্রমিক ১০ ঘণ্টা কারখানায় কাজ করে। আরও ধরা যাক, তার এক দিন বাঁচা খাওয়ার জন্য যে সমস্ত পণ্য সমাজ জরুরি বলে মনে করে তা উৎপাদনে ৬ ঘণ্টা শ্রম লাগে (এই 'ধরে নেওয়া'-র আড়ালে যে বাস্তব কাহিনী আছে তার আলোচনা আমরা পরে করব)। একদিন কারখানায় কাজ করে, কারখানায় উৎপন্ন পণ্যের মূল্যে শ্রমিক ১০ ঘণ্টা যোগ করছে। এই দশ ঘণ্টা শ্রম শক্তির মূল্য ৬ ঘণ্টা। তা হলে ১০ - ৬ = ৪ ঘণ্টাই উদ্বৃত্ত মূল্য (C' বিয়োগ C)।

উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদন তখনই সম্ভব যখন যারা পরিশ্রম ক'রে উৎপাদন করে তাদের শ্রমশক্তি ছাড়া কোন উৎপাদনের উপকরণের ওপর মালিকানা থাকে না। ফলে তাদের শ্রম দিয়ে নিজস্ব যন্ত্রাদি ব্যবহার ক'রে কোনও পণ্য উৎপাদন ক'রে বাজারে বিক্রি করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, সরল পণ্য বিনিময় ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থায় যেমন করত ছুতোর বা তাঁতি। এখন তাদের হাতে প্রয়োজনীয় যন্ত্র নেই। তাই জীবন নির্বাহ করার জন্য তাদের মালিকানাধীন উৎপাদনের একমাত্র উপাদান, শ্রমশক্তি, বাজারে বিক্রি করতে তারা বাধ্য। কিন্তু এই উপাদানটির এমনই বৈশিষ্ট্য যে তার প্রয়োগ বা ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে যে মূল্য যুক্ত হয় (১০) তা তার নিজস্ব মূল্যের (৬) থেকে বেশি। এই উদ্বৃত্ত মূল্যই উৎপাদনশীল পুঁজির মুনাফার উৎস।

বাণিজ্যিক পুঁজিপতিও মুনাফা উপার্জন করে। তার উৎস হয় মূল্যের থেকে কম দামে পণ্য কেনা, অথবা বেশি মূল্যে বিক্রি করা। উৎপাদনশীল পুঁজিপতি কিন্তু সমমূল্যে কেনা-বেচা করেও মুনাফা অর্জন করছে। এই উদ্বৃত্ত মূল্য পুঁজির স্বয়ংক্রিয় সম্প্রসারণের উৎস। এই বিবরণে সরল পণ্য বিনিময় ভিত্তিক অর্থনীতি থেকে উৎপাদনশীল পুঁজির উদ্ভব যুক্তিসম্মত, অনিবার্য।

আর একটি মত

মুনাফার উৎস ব্যাখ্যাই ছিল তখনকার প্রচলিত অর্থনীতির মুখ্য সমালোচনা যা *ক্যাপিটাল*-এর যৌক্তিক পাঠে পাওয়া যায়। প্রচলিত অর্থনীতিতে মজুরি, মুনাফা, ভাড়া সবই সমগোত্রীয়

আয় হিসাবে দেখানো হতো : শ্রমিক মজুরি পায় কারণ সে পরিশ্রম করে অর্থাৎ এই অর্থে ক্ষতি স্বীকার করে; পুঁজিপতি মুনাফা আয় করে কারণ সে ভোগ থেকে বিরত থেকে ক্ষতি স্বীকার করে (এই তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয় যে পুঁজিপতি যা ভোগ করল না তাই সে বিনিয়োগ ক'রে উৎপাদন সচল রাখে) অথবা ব্যবসায় বিনিয়োগের ঝুঁকি নিয়ে ত্যাগ স্বীকার করে। বস্তুত এখনও প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতিতে (neoclassical) একই ভাবে সমস্ত বর্গের আয়ের সমান্তরাল ব্যাখ্যা করা হয়। অবশ্য ব্যাখ্যাগুলিতে নতুনত্ব এসেছে। আমাদের আলোচনায় দেখলাম যে মার্কসীয় ব্যাখ্যায় মুনাফা আর মজুরির উৎস সম্পূর্ণ ভিন্ন। শ্রমিক যে শ্রমশক্তি বিক্রি করে তার মূল্যই মজুরি। আর তার উদ্বৃত্ত মূল্যই মুনাফার উৎস। এর সঙ্গে পুঁজিপতির ত্যাগ স্বীকারের কোন সম্পর্ক নেই।

প্রচলিত অর্থনীতির এই সমালোচনা তথাকথিত দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রয়োগ করে রচিত। দ্বন্দ্বতত্ত্ব হেগেল নামে এক দার্শনিকের থেকে প্রাপ্ত। দর্শনের ক্ষেত্রে বলা হয় বস্তুবাদ মার্কসের অবদান : হেগেল ছিলেন ভাববাদী, মার্কসের দ্বন্দ্বতত্ত্বের ভিত্তি বস্তুবাদ। অর্থাৎ হেগেল তার যুক্তির যাত্রা শুরু করেছিলেন মস্তিষ্ক প্রসূত ধারণা থেকে, ইচ্ছা শক্তি থেকে, মার্কস আলোচনা শুরু করছেন বাস্তবিক জগত, পণ্যের থেকে।*

আমরা হেগেলের তত্ত্বের ব্যাখ্যায় যাব না। তবে মার্কসের যুক্তিতে দ্বন্দ্বতত্ত্বের প্রয়োগ একটু বোঝার চেষ্টা করব। বহু-র থেকে এক-এ যাত্রা দ্বন্দ্বতত্ত্বের একটি বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ বহু বস্তুর সারসত্তা, যুক্তি দিয়ে উদ্‌ঘাটন করে, তাদের একই বর্গে অন্বিত করা একটি দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া— বিশেষ থেকে সাধারণে যাত্রা। আমরা পণ্যের যাত্রার আলোচনায় দেখলাম সরল পণ্য বিনিময়ের অর্থনীতিতে বহু আপেক্ষিক দাম থাকে। বহু অন্বিত হয় এক অর্থমূল্যে— টাকার অঙ্কে দাম। এই যৌক্তিক পথ ধরেই অর্থের অনুপ্রবেশ। আবার টাকার অঙ্কে উৎপন্নের দাম, মজুরি, মুনাফা ইত্যাদি আপাত বিভিন্ন সূত্রে অর্জিত বিনিময় মূল্য নির্দিষ্ট হয়। পরের ধাপে দ্বান্দ্বিক যুক্তি দিয়ে 'সত্য' উদ্‌ঘাটন হলো যে বহু-র সারসত্তা এক, বিমূর্ত শ্রম-মূল্য। বহু অন্বিত হলো এক-এ, শ্রম-মূল্যে। সমস্ত পণ্য-মালিক বাজারে তাদের মালিকানাধীন পণ্য বিক্রি করে তার মূল্য পাচ্ছে আর শ্রমিকের উৎপন্ন উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করছে পুঁজিপতি।

কিন্তু তৎকালীন প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতির সমালোচনাই শুধু এই তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণের কারণ ছিল না। এই তাত্ত্বিক কাঠামো পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মৌলিক চরিত্র বোঝার জন্য নির্মিত। এবং এই জ্ঞান ভবিষ্যৎ শোষণহীন সমাজ কল্পনার জন্য মার্কসের কাছে জরুরি ছিল। আপাত দৃষ্টিতে (যা প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতিরও দৃষ্টিভঙ্গি) পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার ভিত্তি সমতা। মার্কস তত্ত্বগত ভাবে (বিমূর্ত শ্রম) মূল্য ব্যবস্থা রচনা করে দেখালেন যে আপাত সমতার আড়ালে রয়েছে শোষণ— উৎপাদনশীল পুঁজির দ্বারা উদ্বৃত্ত মূল্য শোষণ। প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতি শুধু বাজারে কেনা বেচায় দৃষ্টি আবদ্ধ রেখে এই শোষণ আড়াল করে।

কিন্তু পুঁজিবাদের এই ব্যাখ্যা অনেক মার্কসবাদী তাত্ত্বিক মানতে নারাজ (Althusser 2006, Spivak 1985, Read 2002) ইত্যাদি।)। তাঁদের মতে, বিশুদ্ধ যুক্তিগত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পুঁজিবাদ বা অন্য কোন ঐতিহাসিক পর্যায় বুঝবার প্রয়াস ভ্রান্ত। তাদের সাধারণ মত: বিশুদ্ধ যুক্তির পথ ধরে বিবর্তনের ব্যাখ্যা ভাববাদে দুষ্ট হতে বাধ্য। হেগেলীয় দ্বন্দ্বতত্ত্ব প্রয়োগ করলে সারবত্তা-বাদ (essentialism)-এর হাত ধরে যুক্তির কাঠামোতে ভাববাদ প্রবেশ করে। তাদের মতে, মূল্য-তত্ত্ব দিয়ে পুঁজিবাদের ব্যাখ্যায় এর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের সহজ ব্যাখ্যা অনুসরণ করেই এর নিদর্শন পাওয়া যায়: বিমূর্ত শ্রম একটি ধারণা মাত্র। এই তাত্ত্বিক ধারণার আত্মবিকাশের পথ ধরে পুঁজিবাদের বিকাশের ব্যাখ্যাকে একটি ভাববাদী প্রয়াস বলা যেতেই পারে। তবে, এটাও মনে রাখা দরকার যে *ক্যাপিটাল*-এর একটা ক্ষুদ্র অংশ জুড়ে তথাকথিত দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অনুসরণ করে পুঁজিবাদের যুক্তিনিষ্ঠ ব্যাখ্যা রয়েছে। প্রথম খণ্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ এবং দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম ভাগে মূল্য-তত্ত্বের ভিত্তিতে গ্রথিত পুঁজিবাদের ব্যাখ্যায় শুধু এই যুক্তির বিন্যাস উপস্থিত। এবং এর অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে মার্কস সচেতন ছিলেন। তাই *ক্যাপিটাল*-এর বাকি অংশ জুড়ে রয়েছে পুঁজিবাদের রক্তাক্ত ইতিহাস।

উত্তর-আধুনিকরা বলে যে বিশুদ্ধ যুক্তি বলে কিছু হয় না। সব সময় যুক্তির ফাঁক থাকে। প্রস্তাবটি যুক্তিনিষ্ঠ ভাবে প্রমাণ করা যাবে না, কারণ এদের বক্তব্যই এই যে যুক্তি সদা অসম্পূর্ণ। তাই এরা মূলত দার্শনিক বা ভাষাবিদদের সংলাপ বিশ্লেষণ করে প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি (!) খাড়া করে। পাঠক বুঝতেই পারছেন বিষয়টা কেমন প্যাঁচালো। সন্তর্পণে চলতে গিয়ে সেই পাঁকেই পা পড়ে গেল। সমস্যাটা এক প্রকার যা ভাষায় প্রকাশিতব্য নয়, তা ভাষায় ইঙ্গিত করার চেষ্টা। বিষয়টা নিয়ে আর তাত্ত্বিক আলোচনায় যাব না। তবে তাদেরই নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করে ওপরে বর্ণিত পুঁজিবাদের যুক্তিনিষ্ঠ ব্যাখ্যার ফাঁক খোঁজার চেষ্টা করব।

অবশ্য, এই উত্তর আধুনিক পাঠ— যার পোশাকি নাম

---

* দ্বন্দ্বতত্ত্বের এই সরল বিভাজন সাবেকি মার্কস চর্চার অঙ্গ। বস্তুত, তথাকথিত বস্তুবাদী বর্গ— যেমন পণ্য— চিন্তনের ফল। উপস্থাপনের পরম্পরা দেখলে অবশ্যই পণ্য আগে আসে পরে (বিমূর্ত শ্রম) মূল্য। কিন্তু মার্কসের বিশ্লেষণে পণ্যের ধারণা মূল্যের ভিত্তিতে গঠিত। এবং মূল্য সাদা চোখে দেখা কোন বস্তু নয়। আদতে দৃষ্টিভঙ্গি রহিত কোন দর্শনই সম্ভব নয়।

বিনির্মাণ (deconstruction)— মার্কস নিজেই করে গেছেন। *ক্যাপিটাল* গ্রন্থটিতে যেমন সারবস্তু-বাদের কৌশলী প্রয়োগ পাই আবার তার এই প্রয়োগের বিনির্মাণও পাই। আমি এমন দাবি করছি না যে মার্কস উত্তর-আধুনিক যুগের বার্তা নিয়ে এসেছিলেন। আমার ধারণা এই বৈপরীত্য মার্কসের দ্বৈত সত্তার পরিচয় বহন করে। একদিকে তাঁর বুদ্ধিজীবী সত্তা, অন্য দিকে শ্রমিক আন্দোলনের একজন সংগঠক। বুদ্ধিজীবী সত্তার পরিচয় পাই তাঁর মূল্য তত্ত্বের ভিত্তিতে পুঁজিবাদের কাঠামো নির্মাণে। শ্রমিক আন্দোলনের সংগঠকের পরিচয় *ক্যাপিটাল* গ্রন্থের বাকি অংশ জুড়ে রয়েছে— পুঁজিবাদের হিংসাত্মক বৃত্তান্তে। আবার এই রচনার প্রস্তাবনায় দেখেছি যে দুটি পাঠ যেমন পরস্পরের জনক, মার্কসের দুটি সত্তাও পরস্পরের পরিপূরক।

২। *ক্যাপিটাল*-এর অন্য পাঠ : পুঁজিবাদের বৃত্তান্ত

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী যুক্তি দিয়ে তত্ত্বের ভিত্তিতে রচিত পুঁজিবাদের জন্ম ও বিকাশের বিবরণে তিনটি অসম্পূর্ণতা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। আমরা দেখব *ক্যাপিটাল*-এর আখ্যানেই কী ভাবে যুক্তির নিস্তরঙ্গ প্রবাহ সম্পূরণ (supplement) হয়েছে হিংসার প্রবল কল্লোলে।

২.১ প্রথম সম্পূরণ :

সরল পণ্য উৎপাদনকারী অর্থনীতির জন্মবৃত্তান্ত

সামাজিক শ্রম বিভাজন যে অর্থ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য, সে অর্থ ব্যবস্থায় উৎপাদকদের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন। বস্তুত এমন কোন সামাজিক অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না যেখানে কোন রকম সামাজিক শ্রম বিভাজন ছিল না। এটাই স্বাভাবিক, কারণ এমন 'সমাজে' অর্থনৈতিক ভাবে সবাই স্বংসম্পূর্ণ। তাই এটা আদতে কোন সমাজই নয়।

সমন্বয় বিভিন্ন ভাবে সংগঠিত হতে পারে। জনগোষ্ঠীর কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। এখানে ব্যক্তি মালিকানার ধারণাই অনুপস্থিত। সমস্ত উৎপন্নের ওপর জনের সমস্ত সদস্যদের গোষ্ঠীগত অধিকার থাকে। উৎপন্ন বণ্টন হয় স্বীকৃত কোন সামাজিক নিয়মে। এ ছাড়া সমন্বয় হতে পারে সামন্তের আদেশ ক্রমে। এই সমস্ত ব্যবস্থা থেকে বিনিময় ভিত্তিক সমন্বয় বিশিষ্ট সমাজে বিবর্তন ঘটে নানা রক্তক্ষয়ী সংঘাতের মধ্যে দিয়ে। দ্বান্দ্বিক যুক্তি নির্ভর বিবর্তনের আখ্যানে এই হিংসার বিবরণ অনুপস্থিত। অনেক সংঘাতের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অধিকার ছাড়া বিনিময় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। অন্যান্য সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে এর জন্য প্রয়োজন গোষ্ঠী বা জন-সম্পত্তির অবলুপ্তি। প্রাথমিক ভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর গোষ্ঠীগত অধিকার কব্জা করে ধনী জমিদার শ্রেণী। এরা কোথাও প্রতিষ্ঠিত সামন্ত, কোথাও বা নব্য ভূস্বামী যারা ব্যবসা থেকে অর্থ উপার্জন করছে। যারাই হোক, এই প্রক্রিয়া প্রচণ্ড বল প্রয়োগের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয় এবং এতে রাষ্ট্র সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এই প্রক্রিয়া আদি সঞ্চয়ন (primitive accumulation)-এর অঙ্গ যার বর্ণনা *ক্যাপিটাল* গ্রন্থেই পাই। ব্যক্তিগত মালিকানা স্থাপনের প্রক্রিয়া এখনও জারি। খনিজ সম্পদ, লৌকিক জ্ঞান ভাণ্ডার কব্জা করার লড়াই বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যক্তিগত মালিকানার উদয় সামাজিক ইতিহাসের একটি তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্ত। এই মুহূর্তে সামাজিক ব্যবহারিক মূল্যের ধারণা অবলুপ্ত হয়। একই সঙ্গে পণ্য-আচ্ছন্নতার (commodity fetish) সামাজিক মানুষের মন গ্রাস করে। পণ্য-আচ্ছন্নতা ধারণা মার্কস ব্যাখ্যা করেছিলেন সরল পণ্য উৎপাদনকারী অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে। আমরা দেখলাম যে টেবিলের উৎপাদকের কাছে টেবিলের কোন ব্যবহারিক মূল্য নেই, আছে জামার উৎপাদকের কাছে। আবার তাঁতির কাছে জামার কোনও ব্যবহারিক মূল্য নেই, আছে ছুতোরের কাছে। তাই পণ্যময় দুনিয়ায় কোন সাধারণ বা সবার কাছে গ্রাহ্য ব্যবহারিক মূল্য হয় না। এটা নেহাতই একটি ব্যক্তিগত অনুভূতি। ফলে সামাজিক শ্রম বিভক্তিতে (সামাজিক) ব্যবহারিক মূল্যের কোন ভূমিকা থাকে না। ব্যবহারিক মূল্য ব্যক্তির অনুভূত পণ্যের মান, তাই সমাজের বাকি মানুষদের পণ্যের এই ব্যবহারিক মূল্য সম্বন্ধে অবগত করার ভাবনাটাই অবান্তর। সামাজিক শ্রম বিভিন্ন উৎপাদনের কাজের মধ্যে বণ্টন হয় বিনিময় ব্যবস্থার বিমূর্ত শ্রম মূল্যের নিয়মে— যা আমরা আগে ব্যাখ্যা করেছি। তাই সামাজিক শ্রম বিভাজন— যা এক প্রকার সামাজিক বা মানুষে-মানুষে সম্পর্ক— তা প্রতিপন্ন হয় পণ্যে-পণ্যে সম্পর্ক হিসাবে। একেই মার্কস পণ্য-আচ্ছন্নতা বলছেন। অর্থাৎ, মানুষে মানুষে সম্পর্ক মানুষের মনে প্রতিপন্ন হয় পণ্য-পণ্য সম্পর্ক রূপে। ফয়ারবাখ্ নামে এক দার্শনিকের ঈশ্বর-আচ্ছন্নতার ধারণার আদলে মার্কস তাঁর পণ্য-আচ্ছন্নতার ধারণা গঠন করেছিলেন। মানুষ তার স্বীয় গুণ বাইরে প্রক্ষেপ করে সর্বগুণ সম্পন্ন 'ঈশ্বর' সৃষ্টি করে। পরে তাকেই ভাগ্যের নিয়ামক রূপে মানুষ পূজা করে। অনুরূপ ভাবে মানুষ তার শ্রম দিয়ে পণ্য উৎপাদন করে। তার পর সে মনে ভাবে যে পণ্যে পণ্যে (মূল্য) সম্পর্ক সামাজিক শ্রম বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করে। তথাকথিত 'বাজারের নিয়ম' অলঙ্ঘ্য, এই এক প্রকার ধর্মান্ধতায় বামপন্থীরাও আবিষ্ট। তাই বামফ্রন্ট সরকার 'সেজ' প্রকল্প, জমি অধিগ্রহণ ইত্যাদি নীতি গ্রহণে এত আগ্রহী ছিল। মার্কসের এই ভাবনাটা আমরা প্রসারিত করে বলতে পারি, পণ্যময়তা মানুষের মন গ্রাস করে। অন্য সামাজিক ক্ষেত্রেও মানুষ পণ্য দাসত্ব স্বীকার করে : পড়শি, বন্ধু, পরিবার ইত্যাদি সম্পর্ক পণ্যের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে পর্যবসিত হয়। কে কতটা পণ্যের মালিক আর কে কতটা পণ্য উপার্জন করে তার ওপর তার সামাজিক মান্যতা নির্ভর করে। এই পণ্য মর্যাদাই হয়ে দাঁড়ায় সমস্ত 'সামাজিক সম্পর্ক'-র ভিত।

২.২ দ্বিতীয় সম্পূরণ : শ্রম শক্তির পণ্যকরণ

বাণিজ্যিক পুঁজি আর তেজারতি পুঁজি থেকে উৎপাদনশীল পুঁজিতে উত্তরণের শর্ত: শ্রম শক্তির পণ্যকরণ। শ্রম শক্তিই উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎস যার থেকে উৎপাদনশীল শ্রমের মুনাফা আসে। শ্রম শক্তির পণ্যকরণের একটি শর্ত হল এই যে, যে পরিশ্রম করে উৎপাদনের উপকরণের ওপর তার মালিকানা থাকে না। মালিকানা থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রক্রিয়া আদি সঞ্চয়ন (primitive accumulation) প্রক্রিয়ার অংশ। রাষ্ট্র এবং জমিদার বল প্রয়োগ করে কৃষককে জমি থেকে বিতাড়িত করে। যে চারণ ভূমি, বন সম্পদ, জলাশয়ের ওপর গ্রামবাসীর যৌথ মালিকানা ছিল সেগুলি বিত্তবান জমিদারের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপান্তর হয়। ক্ষুদ্র পারিবারিক শ্রম-নির্ভর শিল্প উৎপাদন প্রায়ই কৃষি কাজের সঙ্গে আংশিক ভাবে যুক্ত থাকে। কৃষি কাজ থেকে উচ্ছেদ হওয়ার ফলে গ্রামীণ ছুতোর-কামারও বাধ্য হয় তাদের পেশা ত্যাগ করতে। বণিকদের সম্মিলিত সাংগঠনিক শক্তির কাছে শহুরে কারিগর নতি স্বীকার করে মূল্যের থেকে কম দামে পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য হয়। ফলে এক দিকে কারিগরের দারিদ্র্য বাড়ে, অন্য দিকে বণিক সম্প্রদায়ের হাতে অর্থ পুঞ্জিত হয়। এক সময় বণিক-সুদখোর মহাজনের কাছে ভবিষ্যৎ উৎপন্ন বন্ধক রেখে কারিগর বাধ্য হয় কাঁচামাল কিনতে। তারা তাদের স্বাধীনতা হারায়। আরও পরে তাদের তাঁত, কুমোরের চাক ইত্যাদি দেনার দায়ে বিক্রি করতে হয়। উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা হারানোর এই গোটা কাহিনীর সঙ্গে ধনী সম্প্রদায়ের এবং রাষ্ট্রের বল প্রয়োগের ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে।

এই সন্ত্রাসের ইতিহাসের নানা বিস্তার মার্কস *ক্যাপিটাল* গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। আদি পুঁজি সঞ্চয়ন প্রক্রিয়া যে হেতু যুক্তি নির্ভর নয়, সে হেতু দেশ কালের তফাতে এর নানা প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এর মৌলিক চরিত্র হিংসাশ্রয়ী। মূল্য তত্ত্বের মসৃণ যাত্রার বিবরণের একটি বিরাট ফাঁক ভরাট করছে কৃষককে তার জমি থেকে বিচ্ছিন্ন করার হিংসাত্মক অভিযান।

২.৩ তৃতীয় সম্পূরণ : পরিবর্তনশীল বিনিয়োগ

অর্থ পুঁজি দিয়ে উৎপাদনশীল পুঁজিপতি পণ্য পুঁজি কেনে। এর একটা অংশকে মার্কস 'স্থির পুঁজি' বলছেন আর বাকি অংশকে 'পরিবর্তনশীল পুঁজি' বলছেন। কাঁচা মাল, জ্বালানি, অপচয় ইত্যাদি, স্থির পুঁজির অন্তর্গত। পরিবর্তনশীল পুঁজি হলো শ্রম শক্তি। স্থির পুঁজি উৎপন্নে কতটা মূল্য যোগ করবে তা আগে থেকেই স্থির করা হয়ে গেছে— এই সব উপকরণের মূল্য। এই অর্থেই পুঁজির এই অংশকে মার্কস 'স্থির পুঁজি' বলেছেন। উৎপন্ন পণ্যে নির্দিষ্ট 'পরিবর্তনশীল পুঁজি' দিয়ে কেনা শ্রম শক্তি কতটা মূল্য যোগ করবে তা আগে থেকে স্থির নয়। এই অর্থে পুঁজির এই অংশকে মার্কস 'পরিবর্তনশীল পুঁজি' এই আখ্যা দিয়েছেন।

পরিবর্তনশীল পুঁজি উৎপন্নে কতটা মূল্য যোগ করবে তা আগে থেকে নির্দিষ্ট না থাকার দুটি কারণ আছে। প্রথমত, পুঁজিপতিদের ভাষায় শ্রমিকের ফাঁকি দেওয়ার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে। মার্কসবাদীরা বলবেন, শ্রমিক যুক্তিসঙ্গত কারণে কারখানার কাজে কোন উৎসাহ বোধ করে না, তাই সে চেষ্টা করে শ্রম-সময়কে অবসর সময়ে রূপান্তর করতে। উৎসাহের অভাব কেন হয় মার্কস তা ব্যাখ্যা করেছেন। কারখানায় ঢোকার আগে শ্রমিক তার শ্রম-সময়ের মালিকানা কারখানার মালিককে দিয়ে দিয়েছে। মার্কসের ভাষায় কারখানায় নিযুক্ত শ্রম-সময় শ্রমিকের থেকে বিচ্ছিন্ন (alienated labour)। বুর্জোয়া সমাজে শ্রমিকও আত্মকেন্দ্রিক। যা তার সম্পত্তি নয় তাতে তার উৎসাহ বোধ করার কোন কারণ নেই। *ক্যাপিটাল*-এ মার্কস আরও ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে কারখানার শ্রমিকদের পরিশ্রম পশু শ্রমের মত। মানুষের শ্রম— যাতে সে আত্মপ্রকাশের আনন্দ পায়— আর কারখানা শ্রমিকের শ্রমে বিস্তর ফারাক। এই মতে, পশু বারংবার, প্রজন্মের পর প্রজন্ম, একই ভাবে একই জিনিস উৎপাদন করে। বাবুই পাখির বাসা বা মৌচাক দেখতে যতই সুন্দর হোক আদি কাল থেকে তার কোন পরিবর্তন নেই। কিন্তু, মানুষের বাসস্থানের যুগে যুগে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এর কারণ মানুষ বিমূর্ত চিন্তা আর পরিকল্পনা করতে পারে। অর্থাৎ, মানুষ প্রথমে একটি বাসস্থানের প্রয়োজন অনুভব করে। এর পর বাসস্থান নির্মাণের পুরনো অভিজ্ঞতা, ভৌগোলিক অবস্থান, হাতের কাছে কী কাঁচা মাল পাওয়া যায়, এই সব বিবেচনা করে সে বাসার একটি নকশা তৈরি করে, এবার এই পরিকল্পনা মতো সে তার বাসা নির্মাণ করে। এখন অনেকে বলে যে মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য সে ভাষায় চিন্তা করে। অর্থাৎ, 'বাস্তবকে' সে সাংকেতিক কাঠামোতে 'নির্মাণ' করতে পারে। এই প্রস্তাবের সঙ্গে মার্কসের বক্তব্যের কোন বিরোধ নেই। মানুষ পরিকল্পনা করতে পারে কারণ সে ভাষা বা অন্য সাংকেতিক মাধ্যম ব্যবহার করতে পারে। ফলে, মার্কসের ভাষায় মানুষ দুবার উৎপাদন করে: একবার তার মস্তিষ্কে পরিকল্পনায় আর একবার পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপান্তর ক'রে। পক্ষান্তরে, কারখানার শ্রমিক পরিকল্পনা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এই কাজ করে ম্যানেজার, ইঞ্জিনিয়ার এরা। শ্রমিক শুধু আজ্ঞাবাহী (না)মানুষ। তাই কারখানার কাজে তার মন থাকে না।

কারখানার কাজে উৎসাহের অভাব ছাড়াও শ্রম শক্তিতে বিনিয়োগকে পরিবর্তনশীল পুঁজি বলার আর একটা কারণ আছে। আমাদের উদাহরণে ফিরে যাচ্ছি। এক দিন বেঁচে বর্তে থাকার জন্য শ্রমিকের যা দরকার তা উৎপাদন করতে লাগে ৬ ঘণ্টার শ্রম। আমরা ধরেছিলাম যে শ্রমিক দৈনিক ১০ ঘণ্টা কারকানায় কাজ করে। কিন্তু এগুলি আমাদের ধারণা মাত্র (যা আমরা পাদটীকায় উল্লেখ করেছি)। এগুলি স্থির কিছু না। নানা ঘাত প্রতিঘাত, নানা সামাজিক ইতিহাস, নানা সংগ্রাম, জয়

পরাজয়ের পরিণতি। নানা সামাজিক-রাজনৈতিক কারণে কারখানায় দৈনিক কতক্ষণ কাজ করতে হবে এবং একদিন বেঁচে থাকার জন্য শ্রমিকের আবশ্যিক কী, দুটোই বদলায়। কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক।

পুঁজির এই অংশের 'পরিবর্তনশীলতার' পেছনে সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা আছে। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে কী ভাবে শিশু ও নারী শ্রমিক ইংরেজদের কারখানায় নিযুক্ত হয়, এবং তার সামাজিক প্রতিফলনের একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা *ক্যাপিটাল*-এর প্রথম খণ্ডের ১৫ অধ্যায়ে রয়েছে। শিল্প-বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে উৎপাদনের যান্ত্রিকীকরণের কারণে অনভিজ্ঞ শ্রমিক নিয়োগ সম্ভব হয়। উৎপাদনে পেশী শক্তির প্রয়োজনও সীমিত হয়। ফলে শিশু ও নারী শ্রমিক নিয়োগের সূচনা। যতদিন পুরুষ শ্রমিক একা কাজ করত, ততদিন কারখানায় একদিন কাজের বিনিময়ে শ্রমিককে এমন মজুরি দিতে হতো যাতে গোটা পরিবার একদিন বাঁচতে পারে। পরিবারের শিশু ও নারী সদস্যরা যখন কারখানায় নিযুক্ত হলো তখন পুরুষ শ্রমিকের একার মজুরিতে পরিবারের ভরণ-পোষণের সামাজিক দায় থেকে মালিক নিষ্কৃতি পেল। সুতরাং ১০ ঘণ্টার শ্রমের মূল্য ৬ ঘণ্টা থেকে কমে গেল। অন্য ভাবে বলা যায় পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থায় ৬ ঘণ্টা মূল্যের পরিবর্তনশীল পুঁজি (অর্থাৎ, শ্রমশক্তি) ১০ ঘণ্টার অতিরিক্ত মূল্য যোগ করতে সক্ষম হলো। তাই আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট মূল্যের পরিবর্তনশীল পুঁজি উৎপন্ন দ্রব্যে কতটা মূল্য যোগ করবে তা অনির্দিষ্ট হয়ে পড়ে। এ ছাড়া শ্রমিকদের সংঘবদ্ধতা বাড়লে মজুরি বাড়ে। ফলে একই পরিমাণ পরিবর্তনশীল পুঁজি দিয়ে আগের তুলনায় কম শ্রমশক্তি কেনা যায়। উৎপন্ন পণ্যে আগের তুলনায় কম মূল্য যোগ হয়। তাই পরিবর্তনশীল পুঁজি কতটা মূল্য যোগ করে তা কোনও যুক্তি দিয়ে ঠিক হয় না। তা অনেকাংশে স্থির হয় লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে, যা রক্তক্ষয়ীও হতে পারে, যেমন হয়েছিল হে মার্কেটে (যার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে মে দিবস উদযাপিত হয়)।

৩। রাজনৈতিক চর্চার প্রভাব

৩.১ পুঁজিবাদ

ক্যাপিটাল-এ পুঁজিবাদের দুটি আখ্যান পেলাম। এক : দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের যুক্তি পথ অনুসরণ করে— মূল্যের আত্ম বিবর্তনের শেষ ধাপ। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমস্ত উপকরণ ও উৎপন্ন পণ্যে রূপান্তরিত। সব পণ্যের সার সত্তা এক— (বিমূর্ত শ্রম) মূল্য। তাই সমস্ত পণ্যই এক বর্গভুক্ত। দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় আর উত্তরণ সম্ভব নয়। দুই : কতগুলি সংঘর্ষের মুহূর্ত থেকে পুঁজিবাদের প্রাথমিক উপাদান অথবা শর্তগুলি এবং এই প্রাথমিক উপাদানগুলির মিশ্রণেই পাই পুঁজিবাদের কাঠামো। প্রথম ব্যাখ্যাটি বেশি প্রচলিত, কারণ প্রভাবশালী কমিউনিস্ট পার্টিগুলি এই ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি মূলত (১৯৭৮ পরবর্তী) অ্যালথুসার ও তার অনুগামীদের লেখায় পাই। আমার এই পাঠ অ্যালথুসার-এর কয়েকটি রচনা দ্বারা অনুপ্রাণিত (Althusser, 2006 a & b)।

৩.২ রাজনৈতিক চর্চা

মার্কসবাদের দুটি পাঠ এবং উদ্ভুত পুঁজিবাদের দুটি ধারণার মধ্যে পার্থক্য রাজনৈতিক চর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম পাঠ 'বৈজ্ঞানিক যুক্তি' নির্ভর। বৈজ্ঞানিক দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের যুক্তি আবিষ্কার ও প্রয়োগের ফলে সমাজের 'সত্য' উদ্ঘাটিত হয়। এই বিশ্লেষণ অবশ্যই সবার করা সম্ভব নয়। এর জন্য বিশেষ জ্ঞান সম্পন্ন বুদ্ধিজীবী প্রয়োজন। এরাই পার্টির নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্য। এটাই লেনিন বলেছেন *What is to be done* এবং *Three Sources and Three Component Parts of Marxism* গ্রন্থদ্বয়ে।

একই তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির উল্টো পিঠে রয়েছে এক ধরনের ভবিতব্যবাদ : ইতিহাসের ধারা বৈজ্ঞানিকভাবে (দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ দ্বারা) পূর্ব নির্ধারিত। তাই সমাজ পরিবর্তনের পরিকল্পনা, প্রচার, বৈপ্লবিক সংগঠন তৈরির কাজ নিষ্প্রয়োজন। এই ভাবনা থেকেই ইউরো-কমিউনিজমের আবির্ভাব। আমাদের বাম সরকারের ভাবনা চিন্তার ওপরও এর প্রভাব ছিল। বস্তুত, ভারতে সমস্ত প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টিগুলি এই তত্ত্বে বিশ্বাসী— তারা সংসদীয় গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ করুক চাই না করুক।

মার্কসবাদের এই ব্যাখ্যায় শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের অভিজ্ঞতার মূল্য নেই। অর্থাৎ, এই অভিজ্ঞতা মার্কসবাদী চিন্তা চেতনা কোন ভাবে সমৃদ্ধ করে না। পার্টির যা জানার তা তার নেতা-বুদ্ধিজীবীদের জ্ঞান চর্চার মধ্যে দিয়েই জানা যায়।

তাই পার্টির মধ্যে কঠিন অনুশাসন দরকার হয়: সাধারণ সদস্য বা ক্যাডার হয় নেতাদের আজ্ঞাবাহী। বিশ্লেষণ, নীতি, কৌশল সমস্তই ঠিক করে নেতৃত্ব, এবং তলার স্তরে তার কোনও সমালোচনা পার্টির অনুশাসন বিরোধী। অভিজ্ঞতার কোন ভূমিকা স্বীকৃত নয় তাই আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সমাজ পরিবর্তনের পরিকল্পনা স্পর্শ করে না। দেশের অভ্যন্তর ও বিশ্ব সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পরিবর্তনের তাৎপর্য এই তত্ত্ব প্রয়োগ করে বোঝা দুষ্কর, কারণ এই ভাব-ধারার ধারকদের বিশ্বাস ইতিহাসের ধারার সত্য উদঘাটিত এবং অবিচল। এ কারণেই আর্থ-সামাজিক কাঠামো সম্বন্ধে শাসক শ্রেণীর জ্ঞান ভাণ্ডার ক্রমশ সমৃদ্ধ হচ্ছে কিন্তু মার্কসবাদী পার্টিগুলির জ্ঞান চর্চা একটা অন্ধ গলিতে প্রায় আবদ্ধ।

ক্যাপিটাল-এর অন্য পাঠ এবং তার সঙ্গে যুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি বিপরীত শিক্ষা দেয়। এই দৃষ্টিতে ইতিহাসের কোনও পূর্ব নির্ধারিত পথ নেই। শ্রেণী এবং অন্যান্য বৈষম্য প্রসূত হিংসা থেকে জাত কিছু আর্থ-সামাজিক উপাদানের আকস্মিক সংযোগে

কখনো কখনো একটি অপেক্ষিক ভাবে স্থায়ী আর্থ-সামাজিক কাঠামো নির্মাণ হয়। ফলে আলোচনার স্বার্থে যে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাগুলিকে একত্রে একই বর্গ ভুক্ত করা হয় তাদের মধ্যেও, বাস্তবিক ক্ষেত্রে, অনেক ফারাক থাকে। এবং সময়ের সঙ্গে একই নামাঙ্কিত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন আসে। তাই বাস্তব আন্দোলন/সংগ্রাম থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতা দিয়ে তাত্ত্বিক কাঠামোকে সমৃদ্ধ করেই শুধু বর্তমান বিশ্ব এবং আঞ্চলিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকে বোঝা প্রয়োজন। এই পাঠ সমাজ চর্চা, নীতি ও কৌশল নির্ধারণে পার্টি নেতাদের একচ্ছত্র প্রশ্নাতীত অধিকারের বিরোধী। এই পাঠ বলে, পার্টি সংগঠনে সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার গুরুত্ব অনুশাসনের থেকে বেশি হওয়া উচিত।

ইতিহাসের ধারা কোন সরল রেখা অনুসরণ করে না; ধারা অনিবার্য নয়, অনিশ্চিত। এই উপলব্ধি বাস্তব সামাজিক পরিস্থিতি (যা মার্কসবাদের প্রয়োগিক ক্ষেত্র) বোঝার দৃষ্টিভঙ্গিতে আনে আমূল পরিবর্তন, যার রাজনৈতিক চর্চার ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। বিষয়টা ভারতীয় আর্থ-সামাজিক কাঠামো বিশ্লেষণের উদাহরণ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করা যাক।

এক সময় ভারতীয় মার্কসবাদী মহলে একটা বিষয় খুব চর্চা চলত : ভারত পুঁজিবাদী দেশ কি না। এই খোঁজের পেছনে ছিল অনিবার্য, সরল ইতিহাসের ধারার প্রতি সমস্ত মার্কসবাদী দলগুলির অবিচল বিশ্বাস : যে কোনও সমাজের বিবর্তন ঘটে কতগুলি নির্দিষ্ট স্তর অতিক্রম করে— আদিম সাম্যবাদ, দাস প্রথা, সামন্ততন্ত্র, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ। কোন স্তরের পাশ কাটিয়ে পরের ধাপে পৌঁছনো সম্ভব নয়। প্রতিটি স্তরে কিছু প্রগতিশীল শ্রেণী থাকে। এরা চায় সমাজকে পরের ধাপে নিয়ে যেতে কারণ এই বিবর্তনের ফলে এই শ্রেণীগুলির আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা বাড়ে। মার্কসবাদের লক্ষ্য এই বিবর্তনের শেষ ধাপ— শোষণহীন, সাম্যবাদী সমাজ। তাই মার্কসবাদী পার্টিগুলির ওপর দায়িত্ব বর্তায় প্রগতিশীল শ্রেণী নির্ধারণের— যারা প্রগতির পরের ধাপে সমাজকে পৌঁছে দেবে। দীর্ঘ মেয়াদি লড়াই-এ একমাত্র নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার শ্রমিক শ্রেণী, কারণ তাদের হাতে শোষণ করার আবশ্যিক কোনও উপাদানের মালিকানা নেই। কিন্তু ইতিহাসের ধারা যদি পূর্ব নির্দিষ্ট কতগুলি ধাপ অতিক্রম না করে, তাহলে ধ্রুপদী পুঁজিবাদের আগমন এবং বিশুদ্ধ শ্রমিক শ্রেণীর আবির্ভাবের অপেক্ষা নিষ্প্রয়োজন।

বাস্তব সমাজ সরল রেখা অনুসরণ করে বিবর্তিত হয় না, এ কথা যদি স্বীকার করা হয় তা হলে ভারতীয় অর্থনীতি পুঁজিবাদী কি না এই প্রশ্নের উত্তর মার্কসবাদের প্রয়োগের ক্ষেত্রে গুরুত্ব হারায়। পুঁজিবাদের নানা বিস্তার সম্ভব এবং ভারতে তার বিশেষ বিস্তারই ঠিক করবে শোষণহীন সমাজ গড়ার পক্ষ বিপক্ষ। অনেক গবেষকদের মতে, ভারতে অসংগঠিত ক্ষেত্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তার বিস্তার ক্রমশ বাড়ছে। তৎসত্ত্বেও এরা মনে করে যে ভারতের আর্থ সামাজিক কাঠামোর নিয়ামক বিশ্বায়িত পুঁজি। সরল বিবর্তনবাদী ইতিহাসের প্রবক্তাদের মতে পুঁজিবাদী বিকাশের নিয়মে অপুঁজিবাদী উৎপাদন ক্ষেত্র সংকুচিত হতে থাকে। বাস্তবে দেখা যায় যে এমনটা ঘটে না। বিভিন্ন গবেষক এর ভিন্ন ভিন্ন কারণ দর্শান। আমরা তার বিচারে যাচ্ছি না। তবে এটা নিশ্চিত যে ভারতে একটা বিরাট এবং ক্রমবর্ধমান অসংগঠিত ক্ষেত্র বর্তমান, যার অন্তর্ভুক্ত সংস্থাগুলি কিন্তু আয়তনে বাড়ে না। এখানে স্বনিযুক্ত শ্রমজীবী মানুষ সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের তুলনায় দরিদ্র। এরা ধ্রুপদী মার্কসবাদী সংজ্ঞা অনুযায়ী শ্রমিক শ্রেণীর অন্তর্গত নয়। তাই সাবেকি মার্কসবাদী দলগুলি এদের সন্দেহের চোখে দেখে, কিন্তু শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় এদের আগ্রহ না থাকার কারণ নেই। আপত্তি উঠতে পারে যে এরা 'সর্বহারা' নয়, যেমন শ্রমিক শ্রেণী, কারণ এদের উৎপাদন বা ব্যবসা করার সম্বল আছে। তাই এদের মধ্যে মালিকানা বোধ আছে। এই একই কারণে ছোট চাষিকেও কমিউনিস্টরা সন্দেহের চোখে দেখে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অচল, কারণ শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেও মালিকানা বোধ বর্তমান এবং মার্কস এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করব।

বাস্তব সামাজিক কাঠামো তত্ত্বে নির্দিষ্ট নয়, তাই বিভিন্ন স্তরের সামাজিক সম্পর্ক, যেমন সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, পারিবারিক ইত্যাদি বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারে। যেমন প্রাপ্ত বয়স্কদের সবার সমান ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থাই শুধু পুঁজিবাদী অর্থনীতির সঙ্গে মানানসই এমন নয়। ধর্ম নিরপেক্ষতাও পুঁজিবাদের জন্য জরুরি নয়। আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই শিক্ষা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ: প্রতিটি সামাজিক ক্ষেত্রে পৃথক আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। স্বপ্ন অবশ্যই শোষণহীন সমাজের। কিন্তু ভবিষ্যতের এই ছবিকে আরও প্রসারিত করতে হবে নিপীড়নহীন সমাজের ধারণা যুক্ত করে : ধর্মীয়, বর্ণভিত্তিক, নারী-পুরুষ ভেদ ভিত্তিক নিপীড়ন থেকে মুক্ত সমাজ।

সমস্ত স্তরের (শোষণ ও নিপীড়ন বিরোধী) আন্দোলনের যোগসূত্র গোষ্ঠীগত উপযোগিতার বা ব্যবহারিক মূল্যের ধারণা। শ্রমজীবী মানুষের গোষ্ঠীবোধ জাগ্রত না হলে সে পণ্য-আচ্ছন্নতার প্রভাব মুক্ত হবে না। বস্তুত, পুঁজিবাদের দ্বান্দ্বিক ব্যাখ্যায় যে শ্রমিকের সংজ্ঞা আমরা পাই সে শ্রমিক পণ্য-আচ্ছন্নতার শিকার। তাই মার্কসের বক্তব্য অনুসারে বিপ্লবোত্তর সমাজ গঠনের প্রথম স্তরে নীতি হবে 'প্রত্যেকের থেকে সামর্থ্য মতো (শ্রম) আর প্রত্যেককে তার শ্রম অনুসারে পণ্য বণ্টন'। মার্কস 'Critique of the Gotha Programme'-এ বক্তব্য স্পষ্ট করে বলেছেন যে এই অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে কারণ শ্রমিক নিজেকে একটি উৎপাদনের উপকরণের মালিক হিসাবেই দেখে— তার নিজস্ব শ্রমের একক মালিক। অবশ্যই অন্যান্য

উপাদানের সঙ্গে এর এক মৌলিক পার্থক্য এই যে এই উপাদান ব্যবহার করে শোষণ (অন্যের উদ্বৃত্ত শ্রম আত্মসাৎ) সম্ভব নয়। তবু এই শ্রমিক ব্যক্তি মালিকানা বোধ মুক্ত নয়। ফলে যে পরিশ্রম করতে অক্ষম তার প্রতি শ্রমিকের কোন সহানুভূতি নেই। সে নিষ্ঠার সঙ্গে মালিকানা ধর্ম পালনে বিশ্বাসী। ব্যক্তি কেন্দ্রিক শ্রমিকদের কোন কৌমী চেতনা থাকে না। তাদের গোষ্ঠীগত অস্তিত্ব সম্পূর্ণ পার্টির মধ্যস্থতা নির্ভর। গোষ্ঠীবোধ শ্রমিক মননে অনুপস্থিত। এই মানসিকতা থেকে মুক্ত হয়ে কী ভাবে শ্রমিক শ্রেণীর দাবি হবে 'প্রত্যেকের থেকে তার সামর্থ্য মতো (শ্রম) আর প্রত্যেককে তাদের প্রয়োজন মতো পণ্য বণ্টন' এই বিষয়ে মার্কস আলোচনা করেন নি। বস্তুত এই উত্তরণ সম্ভব নয় যতক্ষণ না শ্রমিক শ্রেণীর মননে, সংস্কৃতিতে গোষ্ঠীগত উপযোগিতা বা সামাজিক প্রয়োজনের বোধ ঠাঁই পায়। তাই শ্রমজীবী মানুষের গোষ্ঠী বোধ জাগ্রত করার জন্য চাই স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক আন্দোলন। অবশ্যই এই সমস্ত আন্দোলন কী ভাবে যুক্ত হয়ে এক শোষণ ও পীড়ন মুক্ত সমাজ গঠিত হবে তার কোন তাত্ত্বিক বিধান আমাদের প্রস্তাবের মূল বক্তব্য বিরোধী। স্থান কালের পার্থক্য বুঝে আন্দোলনরত শ্রমজীবী মানুষকেই আন্দোলনের রূপরেখা স্থির করতে হবে।

যে হেতু এই প্রস্তাবে সমাজ গঠনে আকস্মিকতার ভূমিকা আছে, সে হেতু সামাজিক কাঠামোর স্থায়িত্বের কোন নিশ্চয়তা নেই। ফলে পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থার স্থায়িত্বের জন্য আন্দোলন জারি রাখতে হবে। বিপ্লবের কোন অন্ত নেই। যে হেতু নেতৃত্বের উপলব্ধ বৈজ্ঞানিক সত্যের ভিত্তিতে সমাজ পরিবর্তনের ভিত্তিতে সমাজ পরিবর্তন ঘটে না সে হেতু নেতৃত্বের সমালোচনা প্রয়োজন। অর্থাৎ, পার্টির ভিতরে এবং বাইরে আন্দোলন সদা জারি রাখা দরকার। শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখলের লড়াই শুধু নয়। বস্তুত, দরকার ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম সংগঠিত করা।

পরিশিষ্ট

রচনার প্রস্তাবনায় আমরা বলেছি *ক্যাপিটাল*-এর প্রথম এবং দ্বিতীয় পাঠ পরস্পর নির্ভরশীল। প্রথম পাঠের ফাঁক ভরাট করে দ্বিতীয় পাঠ। দ্বিতীয় পাঠও কিন্তু প্রথমটির ওপর নির্ভর করে। ইতিহাস সত্যের লিপি নয়। কোন ঘটনার ওপর গুরুত্ব দেব, কী ভাবে পেশ করব, সব দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভর। ইতিহাসের যে বিশেষ মুহূর্তগুলি মার্কস *ক্যাপিটাল*-এ পেশ করছেন সেগুলি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে নির্বাচিত। কোন দৃষ্টিতে দেখা হবে তাও অনেকটাই নির্দিষ্ট। যেমন আদি সঞ্চয়নের কাহিনী উপাদানের বাজার সম্প্রসারণের বর্ণনা হিসাবেও উপস্থাপন করা যায়, কিন্তু মার্কস এতে দেখছেন উচ্ছেদের ইতিহাস।

একই সঙ্গে মার্কসের দুটি সত্তাও পরস্পর নির্ভর : সংগঠক মার্কস আর বুদ্ধিজীবী মার্কস। যুক্তি (দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ) প্রয়োগ করে মার্কস *ক্যাপিটাল*-এ শ্রেণী বিশিষ্ট পুঁজিবাদী সমাজের কাঠামো নির্মাণ করেছেন দুটি কারণে: যুক্তি দিয়ে বুর্জোয়া অর্থনীতির বিশ্লেষণ নস্যাৎ করার জন্য আর পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক কাঠামোতে লুকানো শোষণ ব্যবস্থা উদ্‌ঘাটন করার উদ্দেশ্যে। ফলে সংগ্রামের অভিজ্ঞতার শিক্ষা গ্রহণ করছেন একটি বিশেষ তাত্ত্বিক ছাকনির ফাঁক দিয়ে।

রচনার কোনও কোনও ক্ষেত্রে একটি পাঠের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য অন্য পাঠের সঙ্গে তার পার্থক্য নজর করেছি, পরস্পর নির্ভরশীলতার দিকটা আড়াল করছি। এ সমস্যা এড়ানো অসম্ভব। সমালোচনার মুখে লেনিন স্বীকার করেছিলেন যে *What is to be Done*-এ তাঁর অবস্থান অনেকটা একপেশে হয়ে গিয়েছিল কারণ বিপরীত ধারা খণ্ডন করা সে মুহূর্তে জরুরি ছিল। এর বিশদ আলোচনা অ্যালথুসার (২০০৬এ)-এ পাওয়া যাবে।

আমরা এ বিষয়টির আবার অবতারণা করলাম একটি বিশেষ কারণে। বিশুদ্ধতার অনুপস্থিতি মার্কসবাদের প্রয়োগে জটিলতা আনে। কেউ উৎসর্গিত প্রাণ নয়; কোনও সামাজিক পরিস্থিতিই শুধু উত্তরণ মুখী নয়। আর সম্পূরণ কখনই সম্পূর্ণ হয় না। এর থেকে আমরা শিক্ষা পাই মন গড়ার, কৌম গড়ার, সমাজ গড়ার কাজ অন্তহীন।

তথ্যসূত্র

Althusser, L. (2006 a) : 'Marx in his limits' in *Philosophy of the encounter : Later writings, 1978-87*, trans. G. M. Goshgarian, ed. F. Matheron and O. Corpet. London : Verso.

Althusser, L. (2006 b) : 'The Underground Current of the Materialism of the Encounter' in *Philosophy of the encounter : Later writings, 1978-87,* trans. G. M. Goshgarian, ed. F. Matheron and O. Corpet. London : Verso.

Basu, P. K. (2012) : 'Rethinking the Values of the Left' in *Rethinking Marxism* (24:2) Routledge, London.

Lenin, V. : *Three Sources and Three Component Parts of Marxism* at *www.marxists.org/archive/lenin/works/1913/mar/x01.htm*

Lenin, V. : *What is to be Done* at *www.marxists.org/archive/lelin/worksdownload/whatitd.pdf*

Marx, K. : *Capital, Vol.I, at www.marxists.org/archive/marx/works/.../Capital-Volume-I.pdf*

Read, J. (2002) : 'Primitive Capital Accumulation : The Alleatory Foundation of Capitalism' in *Rethinking Marxism (14 :2)*

Spivak, G. C. (1984) : 'Marx after Derrida' in Cains, W. (ed.) *Philosophical Approaches to Literature : New Essays on Nineteenth and Twentieth Century Texts. Bucknell University Press, Lewisburg.*

Spivak. G. C. (1985) : 'Scattered Speculations on the Question of Value' in *Diacritics (15:4).* Johns Hpkins University Press, Jstor

ধনতন্ত্রে অসাম্য : থমাস পিকেটির মার্ক্সীয় পাঠ

মানস

একজন পুঁজিপতি তাঁর বন্ধুকে নিয়ে নিজের কারখানার মধ্যে দিয়ে হাঁটছিলেন। বন্ধুটি পুঁজিপতি ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন

—'তুমি ওই লেবারটিকে এক্ষুণি কী বললে?'

পুঁজিপতি ভদ্রলোকটির জবাব 'আমি ওকে বললাম আরও দ্রুত কাজ করতে।'

বন্ধুটির পরের প্রশ্ন— 'কত টাকা দাও ওকে?'

—'দিনে ১৫০ টাকা।' — জবাব দেন পুঁজিপতি।

বন্ধুটি এবার জানতে চাইলেন—

—'তুমি ওকে পয়সা দেওয়ার অর্থ কোথা থেকে পাও?'

—'আমি জিনিসপত্র বিক্রি করি।'

—'কে তৈরি করে সেই জিনিসগুলো?'

—'কে আবার, ও আর ওর মতন লেবারগুলো।'

—'ওই লোকটা দিনে কটা প্রডাক্ট তৈরি করে?'

—'এই... দিনে ১০০০ টাকার মতন।'

—'তার মানে হলো তুমি ওকে দাওনা উলটে ও তোমাকে প্রতিদিন ৮৫০ টাকা করে দিচ্ছে, যাতে তুমি ওকে বলতে পারো কাজের গতি বাড়ানোর কথা।

—'উফ, আরে বাবা মেসিনগুলো তো আমিই কিনেছি নাকি।'

—'কীভাবে তুমি মেসিনগুলো কিনলে?'

—'জিনিসপত্র বিক্রির টাকায়।'

—'আর কে বানাল সেই জিনিসগুলো?'

—'শাট আপ। এবার চুপ করো। ও তোমার কথা শুনতে পেয়ে যাবে।'

মোটের ওপর এই হল আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থা। যার নাম পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা। কার্ল মার্কস তাঁর *ডাস ক্যাপিটাল* (১৮৬৭) মহাগ্রন্থে এই ব্যবস্থার একটি অনুপুঙ্খ বর্ণনা সহ গভীর ব্যাখ্যা প্রস্তুত করেছিলেন। বলা যায় তাঁর পর থেকে পৃথিবীকে দুটি ভাগে ভাগ করে দিয়েছিলেন— মার্কসবাদী ও অ-মার্কসবাদী। 'ডাস ক্যাপিটাল' মহাগ্রন্থের বয়স প্রায় ১৫০ বছর হতে যায়। সময়টা ঠিক কেমন একটু বুঝে নিই। ২০০৭-০৮-এর অর্থনৈতিক সঙ্কটের ফলে ধনতন্ত্রের এখনও বেশ পর্যুদস্ত অবস্থা। অকুপাই ওয়াল স্ট্রীট আন্দোলন ঘটে গেছে— যেখানে 'আমরা ৯৯% আর ওরা ১%', এই দাবি ধনতন্ত্রে অসাম্যের চিত্রটি প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছে। নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকার আর্কাইভস-এ খোঁজ করে দেখা গেছে যে ২০০৭ থেকে ২০১৪, এই সাত বছরের মধ্যে শুধু 'ইনকাম ইনইক্যুয়ালিটি' অর্থাৎ আয়-অসাম্য বিষয়েই ৪২৬০টি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। অন্যদিকে ১৯৭৭ থেকে ২০০৭, এই সুদীর্ঘ সময়ে একই বিষয়ে নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল মাত্র ২৬৬০টি। এমত সময়ে ২০১৪ সালে ফ্রান্সের এক স্বঘোষিত অ-মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদ থমাস পিকেটি লিখলেন আর একটি গ্রন্থ— 'ক্যাপিটাল ইন টুয়েন্টি ফাস্ট সেঞ্চুরি'— যে বইটি প্রকাশের পরের কয়েক মাসের মধ্যেই তোলপাড় করে দিল প্রথাগত অর্থনীতিবিদদের ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড়। নিজেকে প্রকাশ্যে অ-মার্কসবাদী ঘোষণা সত্ত্বেও পিকেটি-র এই গ্রন্থের নামকরণেই মার্কসের ক্যাপিটাল-এর ছায়া স্পষ্ট। এই লেখাটিতে আমরা প্রথমে পিকেটির বইটির মূল বক্তব্যগুলো দেখে নেবো। তারপরে আমরা মার্কসীয় তত্ত্বানুসারে এই বক্তব্যগুলির যাথার্থ্য বিশ্লেষণ করবো।

পিকেটির মূল বক্তব্য

পিকেটি দীর্ঘকালীন তথ্যের ভিত্তিতে দেখিয়েছেন কী ভাবে অত্যন্ত মারাত্মক হারে অর্থনৈতিক অসাম্য বেড়ে চলেছে। উনি বিভিন্ন দেশের তথ্য নিয়ে কাজ করেছেন।

পিকেটি-র চারটি মূল সিদ্ধান্ত নিয়ে এবার আলোচনা করব। প্রথমত, আমেরিকার মতই বিশ্বের প্রায় সমস্ত প্রান্তে অসাম্যের একই রকম ভয়াবহ অবস্থা দেখা গেছে। দ্বিতীয়ত, আমেরিকাতে একটি 'সুপার-ম্যানেজার' শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে, যারা প্রচুর মাইনে পায় এবং যারা নাকি এতটাই ক্ষমতাশালী যে তারা নিজেদের মাইনে নিজেরাই ঠিক করতে পারেন। তৃতীয়ত, সর্বাধিক ধনীদের সর্ব্বোচ্চ ১%-এর অবস্থান সাধারণের থেকে বরাবর অনেক অনেক উঁচুতে। একমাত্র যে সময়টায় পুঁজি-মুনাফা অনুপাত তুলনামূলকভাবে কিছুটা কমেছিল এবং সমাজে সমতা কিছুটা হলেও দেখা গিয়েছিল, সেটা হলো ১৯১৪ থেকে ১৯৭০ সাল মধ্যবর্তী পর্যায়। এই সময়কালটিতে বিভিন্ন সংকট, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, রুশ বিপ্লব, মহামন্দা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, চীন বিপ্লব ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে বিশ্ব-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এক উল্টোগতি দেখা যায়। একদিকে ধনীদের উপর চাপানো হয়েছিল ট্যাক্সের ভারী বোঝা এবং অন্যদিকে বিশ্বযুদ্ধ ও মহামন্দায় অনেকের সম্পদ নষ্ট হয়েছিল বিস্তর। এছাড়া এই সময়কালে বিশ্বব্যাপী শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলনেরও বিস্তার ঘটেছিল। মালিকপক্ষ এবং সরকার আরও বড় কোনো বিপর্যয় এড়াতে এইসমস্ত ব্যবস্থা মানতে বাধ্য হয়েছিল। তাই এই ষাট বছরে অসাম্য অপেক্ষাকৃত কম ছিল।

চতুর্থত, এই দীর্ঘ ষাট বছরে অপেক্ষাকৃত সমতার ফলে এক প্রভাবশালী 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণীর উদ্ভব হয়। যেমন বৃত্তিজীবী, সরকারি উচ্চপদস্থ আধিকারিক, ট্রেড-ইউনিয়নভুক্ত সংগঠিত

শ্রমিক, যাদের হাতে গ্রাসাচ্ছাদনের পরেও উদ্বৃত্ত কিছু আয় থেকে যায়, যা তাদের হাতে সম্পদ (মূলত বাসগৃহ) হিসাবে জমা হয়। এই শ্রেণীটির উদ্ভব, পিকেটির মতে, গত শতাব্দীর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পিকেটির মতে, বিশেষত ধনী দেশগুলির রাজনৈতিক গতিপথ নির্ণয়ে এই শ্রেণীটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

পুঁজির লাভের হার (r= return) প্রবৃদ্ধির হারের (g= growth) অপেক্ষা বেশি হয়ে যাওয়া, পিকেটির মতে, অসাম্য বৃদ্ধির কারণ। অর্থাৎ পুঁজি যে হারে বাড়ছে, উন্নত দেশগুলির জাতীয় আয় তার থেকে কম হারে বাড়ছে। আর তার ফলেই বেড়ে চলেছে পুঁজিপতিদের সাথে অন্যান্যদের সম্পদের অসাম্য। পিকেটি-র এই অত্যন্ত উন্নতমানের তথ্যানুসন্ধানের ফলে একথা প্রমাণ হয়ে যায় যে পুঁজিপতিরা ক্রমশ বড়লোক থেকে আরও বড়লোক হচ্ছে। পুঁজিপতিদের সাথে বাকিদের সম্পদের অসাম্য আকাশছোঁয়া হয়েছে পুঁজিপতিদের পরিশ্রমের ফলে নয়, বরং তাদের বংশানুক্রমে পাওয়া সম্পদের উপর লব্ধ মুনাফার ফলেই এটা হচ্ছে। অর্থাৎ পিকেটি-র ব্যাখ্যা অনুযায়ী এখানে দ্বন্দ্বটা হল পূর্বপুরুষের জমিয়ে রাখা সম্পদের সাথে বর্তমান প্রজন্মের শ্রমের দ্বারা অর্জিত সম্পদের। পিকেটি দেখিয়েছেন যেহেতু ধনী দেশগুলির প্রবৃদ্ধির হার (g) অর্থাৎ জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হার খুব একটা বেশি নয় কিন্তু পুঁজির মুনাফার হার (r) অনেক বেশি তাই এই দেশগুলিতে 'বংশগত পুঁজির' (Patrimonial Capitalism) জন্ম হয়ছে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, পিকেটির মতে ভারত বা চীনের মতন দেশগুলিতে যাদের জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির হার অনেক বেশি সেখানে অবশ্য পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত সম্পদ ততটা প্রভাব ফেলবে না।

এবার আবার আগের কথায় ফেরা যাক। অসাম্যের পর্যায় ভিত্তিক ছবিটা যদি দেখা যায় তাহলে দেখব যে সত্তরের দশক থেকেই গল্পটা আবার চেনা পথে হাঁটতে থাকে। এবং অসাম্য বাড়তে থাকে এবং আজ তা আকাশছোঁয়া হয়ে গেছে। পিকেটি দেখিয়েছেন যে আমেরিকাতে ১৯৭৭ থেকে ২০০৭-এর মধ্যে জাতীয় আয়ের ৬০ শতাংশ সর্বাধিক ধনীদের ১ শতাংশ পকেটস্থ করেছেন। বর্তমান অবস্থাটি নিম্নোক্ত সারণী থেকে কিছুটা বোঝা যাবে।

সম্পদ (২০১০)	*সর্বোচ্চ ১% ধনীগোষ্ঠী কবলিত সম্পদ (%)*
স্টক ও মিউচুয়াল ফান্ড	৪৮.৮
ফিনান্সিয়াল সিকিউরিটি	৬৪.৪
ট্রাস্ট	৩৮
বিজনেস ইক্যুয়িটি	৬১.৪
রিয়াল এস্টেট (আবাসন ব্যতীত)	৩৫.৫

উপরের সারণীতে দেখানো হয়েছে যে সর্বাধিক ধনীদের সর্বোচ্চ ১ শতাংশের কব্জায় এই বিভিন্ন ধরনের সম্পদের কত অংশ রয়েছে এবং এখানে যা দেখা যাচ্ছে তা এক কথায় ভয়াবহ। পিকেটির মতে এই ভাবে চলতে থাকলে আর কিছুদিনের মধ্যেই পৃথিবীর ৯০ শতাংশ সম্পদের মালিকানা চলে যাবে অত্যন্ত অল্প কিছু সংখ্যক ধনী ব্যক্তিদের হাতে। যার ফলস্বরূপ গণতন্ত্র অবধারিতভাবে বিপন্ন হবে। আর এইখানেই পিকেটির আপত্তি। এই সমস্যাটির সমাধানের জন্য উনি বিশ্বের তাবড় তাবড় দেশগুলিকে একসাথে হাত মিলিয়ে ধনীদের সম্পদের ওপর ট্যাক্স বসানোর দাবি জানিয়েছেন। এবং সেই ট্যাক্স থেকে অর্জিত অর্থ সমাজকল্যাণের কাজে লাগানোর কথা বলেছেন।

পিকেটি বনাম মার্কস

একথা অনস্বীকার্য যে পিকেটি-র কাজটি তথ্য ও তার বিশ্লেষণের দিক থেকে অসাধারণ, তবে তত্ত্বের দিক থেকে বেশ কিছুটা সমস্যাজনক। আগে দেখে নেওয়া যাক তত্ত্বগতভাবে ওনার বইটিতে কী কী ফাঁকফোকর রয়েগেছে। মার্কসীয় আঙ্গিক থেকে দেখলে এই কয়েকটি বিষয় না উল্লেখ করলেই নয়, যথা—

প্রথমত, পিকেটি ওনার এই ৬০৫ পৃষ্ঠার বইটিতে ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে কেন প্রবৃদ্ধি শ্লথ হয়ে যায় এবং কীভাবে গচ্ছিত সম্পদ এবং বর্তমান আয়ের মধ্যে এতটা পার্থক্য বেড়ে যায় একথা ব্যাখ্যা করতে পারেননি। দ্বিতীয়ত, পিকেটি তাঁর বিশ্লেষণে শ্রেণী-দ্বন্দ্ব বলে কোন বিষয়কে গুরুত্ব দেননি। পুঁজিপতিদের ক্ষমতাকে (class power) উনি ক্রমবর্ধমান অসাম্যের কোন সম্ভাব্য কারণ হিসেবে ওনার বিশ্লেষণে নিয়ে আসেননি। ওনার বিশ্লেষণে বণ্টন ব্যবস্থাটা উৎপাদন ব্যবস্থার চাইতে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে, যেখানে মার্কসীয় বিশ্লেষণে উৎপাদন ব্যবস্থার গুরুত্বই সর্বাধিক। তৃতীয়ত, একচেটিয়া পুঁজির ধারণাটি ওনার বিশ্লেষণে একেবারেই অনুপস্থিত।

এইবার আমরা যদি মার্কসীয় ধারণাগুলির মাধ্যমে ধনতন্ত্রে ক্রমবর্ধমান অসাম্যকে বুঝতে চাই তাহলে কী দেখব? মার্কস-এর তত্ত্বে শোষণের ধারণাটি যদি দেখি তাহলে আমরা দেখব যে মূলত দুভাবে শোষণ সংঘটিত হয়। প্রথমটি হলো কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের থেকে উদ্বৃত্ত মূল্যের আত্মসাৎ করার ফলে, আর দ্বিতীয়টি ঘটে বিভিন্ন প্রকারে বিস্থাপনের মাধ্যমে (accumulation by dispossession)। এই দুটি পদ্ধতির ফলেই সমাজে পুঁজিপতি এবং শ্রমিক শ্রেণীর সম্পদের পরিমাণের পরিবর্তন হয় এবং অসাম্য বাড়তে থাকে। এছাড়াও বিস্থাপনের বিভিন্ন পন্থার মধ্যে আছে পুঁজিপতিদের ক্ষমতাকে (power) কাজে লাগিয়ে প্রাকৃতিকসম্পদ লুণ্ঠন, আদিবাসী, গরিব জনজাতিদের গায়ের জোরে বিতাড়ন ও বিস্থাপন, ভ্রষ্টাচার ও দুর্নীতির মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে

এর পর ৬৬ পৃষ্ঠায়

ধনতন্ত্র ও আদি সঞ্চয়

মিতা দত্ত

বিশ্বের অন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মতই ধনতন্ত্রের জন্যও কোন বিশেষ একটি দিন নির্দিষ্ট করা যায় না যেদিন থেকে ধনতন্ত্রের সূচনা ঘটেছিল। আগের ব্যবস্থার মধ্যেই ধীরে ধীরে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে উঠেছে, দিন দিন শক্তিশালী হয়েছে। সব দেশে, এমন কি একই দেশের সব অঞ্চলেও ধনতন্ত্র একই সাথে হয় নি, ধনতন্ত্র গড়ে ওঠার ইতিহাসও বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন।

ধনতন্ত্রের জন্মভূমি ইউরোপ। মার্কস তাঁর *ক্যাপিটাল* গ্রন্থে ধনতন্ত্রের আলোচনার জন্য বেছে নিয়েছিলেন ব্রিটেনকে, তার একটা কারণ ইউরোপের মধ্যে ব্রিটেনে ধনতন্ত্র এসেছিল একেবারে প্রথম দিকে।

প্রদীপ জ্বালার আগে যেমন সলতে পাকাতে হয়, প্রদীপ গড়তে হয়, তেলের যোগাড় করতে হয়, ধনতন্ত্রের আগমনেরও তেমনই কতকগুলি প্রাক্‌শর্ত আছে। সেগুলির মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি হলো প্রাথমিক পুঁজি। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাক্‌শর্ত হলো উৎপাদনের উপকরণহীন কিছু শ্রমজীবী, যারা নিজেদের শ্রম বেচতে বাধ্য হবে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কীভাবে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পুঁজি দিয়ে কাঁচামাল ও শ্রম কিনে সেদুটিকে নির্দিষ্ট একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিয়ে গিয়ে পণ্য তৈরি হয়, আর সেই পণ্যের মূল্য হয় প্রথমে যে পুঁজি বিনিয়োগ করা হয়েছিল তার চেয়ে বেশি, এবং পণ্যের এই বর্ধিত মূল্য পুঁজিপতিকে মুনাফা দেয়— পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার এই মার্কসীয় ব্যাখ্যা সবার মোটামুটি জানা। কিন্তু সে তো পুঁজিবাদী উৎপাদন শুরু হওয়ার পর। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা শুরু হওয়ার সময় প্রথম পুঁজি কোথা থেকে এসেছিল সেটাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। বিষয়টা নতুন কিছু নয়। পুরনো কথা নতুন করে বলা— এই পর্যন্ত।

অ্যাডাম স্মিথ থেকে শুরু করে মূলধারার অন্যান্য অর্থনীতিবিদরা এর ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন এইরকম— একদল মানুষ খেটেখুটে এবং খরচ কম করে সঞ্চয় করেছিলেন, তারা হয়েছেন মালিক, আর একদল কুঁড়েমি আর অমিতব্যয়িতায় জীবন কাটিয়েছেন, তাঁদের হাতে কিছু জমে নি, তার হয়েছেন শ্রমিক। এ ব্যাখ্যার ভিত্তি ইতিহাসেও নেই, অর্থনীতিতেও নেই, আছে মতাদর্শে। সেই মতাদর্শটি হলো মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্বে সরাসরি পুঁজিবাদীদের পক্ষাবলম্বনের মতাদর্শ, বা বুর্জোয়া মতাদর্শ। তাদের হাতে জমা হওয়া সম্পদ দিয়ে সম্পদহীন শ্রমিক শোষণকে নৈতিক হিসাবে দেখানোর প্রচেষ্টা। এর বিপরীতে মার্কস ইতিহাসের ব্যাখ্যা করে জানালেন, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা শুরু করার জন্য প্রথম পুঁজি এসেছিল এককথায় লুঠ থেকে। মার্কসের ভাষায়,

> প্রকৃত ইতিহাসে এটা একটা কুখ্যাত ঘটনা সত্য যে বিজয়, দাসকরণ, ডাকাতি, হত্যা, এক কথায়, বলপ্রয়োগের ভূমিকাই ছিল প্রধান।

এই লুঠ দ্বিবিধ। একটি দেশের মধ্যেকার উৎপাদকদের হাত থেকে উৎপাদনের উপকরণ কেড়ে নেওয়া, অন্যটি হলো দেশের বাইরে লুণ্ঠন।

প্রত্যক্ষ উৎপাদকদের কাছ থেকে লুণ্ঠন : দেশের মধ্যে

উৎপাদকদের কাছ থেকে উৎপাদনের উপকরণ কেড়ে নেওয়ার প্রয়োজন দ্বিবিধ। প্রথমত এই উৎপাদনের উপকরণগুলিই প্রাথমিক পুঁজির কাজ করবে। দ্বিতীয়ত, উৎপাদকের কাছে উৎপাদনের উপকরণ থাকলে সে পুঁজিপতির কাছে শ্রমশক্তি বিক্রি করতে যাবে না, নিজেই উৎপাদন করে জীবন নির্বাহ করবে। গফুরকে মনে আছে তো? নিজের জমির ফসল খেয়ে বেঁচে থাকা কৃষক আহ্লাদে আটখানা হয়ে শ্রমিক হতে ছোটে না। তার শ্রমিক হওয়ার পেছনে একটা তাড়না থাকতে হবে। সাধারণভাবে সেই তাড়না হলো নিজে উৎপাদন করে বেঁচে থাকার অবস্থা না থাকা। মার্কসীয় ভাষ্যে, উৎপাদনের উপকরণ না থাকায় শ্রমশক্তি অর্থাৎ নিজের শরীরে ক্রিয়া ছাড়া তার কিছু বিক্রি করার নেই।

সুতরাং কৃষককে আক্ষরিক অর্থেই সর্বহারা করতে হবে, এবং কৃষকের উৎপাদনের উপকরণগুলিকে করতে হবে পুঁজিপতির সম্পদ।

ইংল্যান্ডে এই প্রক্রিয়াটি হয়েছিল মূলত 'এনক্লোজার'-এর মধ্য দিয়ে। আগে যে জমি ছিল সাধারণের, ১৬০৪ সাল থেকে পরপর এনক্লোজার আইনের মাধ্যমে সেই জমি আনা হলো ব্যক্তি মালিকানায় (১৬০৪ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত মোট ১১ হাজার বর্গমাইল জমি এভাবে সাধারণ মালিকানা থেকে ব্যক্তি মালিকানায় এসেছিল, মনে রাখতে হবে যুক্তরাজ্যের মোট আয়তম হলো ৯৪ হাজার বর্গমাইল)। সাধারণের এই জমি শুধু চারণক্ষেত্র বা পড়ে থাকা জমি ছিল না। এই জমির অনেকটাই কৃষকরা চাষের জন্যও ব্যবহার করত।

জমি কমে গেলে স্বাভাবিকভাবেই আগের মতো বেশি কৃষক তার ওপর নির্ভর করে জীবন ধারণ করতে পারবে না। বেশ কিছু কৃষক বেকার হয়ে পড়বে, উৎপাদনের উপকরণের অভাবে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তারা উৎপাদন করতে ব্যর্থ হবে। অর্থাৎ শহরে গিয়ে শ্রমশক্তি বেচার মতো মানুষ পাওয়া যাবে।

একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। চাষের জমি কমে গেলে শহরের শ্রমিকদের খাদ্য আসবে কোথা থেকে?

সে প্রসঙ্গে বলতে হয় ইংল্যান্ডের কৃষি বিপ্লবের কথা।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতক ছিল ইংল্যান্ডে কৃষি বিপ্লবের সময়কাল। এই সময় ইংল্যান্ডের কৃষিতে কয়েকটি পরিবর্তনের ফলে কৃষিতে উৎপাদনশীলতা বাড়ে। কম জমিতে কম কৃষকের শ্রমে বাড়তি ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হয়।

পরিবর্তনগুলির কথা এক এক করে বলা যাক।

ক) ক্রপ রোটেশন : তখন তো এক ফসলের সময়। বছরের একটা বিরাট সময় জুড়ে জমি পড়ে থাকে। শুধু তাই নয়, বছরের বছর ফসল বুনলে সে জমির উর্বরতা কমে যায় বলে প্রতি বছর প্রায় অর্ধেক জমি ফেলে রাখা হয় যাতে তার উর্বরতা ফিরে আসে।। এখন সেই পড়ে থাকা জমিতে মূলত ক্লোভার আর শালগম বোনা শুরু হলো। এগুলির ব্যবহার ছিল প্রধানত পশুখাদ্য হিসেবে। কিন্তু ফসলের জমিতে পশুখাদ্য পাওয়া মানে চারণভূমি খানিক বাড়তি হওয়া। শুধু তাই নয়, ক্লোভার জমিতে নাইট্রোজেন জমা করতে সাহায্য হয়। আগে জমিতে ক্রমান্বয়ে চাষের ফলে জমির উর্বরতা হ্রাসের জন্য খানিক জমি ফেলে রাখতে হতো হারিয়ে যাওয়া উর্বরতা ফিরে পাওয়ার জন্য। ক্রোভার চাষের ফলে তার প্রয়োজন কমে গেল। জমির উৎপাদনশীলতা বাড়তে লাগল।

চাষের জমিকে মাঝে মাঝে পশুচারণক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করেও চাষের জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করা হতে লাগল। পশুচারণক্ষেত্রে তো পশুই শুধু ঘাস খায় না, পশুর মল থেকে ক্ষেত্রটির উর্বরতা বৃদ্ধি হয়।

জমিতে মাঝে মাঝে মটর ও এই জাতীয় চাষ করেও জমিতে নাইট্রোজেন জমা করার মাধ্যমে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পেতে লাগল (বা উর্বরতা হ্রাস প্রতিরোধ করা গেল)।

এর ফলে কার্যকর কৃষি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে লাগল।

১৭৫০ সালে দেখা গেল জনসংখ্যা বৃদ্ধির চেয়ে বেশি হারে বাড়ছে কৃষি উৎপাদন।

খ) নতুন লাঙল : ইউরোপে আগে যে পুরনো ভারি লাঙল ব্যবহার করা হতো সেটি টানতে ছয় থেকে আটটি বলদের প্রয়োজন হতো। সপ্তদশ শতকের গোড়ায় ওলন্দাজরা চীন থেকে হাল্কা ও বেশি কার্যকর লাঙল ইউরোপে আনে, ওলন্দাজদের সেই লাঙল আরও কিছু পরিবর্তিত হয়ে ইংল্যান্ডে আসে। নতুন লাঙলের জন্য একটা বা দুটো বলদই যথেষ্ট। এতে শুধু খরচই কমে না, পশুখাদ্যের জন্য জমির পরিমাণও কমে যায়, ফলে চাষের জমি বাড়ে। শুধু তাই নয় এই লাঙল আগের তুলনায় বেশি কার্যকর হওয়ায় যে জমিতে আগে লাঙল দেওয়া যেত না সে জমিও লাঙলের আওতায়, কৃষির আওতায় আসতে পারে।

গ) নতুন কৃষি জমি তৈরি : নেদারল্যান্ডে জমির ওপর মানুষের চাপ অনেক বেশি। তাই সেখানে প্রতিটি ইঞ্চি জমিকে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা চলেছে আগে থেকেই। জলা জমির জল নিষ্কাশন করে, শুখা জমির জন্য খাল কেটে জল এনে, নতুন জমি তৈরির ওলন্দাজ প্রক্রিয়াগুলি নিয়ে ইংল্যান্ডেও নতুন জমি তৈরি করা হতে লাগল। আর পশুচারণভূমি মুক্ত করে এখন কৃষি জমি করার কথা তো আগেই বলেছি।

ঘ) বাজার ও পরিবহন: ১৫০০ সালেই ইংল্যান্ডে ৮০০টি বাজার তৈরি হয়ে গেছে। বাজার তৈরি হলে কৃষিজাত ফসলের কার্যকর চাহিদা বাড়ে। কৃষিপণ্যের চাহিদা বাড়তে কৃষি উৎপাদনবৃদ্ধির তাড়না দেখা দেয়।

কৃষিপণ্য বাজারজাত করতে হলে মাল পরিবহনের প্রশ্ন ওঠে। ইংল্যান্ডে নদী প্রচুর। নদীতে পণ্য পরিবহনের সুবিধা আছে। পাশাপাশি ষোড়শ শতকে প্রথমার্ধ থেকেই রাস্তা তৈরির ওপরও গুরুত্ব দেওয়া শুরু হয়।

ইংল্যান্ডের এই কৃষি বিপ্লব সে দেশে পুঁজিবাদ ও শিল্প বিপ্লবের জমি তৈরি করে। আক্ষরিক অর্থেই বাড়তি জমি মেলে। এই জমির একটা অংশ এবার উৎপাদক বা কৃষকদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে এলো এনক্লোজার। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে এনক্লোজারের জোয়ার এল। সাধারণের জমি এল ব্যক্তি মালিকানায়। ব্যক্তি মালিক এবার কম লোক নিয়োগ করে সেই জমি চাষ করাতে লাগল। সাধারণের জমি লুঠ করে তারা যে বাড়তি অর্থ রোজগার করতে সমর্থ হলেন সেটা পরে পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে। অন্যদিকে, জমি হারিয়ে পশুচারণের অধিকার হারিয়ে অনেক গ্রামবাসী কর্মহীন হয়ে পড়লেন। তারা শহরে গেলেন কাজের সন্ধানে। শ্রম ছাড়া এদের বেচবার মতো কিছু নেই।

সাধারণের জমি ব্যক্তি মালিকানায় এনে পুঁজিবাদী উৎপাদনের ভিত্তি হিসাবে তাকে ব্যবহার করার সে প্রক্রিয়া অবশ্য শুধু পুঁজিবাদী উৎপাদনেই সেই উষাকালেই শেষ হয়ে যায়নি। সে প্রক্রিয়া সমানে চলেছে, বিশেষ করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মক্কা পশ্চিম ইউরোপের বাইরে। বিশেষ করে সংকটের সময় বারবার পুঁজিবাদ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বাইরে থেকে রসদ যোগাড় করেছে, করে চলেছে। এখন যেমন আমাদের দেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে চলছে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার বাইরে অবস্থিত মানুষদের, বিশেষ করে আদিবাসীদের সাধারণ ভূমি, জমি-জঙ্গল, পাহাড়-ভূমিজল, খনি-নদী কেড়ে নেওয়ার জোয়ার।

আবার ইংল্যান্ডে ফিরে আসি। গোটা ষোড়শ শতক জুড়ে ইংল্যান্ডে একের পর এক আইন হয়েছে যাতে বলা হয়েছে শহরবাসীর শ্রমিক না হওয়া অপরাধ। উৎপাদনের উপকরণ জমি হারিয়ে যে মানুষরা গ্রাম থেকে এসে শহরে আশ্রয় নিলেন তারা অনেকেই ভিক্ষাজীবী হিসেবে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে লাগলেন। সরকার তখন আইন করে ভিক্ষাবৃত্তি অপরাধ বলে ঘোষণা করল। ভিক্ষা করলে তাকে বেত মারা হবে, কানের ওপরে দেগে দেওয়া

হবে, কান কেটে নেওয়া হবে, এমন কি তাকে দাস হিসাবে দিয়ে দেওয়া হবে কিংবা প্রাণদণ্ড হবে। ষোড়শ শতকের ব্রিটিশ আইন এমনটিই বলছে। অর্থাৎ গ্রাম থেকে তাড়িয়েই কাজ শেষ নয়, তাদের জড়ো করতে হবে পুঁজিপতির কারখানার সামনে, যাতে তারা যে কোনও মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হয়।

এছাড়া প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সাধারণ মানুষের উৎপাদিত দ্রব্যের অংশ কেড়ে নিয়ে কুসীদজীবীদের কাছে কিছু বেশ কিছু পুঁজি সঞ্চিত হয়েছিল। আর ছিল বাণিজ্যিক পুঁজি। অনেক দিন ধরে বণিকরা তাদের বিশেষ কাজের মধ্য দিয়ে অন্যের উৎপাদনের যে অংশটা পেয়ে থাকেন তার একটা অংশ সঞ্চিত হচ্ছিল বাণিজ্যিক পুঁজি হিসাবে। এগুলিও পুঁজিবাদী উৎপাদনের প্রাথমিক পুঁজি হিসাবে ব্যবহার হতে থাকে। অবশ্য তার আগে তাদের শৃঙ্খল ভাঙার কাজটি করতে হয়েছে। কিন্তু সে অন্য প্রশ্ন।

কিন্তু বণিকদের এই পুঁজি এসেছে কোন্ বাণিজ্য থেকে? অনেক ক্ষেত্রেই তা এসেছে বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে। সেই সময়ে বিদেশে বাণিজ্য, লুণ্ঠন ও বিজয়ের সম্পর্ক ছিল খুব ঘনিষ্ঠ। তাই বণিক পুঁজির বিষয়টি এর পরের অধ্যায় থেকে বিযুক্ত করে দেখা যাবে না।

প্রত্যক্ষ উৎপাদকদের কাছ থেকে লুণ্ঠন : দেশের বাইরে

মার্কস এ সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে বলেছেন,

> আমেরিকায় সোনা ও রুপো আবিষ্কার, সেই মহাদেশের স্থানীয় মানুষদের ধ্বংস, দাসকরণ ও খনিতে তাদের কবর দেওয়া, ভারত বিজয় ও লুণ্ঠনের সূত্রপাত, এবং আফ্রিকাকে কালো চামড়ার (মানুষদের) বাণিজ্যিক শিকারের সংরক্ষিত এলাকায় পরিণত করা— এগুলিই হলো পুঁজিবাদী উৎপাদনের উষাকালের বিশেষ দিক।

আমরা বিষয়গুলি নিয়ে একটু বিশদে যাব।

প্রথমত আমেরিকায় সোনা ও রুপো আবিষ্কার। ১৪৯২ সালে ইউরোপ থেকে পশ্চিম দিক দিয়ে এশিয়ায় পৌঁছনোর চেষ্টায় কলম্বাস সমুদ্রযাত্রা করেন। তাঁর পেছনে ছিল স্পেনের রাজদরবার। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল এশিয়ার সঙ্গে সরাসরি বাণিজ্য। মনে রাখতে হবে, তখনো ইংল্যান্ড, এমনকি নেদারল্যান্ডের বিজয় অভিযান শুরু হয় নি। পর্তুগাল ও স্পেনই ইউরোপে বেশি শক্তিশালী, বেশি এগিয়ে থাকা— বিশেষত সমুদ্রপথে তো বটেই। কিন্তু ইউরোপ আর এশিয়ার মাঝখানে আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে ছিল আর এক ভূখণ্ড, ইউরোপ (বা এশিয়া) যার খোঁজ জানত না। সেই ভূখণ্ডটির নাম আমেরিকা। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা। প্রায় উত্তর মেরু থেকে প্রায় দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত যার বিস্তৃতি।

প্রায় প্রথম দিন থেকে কলম্বাসরা সেখানে সোনার সন্ধান শুরু করেন। প্রথমে তারা যান ক্যারিবিয়ানের হিস্পানিওলা দ্বীপে। সেখানে সোনার খনি ছিল না। কিন্তু কিছু কিছু নদীতে বালির সঙ্গে মিশে স্বর্ণকণা থাকত। কলম্বাসরা সেখানকার অধিবাসীদের সঞ্চিত স্বর্ণালংকার লুঠ করার পর তাদের নির্যাতন করতে থাকেন যাতে তারা অন্য কাজ ছেড়ে সারা দিন নদীতে স্বর্ণসন্ধান করতে বাধ্য হয়। এভাবে তাঁরা বেশ খানিক সোনা লাভ করেন। পাশাপাশি কলম্বাসরা সেখানকার অধিবাসীদের ধরে দাস হিসেবে ইউরোপে রপ্তানি করতে থাকেন। এই নির্লজ্জ প্রত্যক্ষ লুণ্ঠনকে বাণিজ্য বলা কঠিন।

কলম্বাসদের এই স্বর্ণসন্ধানে সেখানকার অধিবাসীরা কয়েক দশকের মধ্যেই বিলুপ্ত হয়ে যান। তখন আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাস এনে সেখানে শুরু হয় আখ চাষ। চিনি তখন খুব দামী পণ্য। ইউরোপে তার চাহিদাও ক্রমবর্ধমান। সেটা ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধ।

ক্যারিবিয়ানের পর মূল ভূখণ্ডে ঢুকল স্পেনীয়রা। তাদের প্রথম বিরাট বিজয় হলো মেক্সিকোতে আজতেক সাম্রাজ্য জয়। এই বিজয়ের পথে ও বিজয়ের পর তারা প্রচুর সোনা ও রুপো লুঠ করে ও উপঢৌকন পায়। আজতেকরা বহু দিন ধরে সোনা রুপোকে ধাতু হিসাবে ব্যবহার করে আসছিল শিল্প গড়তে, অলংকার হিসাবে ইত্যাদি। লৌহ-পূর্ব আজতেক সমাজের অনেক প্রজন্মের সঞ্চয় লুঠ হয়ে যায় স্পেনীয়দের হাতে, যাদের কাছে এসব সোনা শিল্পকর্ম নয়, টাকা। সব গলিয়ে সোনা রুপোর বাঁট বানিয়ে পাঠানো হয় স্পেনে। এটা ১৫১৮-২০ সাল।

এর চেয়েও বড় সোনা-রুপোর ভাণ্ডারের দখল পায় স্পেনীয়রা ১৫৩২ সালে, যখন ফ্রান্সিসকো পিজারোর নেতৃত্বে এক স্প্যানিশ বাহিনী দক্ষিণ আমেরিকার ইনকা সাম্রাজ্যে (পেরু, ইকুয়েডর, বলিভিয়া প্রভৃতি এলাকায়) গিয়ে ইনকা সম্রাট আতাহুয়ালপাকে পণবন্দি করতে সক্ষম হয়। মুক্তিপণ হিসাবে তারা পায় ২২ ফুট লম্বা ১৯ ফুট চওড়া একটি ঘর ভর্তি সোনা, আর ঐরকম দুটি ঘর ভর্তি রুপো। বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুক্তিপণ পেয়ে সম্রাটকে ছেড়ে দেওয়া হয় না, স্পেনীয়রা আরও সোনার সন্ধানে এগিয়ে যায়, ইনকা সাম্রাজ্য দখল ও লুঠ শুরু করে।

এর পর ১৫৪৫ সালে বলিভিয়ার পোতোসিতে আবিষ্কার হয় সর্ববৃহৎ রৌপ্যখনি। এই আবিষ্কারও ইউরোপীয়দের নয়, স্থানীয় মানুষের। পোতোসি-র খনি আবিষ্কারের ফলে ইউরোপে রুপো আসার পরিমাণ বহুগুণ বেড়ে গেল, সোনা আমদানিকে ছাপিয়ে গেল। সোনার মতো রুপোও সাধারণ ধাতু নয়, রুপো হলো টাকা। সব মিলিয়ে ইউরোপে অনেক সোনা রুপো এল, যেগুলো তাদের অর্জিত সম্পদ নয়, লুঠের মাল। এগুলি সবই পুঁজিবাদের আদি পুঁজি হিসাবে কাজে লেগেছে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে। আর এর জন্যও রুপো ও পারদ খনিতে বহু লক্ষ মানুষের প্রাণ দিতে হয়েছে। সংখ্যাটি ঠিক কত তা নিয়ে অবশ্য বিতর্ক আছে। মোটের ওপর ৩০-৮০ লক্ষ আদি আমেরিকাবাসীদের প্রাণ দিতে হয়েছে এই রুপো তোলা ও তা

পারদ দিয়ে পরিশ্রুত করার কাজে।

কত সোনা-রুপো? স্পেনের সেভিল শহরে সরকারিভাবে ১৫০৩ সাল থেকে ১৬৬০ সাল পর্যন্ত রুপো এসেছে ১,৬০, ৯৯৯ কেজি, আর সোনা এসেছে ১,৮৫,০০০ কেজি।

এগুলি হলো প্রকৃতির সম্পদ, যা স্থানীয় মানুষদের শ্রমে যা সামাজিক সম্পদে রূপান্তরিত হয়েছিল। লুঠ করে যেগুলি নিয়ে যাওয়া হলো ইউরোপে। প্রধানত স্পেনে। স্পেন অবশ্য এই সোনারুপো দিয়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভিত গড়ে নি। অশেষ সম্পদের অধিকারী হয়েও তারা যুদ্ধে ও জমিদার-সুলভ বিলাসব্যসনে এই অর্থ ব্যয় করেছে। কিন্তু স্পেনের এই লুঠের ভাণ্ডারের অংশ পেল ইউরোপের অন্য দেশগুলিও। কারণ বাণিজ্য। ইউরোপের অন্য দেশগুলি, বিশেষ করে নেদারল্যান্ড, আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যে প্রধান স্থান অধিকার করে ছিল। ইউরোপের সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্যের এক-তৃতীয়াংশ ছিল ওলন্দাজ ও ফ্লেমিশ বণিকদের হাতে। ইংরেজদের হাতে ছিল এক-দশমাংশ, অর্থাৎ ১০ শতাংশ।

বলা বাহুল্য, শুধু সোনা-রুপো নয়, আমেরিকা থেকে আরও অনেক সম্পদ এসেছে ইউরোপে। প্রথমে স্পেনের হাত ধরে। ১৫০১ সাল থেকেই ক্যারিবিয়ানের দ্বীপে আখ চাষ শুরু হয়ে গেছে। তারপর এসেছে পর্তুগিজরা, ব্রাজিলে। তার পরে তো ওলন্দাজ, ফরাসি, ইংরেজ— কেউ বাকি থাকে নি। পরে আমেরিকায় দাস শ্রমে শুরু হয় তুলো উৎপাদন। ইউরোপের পুঁজিবাদী উৎপাদনের প্রথম দিকে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল বস্ত্রশিল্প, আর তার জন্য তুলো এসেছিল আমেরিকা থেকে, আর পরবর্তীকালে ভারতের উপর ব্রিটিশ নখর গভীর হয়ে বসে যাওয়ার পর ভারত থেকে। আমেরিকায় তুলো উৎপাদন হতে থাকে সেখানকার বাসিন্দাদের থেকে কেড়ে নেওয়া জমিতে আর আফ্রিকা থেকে শিকার করে আনা কালো মানুষদের শ্রমে উৎপাদিত (এই বিশেষ তুলোটিও এশিয়া বা ইউরোপের নয়, মেক্সিকোর)।

এবার আসি দাস ব্যবসায়। আধুনিক ইতিহাসে দাস ব্যবসা আর কলোনি পত্তন (কলোনি বলতে আমি কেবলমাত্র সেগুলিকে বোঝাচ্ছি যেখানে ইউরোপীয়রা গিয়ে সরাসরি জমি দখল করে বসবাস করেছে, শহর-বন্দর গড়েছে) এসেছে হাত ধরাধরি করে। প্রথম পত্তনিদার পর্তুগাল।

পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই পর্তুগাল আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ধরে দক্ষিণে যেতে শুরু করে। উদ্দেশ্য, আফ্রিকা ঘুরে এশিয়ায় পৌঁছনো। ১৪৫২ সালে পোপ একটি নির্দেশনামা দিয়ে "সারাসেন্স (মুসলমান), পেগান ও অন্যান্য অ-বিশ্বাসী" অর্থাৎ সমস্ত অ-খ্রিস্টানদের পুরুষানুক্রমে দাস বানানোর অধিকার দেন পর্তুগালকে। ফলে ক্যাথলিক পর্তুগাল দাস ব্যবসা চালানোর 'নৈতিক' অধিকার পেয়ে যায়। আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ধরে দক্ষিণে যেতে যেতে তারা স্থানে স্থানে বন্দর-শহর পত্তন করে এবং অন্যান্য ব্যবসার সঙ্গে দাস ব্যবসায় মন দেয়। ১৪৪৪ সালে পর্তুগালের লাগোস শহরে আফ্রিকা থেকে আনা দাসদের বাজার তৈরি হয়ে যায়। চতুর্দশ শতকে বিশাল প্লেগের ফলে ইউরোপে কাজ করার লোকের অভাব ঘটেছিল। ফলে ক্রেতার অভাব হয় নি। পর্তুগালের রাজদরবার এই ক্রয়বিক্রয়ের ২০ শতাংশ পেত কর হিসেবে। ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য দাস বিক্রির মূল জায়গা হয়ে ওঠে আমেরিকা, বিশেষত আমেরিকার পর্তুগিজ কলোনি, ব্রাজিল।

স্পেনীয়দের পরপরই আমেরিকায় আসে পর্তুগিজরা। স্পেনীয়রা আমেরিকায় আসার পরেই পোপ অ-খ্রিস্টান বিশ্বকে স্পেন আর পর্তুগালের মধ্যে 'ভাগ' করে দিয়েছিলেন। সেই ভাগাভাগিতে ব্রাজিল পড়ে পর্তুগালের ভাগে।

ভাগের অংশ বুঝে নিতে কলম্বাসের আমেরিকার আগমনের আট বছর পর ১৫০০ সালেই পর্তুগিজরা ব্রাজিলে আসে। কলোনি পত্তন করতে করতে অবশ্য ১৫৩২-৩৪ সাল হয়ে যায়। আফ্রিকা থেকে আনা দাস শ্রমে পর্তুগিজরা ব্রাজিলে আখ চাষ শুরু করে। আমেরিকার আদি বাসিন্দাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া জমি আর আফ্রিকার মানুষের শ্রম দিয়ে আখ চাষ। শুধু চাষ নয়, ১৫৪০ সালেই ব্রাজিলের পর্তুগিজ কলোনিতে তৈরি হয়ে গেছে ৮০০টি চিনি কল। ১৫৫০ সালে দেখা যাচ্ছে আমেরিকার স্প্যানিশ ও পর্তুগিজ কলোনি মিলিয়ে ৩০০০টি চিনি কল।

এই চিনিকলগুলি ইউরোপীয়দের জিহ্বাকেই শুধু আনন্দ দেয় নি, এগুলি লোহার নানা কলকব্জা, যন্ত্রপাতির একটা বিরাট চাহিদা সৃষ্টি করে। এই চাহিদা ইউরোপে যন্ত্রাংশ তৈরির শিল্পকে উজ্জীবিত করে।

আবার ফিরে আসি দাসদের ব্যাপারে। দাসদের ক্ষেত্রে স্পেনীয়রাও খুব পিছিয়ে ছিল না। ১৫০১ সাল থেকেই তারা আমেরিকায় আফ্রিকান দাস আমদানি করতে শুরু করে। ১৪৯২ সালে স্পেনীয়রা হিস্পানিওলায় পা দেওয়ার পর থেকেই আমেরিকার স্থানীয় মানুষদের জনসংখ্যা দ্রুত কমতে থাকে। সোনার জন্য তাদের অতি-পরিশ্রম করানো, চাষবাস খাদ্য উৎপাদনে সময় দিতে না পারা, অত্যাচার, উদ্বাস্তুকরণ এবং সরাসরি হত্যা— এসব মিলিয়ে হিস্পানিওলার স্থানীয় বাসিন্দাদের জনসংখ্যা কমতে থাকে সেই ১৪৯২ সাল থেকেই। কয়েক মিলিয়ন থেকে কয়েক হাজার। তারপর ১৫১৭ সালে গুটিবসন্তের আক্রমণের পর তারা তো বিলুপ্তির পথেই এগিয়ে যায়। সে না হয় গেল, কিন্তু শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের আখচাষ করবে কে? সেই জন্য আফ্রিকা থেকে দাস আনা শুরু হয়।

সেই প্রথা চলতেই থাকে। ইংরেজরা যখন উত্তর আমেরিকায় উপনিবেশ গড়ে, তারও ভিত্তি ছিল চাষ। তামাক চাষ, তুলো হতো পুরোটাই আফ্রিকা থেকে আনা দাসদের (এবং তাদের সন্তানসন্ততিদের) শ্রমের ওপর নির্ভর ক'রে।

সেই প্রথা চলতে থেকেছে আড়াইশো বছর ধরে। সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় প্রকাশ, ১৫০০ সাল থেকে ১৮৪০

সালের মধ্যে মোট ১.১৭ কোটি আফ্রিকানকে আমেরিকায় চালান দেওয়া হয়েছে। আমেরিকা যাত্রাকালে মারা গেছেন বহু আফ্রিকান। বলা হয় আফ্রিকা থেকে জাহাজে করে গরু-ছাগলের মতো করে দাস নিয়ে যাওয়ার সময় তাদের ২০ শতাংশ প্রাণ হারাতেন।

আফ্রিকা থেকে আনা দাসদের শ্রমই আমেরিকার স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া জমিতে সোনা ফলিয়েছে। তার উদ্বৃত্ত কিছু ভোগ করেছে স্থানীয় ইউরোপীয়রা, বাকিটা গেছে ইউরোপে। আমেরিকার সোনা রুপোর পাশাপাশি, আমেরিকার লুণ্ঠিত প্রাকৃতিক সম্পদ আর আফ্রিকা থেকে লুণ্ঠিত মানবসম্পদ এভাবেই পুঁজিবাদের প্রথম প্রহরে পুঁজির যোগান দিয়েছে। শুধু তাই নয়, আমেরিকার কলোনিগুলি পুঁজিবাদী উৎপাদনের জন্য চাহিদার সৃষ্টি করেছে। কখনও সে চাহিদা কলোনির পয়সাওয়ালা সাদা মালিকদের জন্য ভোগ্যপণ্যের চাহিদা, কখনও আবার যন্ত্রাদির চাহিদা। চিনিকলের যন্ত্রাদি, খনির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি, কৃষি যন্ত্রাদি।

তবে শুধু আমেরিকা আর আফ্রিকা নয়, আমাদের দেশ ভারতের কথা ভুললে চলবে না। ষোড়শ শতাব্দীতে মুঘল আমলে বিশ্বের মোট উৎপাদনের এক-চতুর্থাংশই উৎপাদিত হয় ভারতে। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে আকবর বাদশার কোষাগারে প্রতিবছর রাজস্ব জমা হতো ১.৭৫ কোটি পাউন্ড। ১৭০০ সালে বাদশা আওরঙজেবের আমলে বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১০ কোটি পাউন্ডের বেশি। (১৮০০ সালে গ্রেট ব্রিটেনের রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১.৬ কোটি পাউন্ড)। এই বিশাল পরিমাণ রাজস্ব আসলে সেসময়ের ভারতের সমৃদ্ধির কথা বলে, যে সমৃদ্ধি একের পর এক ইউরোপীয় বণিকদের এদেশে টেনে এনেছে বাণিজ্যের জন্য। ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফরাসি, ড্যানিশ, স্কট, কে নয়!

এর মাত্র ৫৭ বছর পর, ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে ইংরেজদের জয় ভারতের অর্থনীতিতে বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এল। ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা-র রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করে। এতদিন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্রিটেন থেকে সোনারুপো নিয়ে এসে ভারতের জিনিস কিনে ব্রিটেনে পাঠাত। সোনারুপো নিয়ে আসা এবার বন্ধ হয়ে গেল।

শুধু তাই নয়, এতদিন ভারত রপ্তানি করত শিল্প পণ্য, মূলত সূক্ষ্ম সুতি ও সিল্ক বস্ত্র। পলাশির যুদ্ধের একশো বছর পর, উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে দেখা যাচ্ছে ভারত রপ্তানি করছে শুধু কাঁচামাল— কাঁচা তুলো, আফিম, নীল। ব্রিটিশদের তৈরি বস্ত্র আমদানি হচ্ছে ভারতে।

কী করে এই অসম্ভব সম্ভব হলো? ব্রিটিশ রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে, কর নীতি দিয়ে। উনবিংশ শতকের গোড়ায় ব্রিটেনে
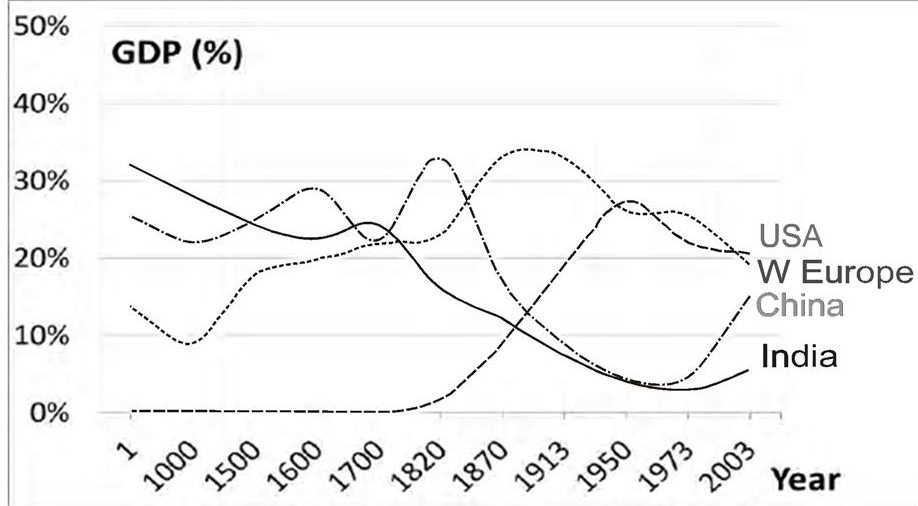
বিশ্ব জিডিপি-তে ভারত, চীন, পশ্চিম ইউরোপ, ও আমেরিকা-র অবদান (১০০০-২০০৩)
ভারত ও চীনের সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপের সম্পর্ক উল্টে যাওয়ার পেছনে যতটা অবদান আছে
ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের, ভারত ও চীনের বি-শিল্পায়নের অবদান তার থেকে কম নয়

সূত্র : এ ম্যাডিসন, কনট্যুরস অফ ওয়ার্ল্ড ইকনমি

ভারতীয় সিল্ক বা সুতি বস্ত্রের উপর কর দিতে হতো ৭০-৮০ শতাংশ, আর ব্রিটেন থেকে ভারতে বস্ত্র আনার কর ছিল ২-৪ শতাংশ। ফলে ব্রিটেনের শিল্প উৎপাদনের জন্য দেশের বাজার বাড়ে, ভারতেও সে দেশের বস্ত্রের বাজার তৈরি হয়। পাশাপাশি ব্রিটেনের বস্ত্রশিল্পের জন্য কাঁচামাল তুলোর যোগান দিতে থাকে বি-শিল্পায়িত ভারতবর্ষ।

অন্য অনেক পণ্যের ক্ষেত্রেও একই ধরনের ঘটনা ঘটে। পলাশির যুদ্ধের আগে ১৭৫০ সালে যেখানে বিশ্বের শিল্প উৎপাদনের ২৫ শতাংশ হতো ভারতে, দেড়শো বছরের ব্রিটিশ শাসনের পর ১৯০০ সালে সেই হারটি হয়ে দাঁড়ায় ২ শতাংশ।

কর আদায়, অসম বাণিজ্য, সব মিলিয়ে ভারত থেকে প্রচুর সম্পদ পাচার হয় ব্রিটেনে। জেভিয়ার কুয়েনসা এস্তেবান হিসাব করে দেখিয়েছেন, ১৭৮৪-৯২ সালের মধ্যে ভারত থেকে ব্রিটেনে নিট সম্পদ যায় বছরে ১০ লক্ষ পাউন্ডের বেশি।

একদিকে ভারত থেকে সম্পদ অপহরণ এবং অন্যদিকে ভারতের বি-শিল্পায়নের মাধ্যমে ভারতকে শিল্পক্ষেত্রে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকা থেকে নামিয়ে শিল্পপণ্যের নিট বাজারে পরিণত করা হয়। এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ধাত্রী ছিল বলপ্রয়োগ, যুদ্ধ।

ছোট করে ওলন্দাজদের কথাও বলা যায়। তাদের লুঠের মূল ক্ষেত্র ছিল ইস্ট ইন্ডিজ। ১৬০২ সালে পত্তন হয় ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ঘাঁটি। মূলত ইস্ট ইন্ডিজ ও ভারত থেকে মশলা রপ্তানি দিয়ে শুরু করলেও এই ঘাঁটিগুলি পরবর্তীকালে চীনের সঙ্গে বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। এদের বাণিজ্যের মুনাফা ছিল ১৮ শতাংশ। পরে অবশ্য মুনাফার হার কিছু কমে যায়, কিন্তু বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়ার কারণে সেই 'ক্ষতি' পুষিয়ে যায়।

আর্নেস্ট মেন্ডেল দেখিয়েছেন, আমেরিকার থেকে লুঠ করে আনা সোনা-রুপো, ১৬৫০ সালের পরবর্তী ১৩০ বছরে ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লুঠ, অষ্টাদশ শতকে দাস ব্যবসায় ফরাসিদের ধনলাভ, ব্রিটিশ ক্যারিবিয়ানে ব্রিটিশদের দাস ব্যবসা আর ভারতকে লুণ্ঠন করে পাওয় সম্পদ, ১৮০০ সাল পর্যন্ত এগুলি যোগফল ইউরোপের সব বাষ্পচালিত শিল্পে মোট বিনিয়োগের চেয়ে বেশি।

অর্থাৎ এক কথায়, পশ্চিম ইউরোপে পুঁজিবাদের পত্তন ও শিল্প বিপ্লবের পেছনে আছে আমেরিকা, ভারত ইত্যাদি জায়গার মানুষের জমি-সম্পদ-সোনারুপো লুঠ, সেসব দেশের বি-শিল্পায়ন ইত্যাদি। এ আলোচনায় চীনের কথা আনা গেল না। ভবিষ্যতে সেটা করা যাবে।

উপসংহার

মার্কস বলেছেন, পুঁজিবাদী মুনাফার উৎস দুটি, জমি আর শ্রমশক্তি। জমি বলতে জল-জমি-জঙ্গল-খনি থেকে শুরু করে আজকাল আকাশ-বাতাসকেও ধরতে হবে (২জি স্ক্যাম তো আকাশ বিক্রি করা নিয়েই)। পুঁজিবাদী মুনাফার শুধু নয়, পুঁজিবাদ-পূর্ব আদি পুঁজি জোগাড়ের ক্ষেত্রেও জমি আর শ্রমশক্তি দিয়ে উৎপাদিত সম্পদ লুঠই প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। সে লুঠ পশ্চিম ইউরোপের নিজের দেশে হোক, বা বিদেশে, সারা বিশ্ব জুড়ে।

কিন্তু আদি সঞ্চয়ের পর পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা জোরদার হওয়ার পরও সে লুঠের পালা শেষ হয় নি। পুঁজিবাদী উৎপাদনের সংকট মেটাতে বার বার পুঁজিবাদের চোখ পড়ে পুঁজিবাদের বহিস্থ এই সব সম্পদ ভাণ্ডারের দিকে। লুঠের নতুন পালা শুরু হয়। সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে।

ধনতন্ত্রে অসাম্য : থমাস পিকেটির মার্ক্সীয় পাঠ

৬০ পৃষ্ঠার পর

কাজে লাগিয়ে অন্যায় সুবিধা গ্রহণ ইত্যাদি।

পিকেটি নিজেকে মার্কসবাদীদের থেকে আলাদা করেছেন, কিন্তু এই অভূতপূর্ব অসাম্যের অবস্থাটির জন্য উনি যে ব্যাখ্যা খাড়া করেছেন, কার্ল মার্কস এবং অন্যান্য মার্কসবাদী চিন্তকরা বহুদিন আগে থেকেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অসাম্য বৃদ্ধির কারণ হিসেবে ওনার চেয়েও ঢের ভালো এবং নির্ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে আসছেন। কিন্তু আমাদের কাছে এত সুন্দর তথ্যের ভাণ্ডার ও তথ্যের বিশ্লেষণটি মজুত ছিল না।

উনি শেষমেশ যে সম্পদের ওপর ট্যাক্স চাপানোর কথা বলেছেন সেটা পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ঘেরাটোপে থেকে করা প্রায় অসম্ভব। এর জন্য চাই বৃহৎ গণআন্দোলন। আন্দোলন ব্যতিরেকে এই ধরনের কোন পদক্ষেপ নেওয়া কোন সরকারের পক্ষেই এই ব্যবস্থার মধ্যে সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ, আজকের বাস্তবতার নিরিখে কৌশলগতভাবে পৃথিবীব্যাপী সম্পদের ওপর কর চাপানোর দাবিটিকে নিয়ে এগোনো যায় কিনা সেটা আজকের গণআন্দোলনের সাথে যুক্ত মার্কসবাদীরা অবশ্যই ভেবে দেখতে পারেন এবং পিকেটি-র বই থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভাণ্ডার সেক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করতে পারে।

পিকেটি ওনার বইতে নিজেকে মার্কস-এর থেকে যেমন দূরে সরিয়ে রেখেছেন, অন্যদিকে উনি মূলধারার বুর্জোয়া অর্থনীতির তত্ত্বগুলিকেও প্রভূত সমালোচনা করেছেন— যা তাঁর বইটির বেস্ট সেলার হওয়া এবং বহুচর্চিত হওয়ার কারণ। কিন্তু সমালোচনা করলেও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পন্থা হিসেবে উনি সেই বুর্জোয়া অর্থনীতির বিভিন্ন কাল্পনিক ধারণাকেই ব্যবহার করেছেন।

শেষ বিচারে বলা যায় যে পিকেটি যেহেতু মার্ক্সীয় ব্যাখ্যাগুলিকে এড়িয়ে গেছেন তার জন্যই ওনার বইটি বাজারে বাণিজ্যিক ভাবে এবং মূলধারার অর্থনীতিবিদদের কাছে সমাদৃত হয়েছে ও সাফল্য লাভ করেছে। আবার অন্যদিকে এই একই কারণে তাত্ত্বিকভাবে অসাম্যের ব্যাখ্যার দিক থেকে যথেষ্ট দুর্বলতা রয়ে গেছে।

ধনতন্ত্র ও পরিবেশ

অরিজিৎ

'মানব সভ্যতা'র ইতিহাসের প্রথম দিন থেকেই পরিবেশ-মানুষ সম্পর্কের ভারসাম্যে পরিবর্তনের শুরু। পরিবেশের নিয়মগুলো অনুধাবন করা এবং খাপ খাইয়ে নেওয়ার ভাবনাও পাশাপাশি চলেছে। হাজার হাজার বছর ধরে এ প্রক্রিয়া ছিল খুবই মন্থর, ফলে সে পরিবর্তন ছিল নিয়ত পূরণীয়। বিগত কয়েক শতকে পুঁজিবাদের দ্রুত বিকাশের সাথে সাথে ভারসাম্যের পরিবর্তন বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে ও গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে— যা অনেকেই অপূরণীয় বলে মনে করছেন, সুস্থিত অবস্থায় ফিরে আসার চৌকাঠ পেরিয়ে গিয়েছে বলেও বোধ করছেন কেউ কেউ। এ সমস্যার অন্তঃস্থলে রয়েছে অতীত দিনে পরিবেশকে প্রভু হিসেবে মানুষের ওপর আধিপত্য করতে দেখার মানসিকতা যা প্রকৃতির নিয়মগুলোকে অনুধাবনের সাথে সাথে সভ্যতার চালিকাশক্তির চেতনাকে ঠেলে দিয়েছে প্রকৃতিকে জয় করে প্রকৃতির ওপর পাল্টা আধিপত্য কায়েম করার দিকে, সমঝোতার দিকে নয়। পুঁজিবাদ তাই তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুসারেই পরিবেশ বিরোধী।

পরিবেশ সমস্যা নিয়ে আলোচনা বিগত কয়েক দশকে বিশ্বব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পরিবেশের সমস্যা পুঁজিবাদের অভ্যন্তরেই এমন গোলমাল তৈরি করছে যে এই ব্যবস্থাতেই দাঁড়িয়ে পুঁজিবাদ পরিবেশ নিয়ে ভাবতে বাধ্য হচ্ছে কোথাও কোথাও। নেহাতই টেকনিক্যাল একটা সমস্যা হিসেবে দেখে কিছু ক্ষতে প্রলেপ লাগানোর কাজও করছে বটে, তাতে যে এই সংকটের থেকে পরিত্রাণের পথ নেই তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আশার কথা বিগত কয়েক দশকে পুঁজিবাদ বিরোধী আন্দোলনের বিভিন্ন রূপ যেভাবে মুখ থুবড়ে পড়েছে তাতে নতুন করে অক্সিজেন জোগাচ্ছে পরিবেশ আন্দোলন। বৌদ্ধিক জগত তো বটেই, সিংহভাগ বিস্থাপন বিরোধী আন্দোলনেরও সূত্রপাত হচ্ছে পরিবেশ চেতনার হাত ধরে। নয়া উদারনৈতিক ব্যবস্থায় উন্নতির সিঁড়ির মরীচিকা দেখা নব্য প্রজন্মের কাছেও বাকি প্রশ্নগুলোর তুলনায় পরিবেশ প্রশ্নকে ঘিরে পুঁজিবাদের স্বরূপ উন্মোচনের কাজ অনেকক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হচ্ছে। যদিও শ্রেণীচেতনাবিহীন পরিবেশ আন্দোলনের ধারণা পুঁজিবাদী দর্শনের হাতকেই শক্ত করছে। পুঁজিবাদও তাই পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনকে না আটকিয়ে তত দূর অবধিই বিকশিত হতে দিচ্ছে যাতে সে আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতার রূপ না নেয়।

অতীতের ব্যবস্থাগুলোর তুলনায় পুঁজিবাদে বস্তু উৎপাদনের বহু পার্থক্যের মধ্যে মূল সূচকটি হল মুনাফার জন্য উৎপাদন। বস্তুগত পণ্য উৎপাদনে শ্রম যেমন একটি উৎস, প্রাকৃতিক সম্পদও তেমন আরেকটি। শ্রমশক্তিকে মূল্য দিয়ে কিনতে হলেও প্রাকৃতিক রসদকে কোনো মূল্য না দিয়েই আহরণ করা যায়— বিনামূল্যে যত বেশি জিনিস পাওয়া যায় মুনাফাও তত বেশি — এ ব্যবস্থার সংজ্ঞা অনুসারেই এই কার্যক্রমকে বলা যায় সমাজ থেকে লুঠ, যা কার্যত পুঁজিতন্ত্রের শোভন রূপটিকে অপ্রমাণিত করে। প্রাকৃতিক সম্পদ যতদিন যৌথ কিংবা সাধারণের সম্পত্তি ছিল ততদিন অবধি সেই সম্পদ ভোগের জন্য কোনো পরিবেশগত সংকট ঘনীভূত হয়নি, কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তির উৎপত্তির (যা পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য স্বরূপ) সাথে সাথেই এই সংকট দ্রুতহারে বাড়তে শুরু করেছে।

বিপাকীয় ফাটল

পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হওয়া সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে বিপাকীয় ফাটল (Metabolic Rift)তত্ত্ব। কৃষি রসায়নবিদ ইয়ুস্টুন ফন লীবিগের এই তত্ত্ব (যা মার্কসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল) অনুসারে পুঁজিবাদী উৎপাদন সবচেয়ে রিক্ত করে মাটির মৌলিক উপাদানসমূহকে। খাদ্য এবং তন্তু হিসেবে মাটির উপাদানগুলো ভিড় জমায় শহর এমনকি উন্নত দেশগুলোতে আর গ্রামাঞ্চলের মাটি হয় নিঃস্ব; সেই সঙ্গে শহরে এগুলো অতিমাত্রায় ব্যবহার দূষণ বাড়ায় যা কখনোই আর মাটিতে ফিরে আসে না অথচ এই উপাদানগুলোই মাটির প্রধান পুষ্টির উৎস। ফলে তৈরি হয় এক অপূরণীয় ফাটল। গ্রাম-শহরের পার্থক্য প্রকট হয়েছে পুঁজিতন্ত্রের নিয়মেই— এ তার অমোঘ ফল আর তার সাথে যুক্ত হয়েছে পুঁজির অন্য একটি চরিত্র— মুনাফা এবং দ্রুত হারে মুনাফা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন ফসল চাষ, যা চক্রাকারে নানান পুষ্টিগুণ মাটিতে ফিরিয়ে আনত, তার বদলে এসেছে উচ্চ ফলনশীল চাষ এবং প্রতিবছর একই ফসল চাষ— যা এই ফাটলকে বাড়িয়ে তুলেছে। প্রাথমিকভাবে গুয়ানো দ্বীপের পক্ষীবিষ্ঠা বা ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে হাড় নিয়ে এসে এ সঙ্কট মোচনের চেষ্টা হলেও তা কোনো স্থায়ী সমাধান ছিল না। বরং উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলো গুয়ানো পক্ষীমলের অধিকার নিয়ে পারস্পরিক যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যায়— দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে কীটনাশক আর রাসায়নিক সার প্রয়োগের মাধ্যমে এ সংকটের পরিত্রাণের পথ বের হয় যা মূলত এক রাসায়নিক যুদ্ধে পর্যবসিত হয় এবং পরিবেশের সঙ্কটকে আরো প্রকট করে।

অজৈব রাসায়নিক বিপদ

অজৈব রাসায়নিক প্রয়োগের বিপদ সংক্রান্ত কাজের ব্যাপারে পথিকৃত র‍্যাচেল কার্সন-এর ১৯৬২তে প্রকাশিত 'সাইলেন্ট স্প্রীং' গ্রন্থটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হাজারো রকমের গোলা-বারুদ ইত্যাদি রাসায়নিক অস্ত্র তৈরির জন্য নির্মিত কারখানাগুলোকেই

যুদ্ধ পরবর্তীতে পরিণত করে ফেলা হয় সার ও কীটনাশক তৈরির ফ্যাক্টরিতে— কৃষি সমস্যা মেটানোর বদলে একটা যুদ্ধক্লান্ত অর্থনীতিকে চাঙ্গা করাই মূল দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পুঁজিতন্ত্রের কাছে। নিত্য নতুন নানান অজৈব যৌগ, যার বেশির ভাগটাই জৈব প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষিত হয় না, তৈরি হতে থাকে তখন থেকেই, প্রকৃতিবান্ধব কিনা পরীক্ষিত হওয়ার আগেই বিপুল প্রয়োগ শুরু হয়ে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য প্রাকৃতিক নির্বাচন এমন কোনো যৌগকে গ্রহণ করেনি যা কোনো না কোনো জৈব উৎসচেক দ্বারা বিশ্লেষণযোগ্য নয়, অথচ পরীক্ষাগারে এমন প্রচুর যৌগ তৈরি হচ্ছে যেগুলি জৈব উৎসেচক দ্বারা বিশ্লেষণযোগ্য নয় (যেমন প্লাস্টিক, যেমন অনেক রাসায়নিক কীটনাশক); এগুলি ব্যাপক প্রয়োগের জন্য জটিল খাদ্যজালের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রাণীর শরীরে ঢুকে পড়েছে। ফল হচ্ছে মারাত্মক। পুষ্টি বৃদ্ধি জনিত সমস্যা থেকে শুরু করে ক্যানসারের মত মারণরোগ সহ নিত্য নতুন প্রচুর রোগের প্রকোপ বেড়েছে। স্ট্রনসিয়াম ৭০, আয়োডিন ১৩১, সিজিয়াম ১৩৭-এর মতো তেজস্ক্রিয় আইসোটোপগুলো মিউটেশন দ্বারা জিনের স্থায়ী বিকৃতি ঘটাচ্ছে, যা পরবর্তী প্রজন্মে জৈবসঞ্চয়ন ও জৈব বিবর্ধনের মাধ্যমে সঞ্চারিত হচ্ছে। নানান প্রতিরোধের ফলে ডিডিটি-র মত এক সময় বহুল ব্যবহৃত কীটনাশক নিষিদ্ধ হলেও তৃতীয় বিশ্বে তার উৎপাদন অব্যাহত। পেট্রোরসায়ন শিল্পের বাইপ্রোডাক্ট হিসেবে উদ্ভূত বহু পণ্য পুরনো পরিবেশ-বান্ধব দ্রব্যের বিকল্প (সাবানের বিকল্প ডিটারজেন্ট) হিসেবে হাজির করা হচ্ছে কেবলমাত্র নিত্য নতুন বাজার তৈরি আর বাজার টিকিয়ে রাখার উদগ্র বাসনা থেকেই।

গণবিলুপ্তি

পুঁজিবাদী উৎপাদন অবাধে ছুটে চলা ক্রমত্বরান্বিত ট্রেডমিলের মতো; সঞ্চয় আর মুনাফাকে বাড়িয়ে চলাই যার মুখ্য উদ্দেশ্য; ব্যবহারমূল্যের বদলে বিনিময় মূল্য তৈরি করাই যার লক্ষ্য; প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন (overproduction) যার পন্থা। আর স্বভাবতই এজন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আর শক্তির জোগানকে ক্রমাগত বাড়িয়ে চলতে হয়, ফলে চাপ পড়ে প্রকৃতির ওপরই। একদিকে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় খনিজ তেল, কয়লা কিংবা আকরিক তেমনই সঙ্কটের মুখে পড়ে জলসম্পদ। ভূমন্ডলের উপরিভাগকে ফালাফালা করে চিরে ফেলে বহুপ্রকার দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহারের বদলে সোনার ডিম দেওয়া হাঁসের পেট চিরে ফেলার গল্পের মত ক্ষণিকের মুনাফার পথে চ'লে আখেরে ধ্বংসের দিকেই ঠেলে দিচ্ছে এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। আর সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে জীবকূল। এহেন লুণ্ঠনের সামনে পড়ে বহুপ্রজাতি বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং অনেকেই বিলুপ্তির চৌকাঠে দাঁড়িয়ে। হিসেব বলে প্রতিদিন গড়ে ৭৪টা করে প্রজাতি বিলুপ্ত হচ্ছে। বিবর্তনের নিয়মে যেমন একটা প্রজাতি বিলুপ্ত হয় এবং নতুন প্রজাতি সৃষ্টি হয় বর্তমানের গণবিলুপ্তি তার কোনো অঙ্গ নয় এমনকি অতীত পৃথিবীর ইতিহাসে যে বড় পাঁচখানা গণবিলুপ্তির ঘটনা জানি যার শেষতমটিতে ডাইনোসরের সঙ্গে বিপুল জীবকূল উবে গিয়েছিল, বর্তমানের গণবিলুপ্তির হার নাকি অতীতের সেই সবকয়টি গণবিলুপ্তিকেই ম্লান করে দিয়েছে বলে বিজ্ঞানীদের অভিমত। কৃষিক্ষেত্রে উচ্চফলনশীলতাই টিকিয়ে রাখার একমাত্র মাপকাঠি, কোনো ক্ষতিকর গুণের দোহাই দিয়ে অপকারী প্রাণী বা উদ্ভিদকে ঝাড়ে-বংশে লোপাট করে দেওয়া হচ্ছে বাস্তুতন্ত্রের জটিলজালে তার সামগ্রিক ভূমিকা যাচাই করার আগেই, অপকারী জীব দমনের নামে নির্বিচারে উপকারী-অপকারী সবাইকে ধ্বংস করা হচ্ছে, কখনো-সখনো কোনো বিশেষ একটি ফলনের জন্য একটি ভৌগলিক অঞ্চলের সমস্তরকম বাস্তুতন্ত্রকে ধ্বংশ করে ফেলছে সৃষ্টিশীল ধ্বংসায়ন নাম দিয়ে। সমুদ্র (এমনকি গভীর সমুদ্রেও) সমগ্র খাদ্যশৃঙ্খল বরাবর মাছ শিকার হচ্ছে— ৭০ শতাংশ নোনাজলের প্রজাতি আজ বিপন্ন হয়ে পড়েছে। সর্বাপেক্ষা ক্ষতির সম্মুখীন বড় শিকারি মাছেরা, কারণ তারা বাঁচে বহু বছর, প্রজননের বয়সও শুরু হয় দেরিতে আর তাদের টিকে থাকা নির্ভর করে নিচের স্তরের প্রাণীদের অর্থাৎ খাদ্যবস্তুর সহজলভ্যতার ওপর। কিন্তু পুঁজিবাদ গোটা বিশ্বে টুনা, হ্যাডক, কড কিংবা ইলিশ জোগান দিতে গিয়ে গোটা খাদ্যশৃঙ্খল বরাবর মৎস্য শিকারে নেমেছে। পাশাপাশি, বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধির সাথে সাথে সমুদ্রের জলের অম্লতা বেড়েছে, যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে ক্যালসিয়াম খোল-যুক্ত শামুক কিংবা প্রবাল দ্বীপের বৃদ্ধির ওপর।

পরিবেশের সমস্যার সর্বাধিক চর্চিত বিষয় বিশ্ব উষ্ণায়ণ। এমনকি ওয়াকিবহাল মহলেও পরিবেশের ভারসাম্য নিয়ে বাকি বিষয়গুলো শিকেয় তুলে এই একটি এবং কেবলমাত্র একটি সমস্যা নিয়েই চিন্তিত হচ্ছে বেশিরভাগ মানুষ। বিতর্ক আর দৃষ্টিভঙ্গির ফারাকও আছে বিস্তর এই বিষয়টি নিয়ে। পরমাণু বিদ্যুতের প্রচারকরা কার্বন জ্বালানির সমস্যা নিয়ে তুখোড় যুক্তি হাজির করছে যা আপাত বিপদকে আটকাতে গিয়ে আখেরে নরকযাত্রার পথকে প্রশস্ত করছে। আবার চক্রাকারে প্রাকৃতিক নিয়মেই উষ্ণতার হ্রাস বৃদ্ধি হওয়ার তত্ত্বকে হাজির করে কার্বন জ্বালানি নিয়ে আতঙ্কিত না হওয়া বার্তা শোনাচ্ছে কেউ কেউ। সে বিতর্কের গভীরে প্রবেশ না করেই দায়িত্বশীল ধারাটিকে আমরা চিহ্নিত করে নিতে পারি। গত দুশো বছরে দ্রুত পরিমানে কয়লা-পেট্রোলিয়াম দহনের ফলে বাতাসে গ্রিন হাউস গ্যাস কার্বন-ডাই-অক্সাইড বেড়েছে শতকরা পঁচিশ শতাংশ, যার জন্য গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি ঘটেছে এক সেলসিয়াসের কিছু কম। যা আপাতদৃষ্টিতে সামান্য বলে মনে হলেও প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের কাছে যথেষ্ট দুশ্চিন্তার। কয়লার স্তর সৃষ্টির যুগগুলোর আগে এবং পরে পৃথিবীর তাপমাত্রার যে পরিবর্তন (উদ্ভিদ দেহের কার্বন তৈরী হয় বাতাসের কার্বন ডাই অক্সাইডকে শোষণ করে। হঠাৎ বিপুল বনভূমি চাপা পড়ে কয়লার স্তর সৃষ্টি হ'লে বাতাসে

কার্বন ডাই অক্সাইড কমে যায়, ফলে গড় তাপমাত্রাও হ্রাস পায়।) তা খুব এমন বেশী নয়, এমনকি শেষ তুষার যুগটিতেও তাপমাত্রা ছিল আজকের গড় তাপমাত্রার থেকে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। তাপমাত্রার সামান্য পরিবর্তন গোটা পৃথিবী এবং জীবকুলের পরিস্থিতির যে কী বিপুল পরিবর্তন ঘটাতে পারে তা অকল্পনীয়। তার থেকেও বড় ব্যাপার, বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধির সাথে তাপমাত্রার বৃদ্ধি পাওয়া কোনো সরলরৈখিক বিষয় নয়, তা আসলে শৃঙ্খল বিক্রিয়ার (Chain reaction) মাধ্যমে উষ্ণায়নের প্রক্রিয়াটি দ্রুত গতিতে বাড়িয়ে চলে। এই উষ্ণায়ন নিরক্ষীয় অঞ্চলের বিপুল বনভূমি আর সমুদ্রের শৈবালকে ধ্বংস করে, যা কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণের মাত্রাকে দারুণ খর্ব করবে, ফলে উষ্ণায়ণ বাড়বে। তার সাথে যোগ হবে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে মেরুমৃত্তিকা বা পার্মাফ্রস্ট (মেরু প্রদেশে বরফের মধ্যে জমে থাকা হাজার হাজার পুরোনো পচা-গলা প্রাণী বা উদ্ভিদের দেহাবশেষ) থেকে বিপুল মিথেন গ্যাস (যার গ্রীন হাউস প্রভাব কার্বন ডাই-অক্সাইডের এর চব্বিশ গুণ বেশি) বাতাসে ছাড়বে। সামান্য উষ্ণায়ন পরপর ঘটনাগুলোকে ক্রমাগত করে উষ্ণায়নের মাত্রাকে ত্বরান্বিত করে। অথচ এহেন পজিটিভ ফিডব্যাক রেসপন্সের চাকাকে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার মত কোনো প্রাকৃতিক পদ্ধতিরও খোঁজ পাচ্ছেন না বিজ্ঞানীরা।

এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ক্রমাগত স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যবস্থাটিকে টিকিয়ে রাখছে, বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যে কোনোক্রমেই এ সমস্যা থেকে উৎক্রমণের পথ খুঁজে পাচ্ছে না। অত্যধিক হারে উৎপাদন, অপ্রয়োজনীয়ভাবে পণ্যের আমদানি-রপ্তানি, গণপরিবহনের বদলে ছোট গাড়ির ব্যবস্থাকে ক্রমাগত উৎসাহিত করে চলা একটা ব্যবস্থা যে কেবল বর্তমানের মুনাফার স্বার্থ নিয়েই মেতে রয়েছে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দিকে তাকাচ্ছে না সেটা বলাই বাহুল্য।

এর দাওয়াই হিসেবে পুঁজিতন্ত্র যা হাজির করছে তা নিতান্তই কিছু প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, আর প্রচার চালাচ্ছে সাধারণ মানুষের গৃহস্থালি শক্তির ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করতে, চলছে কার্বন ক্রেডিট কেনা-বেচা নিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক তর্জা। বিপুল গ্রিন হাউস গ্যাসের নির্গমনের দায় গরিব দেশগুলোর ওপর চাপিয়েই প্রথম বিশ্ব হাত ধুয়ে ফেলতে চাইছে। অথচ একা মার্কিন দেশ পৃথিবীর ২৫ শতাংশের বেশি কার্বন নিঃসরণ করে, এবং সেটা পুঁজিবাদী পরিবেশবিধি মেনেই।

দূষণ ওদের গিলে খাক

সামগ্রিকভাবে দূষণকে আমাদের সামনে হাজির করা হয় এমনভাবে, যাতে মানুষের মনে হয় সঠিক প্রশাসনিক তদারকির অভাবই দূষণের কারণ। অথচ দূষণের সঙ্গে বিশ্বায়িত পণ্য-সংস্কৃতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, বলা যায় দূষণের প্রধান কারণই হল বিশ্বায়িত পণ্য-সংস্কৃতি। দূষণের জন্য কোনো ব্যক্তির মৃত্যু বা আহত হওয়ার সময়কালে তার আয়ের হিসেব দিয়ে পুঁজিবাদ দূষণের মূল্যকে নির্ধারণ করে (এখানে বোঝাই যাচ্ছে পরিবেশের ক্ষতিটা এখানে মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয় দূষণমূল্য নির্ধারনে, দূষিত পরিবেশকে পুরোনো জায়গায় ফিরিয়ে আনার প্রসঙ্গটাও তাই ধামাচাপ পড়ে যায় ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণের আলোচনায়।)। আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিচ্ছন্ন পরিবেশের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এ দুটি বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি স্বভাবতই কম মজুরির দেশ কিংবা গরিব দেশে দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্পগুলোকে প্রতিষ্ঠা করতে বা সরিয়ে আনতে সুপারিশ করে। তার ওপর এ দেশগুলোতে পরিবেশবিধি এমনকি আইনকানুনও অনেক শিথিল তাই বড় বড় বিপর্যয় ঘটিয়ে ফেললে পালিয়ে যেতে সমস্যা হয় না। ভোপালের উদাহরণ তো হাতের সামনেই আছে। চর্মশিল্প, রাসায়নিক শিল্প, খনিজ থেকে ধাতু নিষ্কাশন কিংবা সিমেন্ট শিল্পের মত মারাত্মক দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্পগুলো তৃতীয় বিশ্বে স্থানান্তরিত হচ্ছে। কর্মসংস্থানের খুড়োর কল দেখিয়ে বিনিয়োগ আনা হচ্ছে। বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে তৃতীয় বিশ্ব— প্রথমত মজুরি হ্রাস করে, দ্বিতীয়ত প্রায় বিনা মূল্যে জলসম্পদ, খনিজসম্পদ, বনসম্পদ এবং জমি তাদের হাতে তুলে দিয়ে তৃতীয়ত রপ্তানিকে উৎসাহ দিতে রপ্তানি-শুল্ককে ছাড় দিয়ে (যার অবশ্যম্ভাবী ফলাফল দেশের মুদ্রার দাম হ্রাস পাওয়া)। দেশের মানুষ আরও গরিব হয়। নোংরা শিল্পগুলো ঢুকে পড়ে— দূষণ বাড়ায়, ক্ষতিগ্রস্থ করে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা। ন্যূনতম পরিধেয় বস্ত্র জোটে না যে দেশে সে দেশের মানুষরা নিজেদের পরিবেশ দূষিত ক'রে, জীবন বিপন্ন করে সাহেবদের সুদৃশ্য চামড়ার জুতো তৈরি যোগাচ্ছে।

বড়লোকের ঢাক তৈরি গরিব লোকের চামড়ায়

দূষণ কি বড়লোক গরিবলোক বিভাজন দেখে? কিংবা পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য যদি মনুষ্যকূল ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়ায় তাহলে বড়লোকরা বেঁচে যাবে নাকি? এহেন যুক্তি দাঁড় করিয়ে অনেক পরিবেশবিদ, এমনকি পরিবেশ আন্দেলনকারীরাও একটা শ্রেণীনিরপেক্ষ পরিবেশ আন্দোলনের তত্ত্ব খাড়া করে। যেন শোষক আর শোষিত-র সমান দায় পরিবেশ ধ্বংসের পেছনে। কাঠ-কাটা কোম্পানি আর কাগজকলগুলি বনাঞ্চল উজাড় করে দেয় আর পরিবেশবিদরা তার বিরোধিতায় নামলে বিরোধ বেধে যায় ঐ কাঠ-কাটা শ্রমিকদের সাথে— কারণ তাদের রুটি রুজিতে টান পড়ে। এই অজুহাতে শ্রেণীনিরপেক্ষ আন্দোলন-পন্থীরা বনাঞ্চল রক্ষার জন্য শ্রমিকদের বিকল্প জীবিকা সুনিশ্চিত করার দাবি তোলার পরিবর্তে মালিক-শ্রমিক উভয়ের বিরুদ্ধেই একই রকম সংগ্রামের তত্ত্ব খাড়া করে। আর এই পারস্পরিক বিবাদের মধ্যে বড় কোম্পানিগুলো দাঁও মেরে চলে যায়।

শ্রেণী প্রশ্নটিকে মাথায় না রেখে এবং এই উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যেই সমাধান খোঁজার চেষ্টা করলে তা যে বিফলে যাবে তার ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে। আমরা আমাদের শহরেই দেখেছি

জলাশয় দূষণের কারণ খাড়া করে হাজার হাজার বস্তিবাসীকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। আবার সেই পুকুরকেই পরবর্তীতে বড়লোক বাড়ির বাচ্চাদের সাঁতার শেখানোর জন্য বাঁধিয়ে দিয়ে (সুইমিং পুল) পুকুরের বাস্তুতন্ত্রকে ধ্বংস করা হয়েছে। অনুন্নত দেশকে উন্নত দেশের কিংবা গ্রামকে শহরের কাছে পদানত ক'রে প্রাকৃতিক সম্পদ লুঠ করা হচ্ছে, মুষ্টিমেয় মানুষের ভোগ ক্ষমতা বাড়ছে এবং দূষণের দায়কে যখন গরিব মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তখন পরিবেশ বিনষ্টের দায় কোনোভাবেই শ্রেণীনিরপেক্ষ হতে পারেনা। বিশ্ব জুড়ে পুঁজিবাদ বিরোধী আন্দোলন তাই বহু ক্ষেত্রেই পরিবেশ আন্দোলনকে জড়িয়ে ধরেই বিকশিত হচ্ছে।

ভোগের বাসনা সম্ভবত মানুষের ভেতরে গভীর শেকড় গেড়েছে মানবসভ্যতার যাত্রাপথে। আজকের দিনে এটা হয়ত মানুষের চেতনায় একটা মৌলিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে, আর এর ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড়িয়ে ভোগবাসনায় আরো বেশি বেশি করে উস্কানি দিয়ে পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিকশিত হচ্ছে, প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি ভোগের অলীক সুখের দিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কেবলমাত্র বাজার সম্প্রসারণের যুক্তির দিকে তাকিয়ে। অনেক বিজ্ঞানী আশঙ্কা করছেন বিগত কয়েক দশকে অবস্থাটা এমন সর্বনাশের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে যে সবরকম ব্যবস্থা নিলেও, এমনকি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক আমূল পরিবর্তন করে ফেললেও ঘুরে দাঁড়ানোর আর কোনো আশা নেই; প্রকৃতির সহনশীলতার সে চৌকাঠ আমরা পেরিয়ে এসেছি যাতে করে পরিবেশের কলুষতা মুক্ত করতে নামলেও প্রকৃতির ভারসাম্য ফেরানো যাবে না। অর্থাৎ সমাধানকল্পে বিগত শতকের প্রবণতায় কেবলমাত্র রাশ টেনে নয়, দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই প্রক্রিয়াগুলো উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে। এর অর্থ কিন্তু আবার জঙ্গলে গিয়ে বসবাসের মত অতিসরলীকৃত তত্ত্ব নয়। সমস্যাটা প্রযুক্তি বা যন্ত্রের নয়, সমস্যা ঘনীভূত হয়েছে মুনাফা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিচালিত প্রযুক্তির অগ্রগতির জন্য। ব্যক্তিগত মুনাফা আর পুঁজির সঞ্চয়ণকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বদলে এবং প্রকৃতির ওপর কর্তৃত্ব কায়েম করার মানসিকতা ছেড়ে, মানুষের বিপাক-ক্রিয়াকে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করে, প্রকৃতির নিয়মগুলো যুক্তিশীলভাবে বুঝে তার সাথে বোঝাপড়ার মাধ্যমে প্রযুক্তির উন্নয়ন করলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে একটা বাসযোগ্য সুস্থ পৃথিবী রেখে যাওয়া যাবে। এর চেয়ে কম সংস্কারের কাজ খালি চোখে প্রয়োজনীয় মনে হলেও তা ধ্বংসের প্রক্রিয়ার গতি সামান্য ধীর করবে মাত্র। এ কথা জলের মত পরিষ্কার যে এমন একটা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা নিজেই সবচেয়ে বড় বাধা। ফলে পুঁজিবাদের মূল উৎপাটিত করে বড়সড় রকমের সামাজিক পরিবর্তন ছাড়া এই নিশ্চিত ধ্বংসকে এড়ানো অসম্ভব।

মহাভারত নীতিকথা নয়

৬ পৃষ্ঠার পর

সংঘ পরিবারের খড়্গ নেমে আসে। পাণ্ডবদের জন্মদাতা ধর্ম, বায়ু বা ইন্দ্রের মতো দেবতারা এখন পৃথিবীতে নেমে আসছেন না বলে সংঘ পরিবার বোধহয় এখন বোধহয় তাঁদের মনুষ্য অবতার 'বাবা' বা এমএলএ-এমপিদের তৈরি করছে। তাই আমরা দেখি সংঘ পরিবারের ঘনিষ্ঠ উত্তর ভারত থেকে আসা আশারাম বাপু বা তাঁর পুত্র নারায়ণ সাঁই কিংবা দক্ষিণ ভারত থেকে আসা নিত্যানন্দদের। ঐ দেবতাদের মতোই মুক্তির আশ্বাস দিয়ে তাঁরা নারীদের সঙ্গে বিহার করেন। এখন তাঁরা আদালতে অপরাধী হিসাবে মামলা লড়ছেন। তারপর আছেন বিজেপি মন্ত্রী ও নেতারা। যেমন নিহাল চাঁদ মেঘওয়াল (কেন্দ্রীয় রাসায়নিক ও সার মন্ত্রী), কৃষ্ণমূর্তি বন্ধি (ছত্তিশগড়ের বিজেপি এমএলএ), মধু চভন (মহারাষ্ট্রের বিজেপি নেতা)- আরও অনেকের সঙ্গে এরা ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত। সংঘ পরিবারের চোখে এরা হয়ত অতীতের সর্বশক্তিমান ঋষিদের অবতার (পরাশর, দুর্বাস ও অন্যান্য মুনিঋষিরা ভয় দেখিয়ে বা অভিশাপ দিয়ে অন্যদের তাঁদের কথা শুনতে বাধ্য করতেন)। তাঁদের মতো বিশেষ সুবিধাভোগীরা তাঁদের পছন্দমতো নারীদের ভোগ করতে পারেন, কারণ তাঁদের বর্তমান রাজনৈতিক ক্ষমতা একেবারে খতম করার ভয় দেখিয়ে তাঁদের শিকার ও তাদের পরিবারদের কণ্ঠ রোধ করে দিতে পারে।

এই বাস্তবতার প্রেক্ষিতে বর্তমান বিজেপি-সরকার ও তার চিন্তকদের মহাভারত নিয়ে একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে। কারণ তারা যখন মহাভারতের মতো মহাকাব্যের নায়কনায়িকাদের পূজা করে, তখন তাদের উচিত সাধারণ নাগরিকদের তাদের পছন্দমতো লিবারাল জীবনযাত্রা চালাতে দেওয়া উচিত। কিন্তু সেক্ষেত্রে, এদেশকে 'নৈতিকভাবে শুদ্ধ হিন্দু' করে তোলার যে পরিকল্পনা আছে সংঘ পরিবারের, যেখানে যৌন-বুভুক্ষু স্ত্রীপুরুষরা বসবাস করবে, তার কী হবে? এই সমস্যা অতিক্রম করতে বিজেপি সরকার ও আরএসএস-এর সামনে দুটি উপায় আছে। এক, মহাকাব্যে দেবদেবীদের যে প্রায় অবাধ যৌনজীবন দেখানো হয়েছে তার প্রতি সম্মান দেখিয়ে তাদের নিজেদের নারীপুরুষ সম্পর্ক নিয়ে বিভিন্ন বিধিনিষেধ চাপানোর, বিবাহপূর্ব যৌনসম্পর্ক বা উভয়পক্ষের সম্মতিতে যেসব যৌনসম্পর্ক হয় সেসব নিয়ে তাদের যেসব বিরুদ্ধতার কর্মসূচি আছে সেগুলো বন্ধ করা, হিন্দু মেয়ের সঙ্গে মুসলিম ছেলের প্রেমকে 'লাভ জেহাদ' আখ্যা দেওয়া বন্ধ করা। আর অন্য উপায়টি হলো মহাভারতের আসল রূপটিকে নিষিদ্ধ করা, মানুষ যাতে তা জানতে না পারে। তার বদলে আরএসএস মহাভারতের একটি পরিবর্তিত রূপ বের করতে পারে, যাতে দেবদেবীদের যৌনজীবনের কাহিনী থাকবে না, মহাকাব্যে নায়কনায়িকাদের জন্ম নিয়ে কাহিনীগুলি থাকবে না।

ধনতন্ত্র : ফিরে দেখা

যুদ্ধ, ধনতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ এবং আজকের পৃথিবী

সমরেশ মিত্র

১৯১৪ এবং ১৯৩৯ দুটি বিশ্বযুদ্ধ যথাক্রমে শতবর্ষ এবং ৭৫ বছর অতিক্রম করলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর, সেই সুদূর ১৯৪৫-এর পর আর কোনও বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ ঘটেনি। এই সব দিক বিবেচনা করে অনেকেই যুদ্ধের পেছনে সাম্রাজ্যবৃদ্ধি বা অর্থনৈতিক কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করতে চান না। নানা দিক থেকে দেখলে রূপের বিচারে দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তী পৃথিবী আর আজকের দুনিয়ার মধ্যে বিস্তর মিলের দিক চোখে না পড়েই পারে না। আবার রূপ এবং মর্মবস্তুর দিক থেকে প্রভেদও লক্ষণীয়। তাই বর্তমানকে বোঝার জন্য এক শতাব্দী পেছিয়ে যাওয়ার এই প্রয়াস— অতীত আর সমসাময়িকের তুলনা-প্রতিতুলনা, ভবিষ্যতকে অনুমান করার আশায়।

পশ্চিমী মূলস্রোতের সংবাদমাধ্যম এবং প্রতিষ্ঠানপন্থী ঐতিহাসিকবৃন্দ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকুলের কাছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছিলো 'প্রগতি এবং আধুনিকতার' দ্যোতক। অন্যদলের মানুষরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে ব্যাখ্যা করার জন্য বেছে নিয়েছিলেন জাতিগুলির মধ্যে অবধারিত হানাহানির বিষয়টিকেই। তাঁদের এই যুক্তির পিছনে তথ্যের বনিয়াদ নেহাৎ কম পোক্ত ছিল না। তবে তাঁরা জাতিগত বা রাষ্ট্রগত হানাহানির পেছনে ইতিহাসের যে অমোঘ যুক্তি নিহিত, তার সন্ধান দেননি। ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল রাজতন্ত্রী দেশ, বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকারী রাশিয়ার একজন অপেক্ষাকৃত অপিরিচিত রাজনৈতিক নেতা, ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন স্পষ্ট লিখেছিলেন, "(ইউরোপের) উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশসমূহ সীমান্ত, উপনিবেশ এবং প্রভাব বলয় বৃদ্ধি করার জন্য নিজেদের মধ্যে মারামারি করছিলো। তারা অ্যালসেস-লোরেন, বলকান রাজ্যগুলি, আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্য দখলের জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত।" পৃথিবীর ওপর এই একাধিপত্য বিস্তারের পেছনে ছিলো সাম্রাজ্যবাদের ধারণা। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদ তাদের উপনিবেশ থেকে নানান রসদ সংগ্রহ করে একটি সম্পূর্ণ ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হয়। সেই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজন ছিলো পূর্ণ সমরায়ণের পক্ষে যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করা এবং শেষ পর্যন্ত আধিপত্য বজায় রাখার জন্য বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের দিকে পৃথিবীকে ঠেলে দেওয়া।

ইউরোপের কয়েকটি দেশে বিভিন্ন স্তরের 'শিল্প বিপ্লব' সংঘটিত হওয়ার পরে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির উৎপাদন ব্যবস্থায় গুরুতর পরিবর্তন আসে। যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন ব্যবস্থার প্রচলন ঘটায় পণ্য উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের চাহিদা বেড়ে যায় লাগামহীন ভাবে। উৎপাদন নিরবচ্ছিন্নভাবে বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন হয় অবিরত শক্তির যোগান। অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদনের ফলে যাতে পণ্যের মূল্য কমে না যায়, সেটি নিশ্চিৎ করার জন্য প্রয়োজন হয় 'মুক্ত প্রতিযোগিতার' পরিবর্তে অধীনস্থ বাজার। পরদেশ দখল করে সেখান থেকে সস্তায় বা জোর খাটিয়ে বিনা পয়সায় শিল্প-পণ্য উৎপাদনের কাঁচামাল ছিনিয়ে এনে, পরদেশের শক্তি ভাণ্ডার লুণ্ঠন করে এবং পরদেশে নিজেদের পণ্য চড়া দামে বিক্রি করার ব্যবস্থা করে। এই ভাবে সাম্রাজ্যবাদ, ধনতন্ত্রের এই তিন চাহিদাকে এক ধাক্কায় মিটিয়ে দেয়। এই হলো সংক্ষেপে উপনিবেশবাদ।

প্রায় প্রতিটি ইউরোপীয় জাতি এই খেলায় যোগ দেয়— কেউ কিছুটা আগে আর কেউবা কিছুটা পরে। যারা পরে যোগ দেয় তাদের ভাগ্যে জোটে আধ-খাওয়া, ছিবড়ে-হয়ে যাওয়া উৎকৃষ্ট দ্রব্যের ভগ্নাংশ, যা তাদের মূল দ্রব্যের প্রতি আরও লোলুপ করে তোলে। দেশ দখল করা এবং সেই দেশকে পদানত করার জন্য প্রয়োজন সেনা বাহিনীর— সেনাবাহিনীর প্রয়োজন উৎকৃষ্ট অস্ত্রের ক্রমাগত যোগান— অর্থাৎ চাই অস্ত্রের অতি-উৎপাদন। আর দরকার কিছু সময় অন্তর অস্ত্রের কার্যকারিতা যাচাই। অতএব দরকার মাঝে মাঝেই ছোটোখাটো যুদ্ধ, যার মাধ্যমে যুদ্ধাস্ত্র এবং সমরকৌশলের উন্নতি ঘটানো সম্ভব। যুদ্ধ-বিগ্রহ থাকলে যুদ্ধে জয়-পরাজয় থাকবেই। বিজয়ী শক্তি চাইবে পরাজিত শক্তির কাছ থেকে যুদ্ধের দক্ষিণা বা ক্ষতিপূরণ। পরাজিত জাতি চাইবে ক্ষতিপূরণ আসুক তার উপনিবেশ থেকে— ফলে বাড়ে আরও দেশ দখল— আবার একটি নতুন চক্রের জন্ম। যুদ্ধ এবং সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে অনেকগুলি আন্তঃসম্পর্কের এটা হলো একটি দিক।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় স্বর্ণভিত্তিক পুঁজির ওপর সাম্রাজ্যবাদ এবং ব্যাঙ্কারদের আস্থা ছিল। এই পুঁজি মসৃণভাবে একদেশ থেকে অন্যদেশে চলাচল শুরু করে। এই লগ্নির ফলে বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, হল্যান্ড এবং বেলজিয়ামের পুঁজিপতি মালিক এবং কর্পোরেশনগুলির মুনাফা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে পুঁজিপতিরা গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে জাতি-রাষ্ট্রের সহায়তায় এবং আনুকূল্যে ব্যবসা বাড়ানোর ফন্দি আঁটে। জাতীয়তাবাদের ছাতার তলায় তারা জড়ো হয়।

আদিম সঞ্চয়ের মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে যে বিপুল পরিমাণ পুঁজি সঞ্চিত হয়েছিলো, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় সেই পুঁজি লগ্নি হওয়ার ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে বিপুল উৎপাদনী শক্তি উন্মুক্ত হয়। পণ্য রপ্তানি এবং লগ্নি থেকে

আরও মুনাফার তাগিদে জন্ম হয় সাম্রাজ্যবাদের, প্রতিষ্ঠিত হয় উপনিবেশ। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীন মুক্ত বাণিজ্যের স্থান নেয় একচেটিয়া সংস্থা এবং কার্টেল। দ্বিতীয় একটি ঘটনাও ঘটে যায় অলক্ষ্যে— যা সমাজতান্ত্রিক চিন্তায় বিশ্বাসী মানুষদের চোখ এড়ায়নি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিটি ক্ষমতাবান রাষ্ট্রই উদ্যোগী হয়ে নতুন ভূখণ্ডের দখলে অগ্রণী ভূমিকা নেয়— নিজেদের দেশের শ্রমিক-কৃষকদের শোষণ করার পাশাপাশি তারা দখল করা দেশগুলোর ভূমি এবং অন্যান্য সম্পদের ওপর একচেটিয়া মালিকানা কায়েম করে সেই দেশের শ্রমজীবীদেরও সীমাহীন শোষণের জালে জড়িয়ে ফেলে। পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয় কে কত তাড়াতাড়ি কয়লার উৎসগুলি (তখনকার সময়ে শক্তি উৎপাদনের জ্বালানি) দখল করবে। উপনিবেশ থেকে দখলদার দেশে সেই কয়লা চালান করার জন্য দীর্ঘ রাস্তায় বিভিন্ন দেশে ঘাঁটি পত্তন করা হয় এবং এই সমস্ত ব্যবস্থা যাতে বেদখল না হয়ে যায় সেজন্য সুদৃঢ় নজরদারি ব্যবস্থাও কায়েম করা হয়। তাই বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতিগুলির এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশ দখলের মধ্যে একটি বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

ইউরোপে তখন চলছে বুর্জোয়া শ্রেণীর জয়ের যুগ। প্যারী কমিউন পরাজিত। তার আগে ১৮৬৪ সালে কার্ল মার্কস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ ১৮৭২ সালে প্রায় বিলুপ্ত হয়। হৃত গৌরব ফিরে না পেলেও ১৮৮৯ সালে তা পুনরুজ্জীবিত হয়। শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ইত্যাদি প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে বুর্জোয়াদের অগ্রগতি ছিলো চিত্তাকর্ষক। বাণিজ্যিক সাফল্যের হাত ধরে আসে জাত্যাভিমান, আসে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের জয়গান। ব্যক্তিগত দক্ষতা, ব্যক্তিগত উদ্ভাবনী শক্তিই যে সমাজের মূল চালিকাশক্তি— সমাজ এই বুর্জোয়া বৌদ্ধিক চর্চাকে মান্যতা দেয়। শুরু হয় আবিষ্কারের অভিযান। অবশ্য প্রাচ্য দেশের অনাবিষ্কৃত সম্পদ ব্যক্তিগতভাবে দখল করার উদগ্র লালসা, হঠাৎ স্ফীত ইউরোপীয় জনসংখ্যার তীব্র ''শীত ক্ষুধা''-র হাত থেকে খাদ্য-উদ্বৃত্ত প্রাচ্যের দেশে পাড়ি দেওয়ার স্বপ্ন এইসব অভিযানের পিছনে অন্যতম তাগিদ হিসাবে কাজ করেছিলো। স্বর্ণ আর শস্যের সন্ধানে শুরু হয় অভিযান। হাতে অর্থের থলি নিয়ে অভিযানে মদত জোগাতে হাজির হয় আদিম সঞ্চয়ে স্ফীত, উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎ করা বণিক-শ্রেষ্ঠীর দল— যারা পরে মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্কার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

ইউরোপীয় জাতিসমূহ অতঃপর এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপনের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি ব্যবসার জন্য সে দেশে পা রেখে দেশের বিভিন্ন অংশ কৌশলে নিয়ন্ত্রণে আনে এবং শেষে সামরিকভাবে দখল করে। (যেমন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা-র সুবেদারি অর্জন করে, তারপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে। যেমন বাংলায় ফোর্ট উইলিয়াম স্থাপন এবং এই কেল্লার মাধ্যমে পলাশীর যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ)। এইভাবে একবার দেশটিকে কব্জা করার পর পদানত দেশটিকে বিজয়ী দেশটির (যা সাম্রাজ্যবাদীরা মোলায়েম করে 'মাতা দেশ' বলে) 'প্রজা-দেশ' বলে বর্ণনা করে। রাজতন্ত্র থেকে এগিয়ে থাকা বলে বর্ণিত বুর্জোয়া মতাদর্শ এইভাবে রাজতন্ত্রের রাজা-প্রজা বিভাজনে পর্যবসিত হয়। এরপর সেই দেশটিতে বসে সেনা ছাউনি— যার মাধ্যমে সেই একই দেশ দখলের জন্য আগ্রহী অন্যান্য প্রতিযোগী জাতিগুলিকে প্রতিরোধ করা যায় এবং একই সঙ্গে স্থানীয় মানুষদের বিদ্রোহকেও সামাল দেওয়া যায়। যে মূল তাগিদ থেকে এই পররাজ্য গ্রাস, তা হলো অর্থনৈতিক— উপনিবেশ থেকে লুণ্ঠন 'মাতা-দেশ'টিকে এই সম্পদ দ্বারা পুষ্ট করে। যে পদ্ধতিতে এটি ঘটে তা হলো নির্মাণের জন্য লোহা, শক্তির জন্য কয়লা, কাপড়ের জন্য তুলো, 'মাতা-দেশের' অনুৎপাদক সৈন্যবাহিনীর জন্য খাদ্য, 'মাতা-দেশের' খুনী-গুণ্ডা-বদমায়েশদের প্রজা দেশে চাকরি ইত্যাদি।

১৮৮০ এবং সমসাময়িক সময়ে সাম্রাজ্যবাদের মধ্যমণি ব্রিটেনের 'রাজত্ব' বিস্তৃত ছিল কানাডায়, অবিভক্ত ভারতে (পেশোয়ার থেকে আসাম), শ্রীলঙ্কা, বার্মা (মায়ানমার), অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, হংকং, প্রশান্ত মহাসাগর এবং ক্যারিবিয় সাগরের অসংখ্য ছোটো ছোটো দ্বীপ বা দ্বীপপুঞ্জে, দক্ষিণ আফ্রিকায়, তৎকালীন রোডেশিয়ায়, মিশরে। প্রত্যেকটি দেশের অবস্থান ব্রিটেনের মূল ভূখণ্ড থেকে বহু দূরে। জলপথে সৈন্য পরিচালনার জন্য ব্রিটেনের ছিলো সর্ববৃহৎ নৌ-বাহিনী এবং তার সুরক্ষায় জলপথে বাণিজ্যের জন্য ব্রিটেনের ছিল পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত জাহাজের সম্ভার— আধুনিক পরিভাষায় যাকে বলে ''ফ্লিট অফ মার্কেন্টাইল ভেসেল্স''।

বৃটেনের পড়শি ফ্রান্সে শিল্প বিপ্লব এসেছে ব্রিটেনের প্রায় ৭০ বছর পরে। মূল কারণ ছিলো, ব্রিটেনের চেয়ে ফ্রান্সের অনেক কম উপনিবেশ। কাঁচামাল বা শক্তি যোগানের ক্ষেত্রে সেগুলির বৈচিত্র্যও বৃটেনের উপনিবেশগুলির সঙ্গে তেমন তুলনীয় নয়। ব্রিটেন যেমন একচ্ছত্র ব্যবসার তাগিদে, অধীনস্থ বাজার প্রসারণের তাগিদে, ক্রমাগত উপনিবেশ দখল করে গেছে, ফ্রান্সের ক্ষেত্রে মূল তাগিদ ছিল ভিন্ন। বিভিন্ন যুদ্ধে বারবার পর্যুদস্ত হয়ে ফ্রান্স বিজয়ী দেশগুলোর কাছে ক্ষতিপূরণ যোগাতে যোগাতে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। প্রধানত ক্ষতিপূরণ যোগানোর তাগিদে ফ্রান্সের দেশ দখলের লিপ্সা— যার শিকার হয় ভিয়েতনাম, লাওস ও কাম্বোডিয়া, যাকে একসঙ্গে বলা হয় ইন্দোচীন, পাশাপাশি ফ্রান্স দখল করে প্রশান্ত মহাসাগরের বেশ কিছু দ্বীপ আর পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার বেশ কিছু দেশ।

বনেদি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র স্পেনের সাম্রাজ্যে ততদিনে সূর্য

অস্তগামী— তবুও তার দখলে ছিলো ফিলিপাইনস্, এবং লাতিন আমেরিকার এক বৃহৎ অংশ।

বেলজিয়াম-এর সম্পদের উৎস ছিল তার রমরমা দাস-ব্যবসা। ক্রমাগত দাস জোগানের জন্য তার প্রয়োজন ছিলো উপনিবেশ। তার অর্থ এই নয় যে এই দেশটি উপনিবেশের আর্থিক সুবিধার দিকটি নিয়ে ভাবিত ছিল না। দেশটি আফ্রিকার কঙ্গো থেকে কাঁচামাল, পাশাপাশি 'জীবন্ত কাঁচামাল' মানুষ আমদানি করতো এবং অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিসমূহের সঙ্গে সমঝোতায় যোগ দিয়ে চীন দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যে অন্যান্য সুবিধা ভোগ করত।

জার্মানি এই হরির লুঠের পার্বণে একটু দেরি করে পৌঁছায়, তখন নিমন্ত্রণ বাড়ির মূল পদগুলির পরিবেশন সমাপ্তপ্রায়। তার ভাগ্যে জোটে কেবল দই-মিষ্টি আর পান— অর্থাৎ ভাগ-বাঁটোয়ারার পর পড়ে থাকা আফ্রিকার টাঙ্গানাইকা, নামিবিয়া আর ক্যামেরুন আর কিছু 'ছুট্‌কো-ছাট্‌কা' অঞ্চল।

রাশিয়ার নজর পড়ে মধ্য এশিয়ায় অবস্থিত অটোমান সাম্রাজ্যের প্রান্তিক রাষ্ট্রগুলির (কাজাকাস্তান ইত্যাদি) উপর, তার সঙ্গে দখল করে পোল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া ইত্যাদি। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সাম্রাজ্য পড়ে বিপাকে— তাদের জন্য ইউরোপের বাইরে পা রাখার কোনো বাড়তি স্থান তার প্রবল পড়শীবৃন্দ রাখেনি। অতএব তাকে নজর দিতে হয় খোদ ইউরোপের দিকেই— তার দখলে আসে বোহেমিয়া, মোরাভিয়া, সাইলেসিয়া, গ্যালিসিয়া, বস্‌নিয়া এবং হারজেগোভিনা। এই নামগুলিই প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের সময় বারে বারে ফিরে এসেছে।

অটোমান সাম্রাজ্য এক সময়ে রোম সাম্রাজ্যের পর সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্য হিসেবে খ্যাত ছিল। তার দখলে ছিলো প্রায় পুরো পূর্ব ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকার দ্বারপ্রান্ত। যখন এই ইউরোপীয় দেশগুলোর ঝান্ডা পুঁতে জমির দখল নেওয়ার প্রক্রিয়া সবে শুরু হচ্ছে, সেই ১৮৭০-এর শুরুতে, আফ্রিকার ভূখন্ডের মাত্র ১০ শতাংশের দখল ছিলো ইউরোপীয় জাতিগুলির আওতায়— আর যখন ভূমিলক্ষ্মীর বিত্তহরণের এই অশুভ অভিযান সমাপ্তির মুখে এসে দাঁড়ালো, সেই ১৯০০ সালে দেখা গেলো আফ্রিকা মহাদেশটির ৯০ শতাংশই শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয় দেশগুলির কব্জায়।

দরজায় 'হাউস-ফুল' বিজ্ঞপ্তি ঝুললেও লোভাতুর লুঠেরারা 'ঘরে' ঢোকার চেষ্টা অব্যাহত রাখে। ক্ষমতাধারীরা চায় কয়েকজনকে হটিয়ে সেই স্থান দখল করতে। আফ্রিকার মরক্কো সরাসরি ফ্রান্সের উপনিবেশ না হলেও তা অবশ্যই ফ্রান্সের প্রভাব-বলয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। ফ্রান্স মরক্কো দেশটিকে তার ছত্রছায়ায় আনার প্রয়াস নিলে ১৯০৫-এ কাইসার-এর জার্মানি রাষ্ট্র হিসেবে মরক্কোর স্বাধীনতার পক্ষে সওয়াল করে। এতে ফ্রান্স এবং জার্মানির মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে— কিন্তু বিষয়টি প্রতিবাদ এবং কূটনৈতিক চুক্তি বিনিময়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এবং আগে ব্রিটেন আফ্রিকায় ১৮৮০-৮১-তে বুয়র যুদ্ধে যথেষ্ট নাস্তানাবুদ হয়। ১৮৯৮ সালে আফ্রিকার সুদান-এর দখলদারি নিয়ে বৃটেন-ফ্রান্স যুদ্ধ বাধে। অন্যদিকে অটোমান সাম্রাজ্য ক্রমাগত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং পরাজিত হয়ে বিজয়ী পক্ষের কাছে মূল ভূখণ্ড হারাতে থাকে। ১৮৫৩-৫৬-তে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ, ১৮৭৭-৭৮-এ রাশিয়া-তুরস্ক যুদ্ধ, ১৯১২-১৩-তে প্রথম বলকান যুদ্ধ— এই তিনটি যুদ্ধেই অটোমান সাম্রাজ্যের পরাজয় ঘটে।

এরপর যখন যুদ্ধের ছায়া ইউরোপের ওপর ঘনিয়ে আসতে থাকে, তখন ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী জাতিসমূহ নিজেদের ঘর গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সাম্রাজ্য বলকানের দিকে তার থাবা প্রসারিত করতে প্রয়াসী হয়— রাশিয়ার পক্ষে তা বিপজ্জনক হওয়ায় রাশিয়া এই প্রয়াসে বাধা দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। অন্যদিকে জার্মানির 'বার্লিন থেকে বাগদাদ' রেল প্রকল্প অস্ট্রিয়ার জন্য বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের ব্যবসায়িক স্বার্থও ধাক্কা খায়। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে দেখা যায় পশ্চিমী শক্তিগুলি সারা পৃথিবীর প্রতিটি ভূখণ্ডে নিজেদের দাপট প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। ব্রিটেনের সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক সীমা তার নিজের দেশের ১৪০ গুণ হয়ে যায়, বেলজিয়ামের ক্ষেত্রে পরিমাণটি ৮০ গুণ, ফ্রান্সের ক্ষেত্রে ২০ গুণ, আর জার্মানির ক্ষেত্রে তা মাত্র কয়েকগুণ। আর অত্যাচারী জারের রাশিয়ার ভৌগোলিক সীমা কতটা ছিলো তা বোঝানোর জন্য একথা বলাই যথেষ্ট যে সারা পৃথিবীর ১২টি সময় ভিত্তিক অঞ্চল এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইউরোপের প্রতিটি রাষ্ট্রই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো— পাশাপাশি চলছিলো কূটনৈতিক কৌশল ব্যবহার করে আসন্ন যুদ্ধটিকে কতটা পেছিয়ে দেওয়া যায়— আরও কতটা কৃৎকৌশলের দিক থেকে নিজের দেশটিকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে তোলা যায়। ১৮৮৪ সালে দেখা যায় যে আফ্রিকায় উপনিবেশ বিস্তার নিয়ে ইউরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হচ্ছে, তার সুষ্ঠু নিরসন করতে না পারলে ইউরোপীয় জাতিগুলি ইউরোপের মাটিতেই যে কোনো সময়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে। জার্মানিই আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপনের বিষয়ে সবচেয়ে কমজোরি অবস্থায় ছিল— তার প্রয়োজন ছিল সমঝোতার ভিত্তিতে একটা সহমতে পৌঁছানো, যাতে পরে এসেও জার্মানি লুঠের ভাগ থেকে বঞ্চিত না হয়। অতএব ১৮৮৪ সালে জার্মানির বার্লিন সহরে ইউরোপীয় জাতিসমূহ (যাদের আফ্রিকায় উপনিবেশ আছে) মিলিত হয়— যা বার্লিন কনফারেন্স নামে খ্যাত। মিলিত হওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য— আফ্রিকায় উপনিবেশ কীভাবে স্থাপিত হবে, সে বিষয়ে ইউরোপীয় জাতিসমূহের একটি সাধারণ সমঝোতায় পৌছানো।

সুদান নিয়ে যুদ্ধের পরপরই ফ্রান্স এবং ব্রিটেন বোঝে যে ইউরোপে জার্মানির আধিপত্য খর্ব করতে হলে ইঙ্গ-ফ্রান্স সমঝোতা প্রয়োজন। এই বাধ্যবাধকতা থেকে ব্রিটেন ও ফ্রান্স ১৯০৪ সালে সৌহার্দ্য-সমঝোতায় উপনীত হয়। রাশিয়া তার নিজস্ব কৌশলে সমঝোতার মাধ্যমে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে শুরু করে।

ইউরোপের জাতিগুলি ১৮৯০ থেকেই তাদের যুদ্ধাস্ত্র, যুদ্ধজাহাজ, সেনাবাহিনী, গোলা-বোমা-বন্দুকের উৎপাদন বাড়াতে থাকে। ১৮৯৯-তে রাশিয়ার জার নিকোলাস-২ হেগ শহরে অস্ত্রসম্ভার সীমিত করার জন্য একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। আতঙ্কিত হয়ে জার্মানি প্রথমে প্রকাশ্যে যুদ্ধজাহাজ বানিয়ে ব্রিটেনকে পাল্লা দেওয়ার হুঙ্কার দেয় এবং তা অনেকটা কাজে পরিণত করতেও সক্ষম হয়। জার্মান-পড়শি ফ্রান্স এতে আতঙ্কিত হয়ে নানান কেল্লা, সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং যুদ্ধজাহাজ নির্মাণে মনোযোগ দেয়। ঠিক এই সময়েই ইউরোপের বিভিন্ন জাতি-রাষ্ট্র 'জাতীয়তাবাদ'-এর জিগির তুলে শ্রমিক-আন্তর্জাতিকতাকে অন্তর্ঘাত করতে উদ্যত হয়। দুর্ভাগ্য হলো, সমাজতন্ত্রীদের আন্তর্জাতিক সংগঠন শ্রমিক-আন্তর্জাতিকতার পরিবর্তে জোলো দেশপ্রেমের বন্যায় ভেসে যায়। তারা নিজ নিজ দেশের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজ লবিটিকে মদত দেওয়ার জন্য দেশগুলির যুদ্ধ-প্রস্তুতিতে শ্রমিক শ্রেণীকে সামরিকভাবে সামিল করতে সক্ষম হয়।

কাউটস্কি, বুখারিন বা লেনিন নানাভাবে নানা লেখায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য সাম্রাজ্যবাদের দায়ভাগ নিয়ে সুচিন্তিত বিশ্লেষণ হাজির করেছেন। এগুলি সুপরিচিত। আমরা বরং যুদ্ধের কারণ এবং প্রয়োজনীতা বিষয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের শিবিরের নেতৃবৃন্দ কী বলেছেন তার একটু তল্লাশ করি।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের অন্যতম মুখ্য স্থপতি সেসিল রোড্স (যাঁর নামে এক সময় আফ্রিকার একটি দেশের নাম ছিলো রোডেসিয়া!) বৃটিশ পুঁজিপতিদের উদ্দেশে বলেন, ''সাম্রাজ্যের বিষয়টি আমাদের কাছে রুটি-র মতো বেঁচে থাকার প্রশ্ন। আপনাদের যদি নরখাদক না হতে হয় (অর্থাৎ যদি ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা ব্রিটিশ শ্রমিকদের অতিরিক্ত শোষণ না করে), তাহলে আপনাদের সাম্রাজ্যবাদী হতেই হবে। আর সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য, অন্যকে সাম্রাজ্য বিস্তারে বিরত করার জন্য সদা সতর্ক থাকতেই হবে।''

১৯১১-র অগস্ট মাসে ব্রিটিশ সামরিক জেনারেল হেনরি উইলসন লেখেন : ''আমার মত হলো যদি সেই অনন্য কিন্তু অনভিপ্রেত ঘটনাটি ঘটে, অর্থাৎ যদি জার্মানি ফ্রান্সকে আক্রমণ করে, অথবা বেলজিয়ামকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে, তবে ফ্রান্স এবং ব্রিটেনকে একটি আগ্রাসী এবং আত্মরক্ষার সমঝোতায় পৌঁছতে হবে, যেটিতে বেলজিয়ামও যোগ দেবে। যেভাবেই হোক এই সমঝোতায় ডেনমার্ককেও আসতে হবে আর আমি ধরেই নিয়েছি যে রাশিয়া ইতিমধ্যেই আমাদের দলে যোগ দিয়েছে।'' ব্রিটেনের সামরিক বাহিনীর অভিমত থেকেই বোঝা যায় যে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই পৃথিবীর বিভিন্ন শক্তি পৃথিবীকে নিজেদের মতো করে বণ্টন করার প্রচেষ্টা শুরু করে দিয়েছে।

১৯১৪-তে সারাজেভো-র ঘটনা ঘটার আগেই জার্মানির একজন সামরিক বিশেষজ্ঞ একটি প্রবন্ধে জার্মান-ব্রিটেন সম্পর্ক নিয়ে আলোচনায় বলেন : ''সাম্প্রতিককালে জার্মান শিল্প এবং বাণিজ্যে চিত্তাকর্ষক প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। জার্মান নৌবাহিনীর বৃদ্ধি সারা পৃথিবীর সম্মান আদায় করেছে। জার্মানির এই শক্তিবৃদ্ধি ব্রিটেনের এশিয়-তুরস্ক এবং মধ্য আফ্রিকাকে ঘিরে পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দেখা দিয়েছে। আর্থিক, রাজনৈতিক এবং সর্বোপরি সামরিক দিক থেকে জার্মানির বর্তমান এই শক্তিবৃদ্ধি ব্রিটেনের অস্বস্তির কারণ হতে পারে, যদিও এই সমস্ত ক্ষেত্রগুলিতে, বিশেষত বাণিজ্যে মার্কিন দেশের সঙ্গে ব্রিটেনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার চেয়েও অনেক বেশি তীব্র। এতদ্‌সত্ত্বেও ব্রিটেনের যাবতীয় শত্রুতা আমাদের সঙ্গেই।''

তাই সারাজেভো-তে ফার্দিনান্দ হত্যার জন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে বলে যাঁরা তিলকে তাল করেন, যুদ্ধের পেছনে ধনতন্ত্রের যে মূল শক্তি, অর্থাৎ অতি-উৎপাদন এবং কম বিপণন জনিত মুনাফার হার ক্রমাগত কমে আসা এবং সংকুচিত বাজারের প্রভাবে যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, সেই সরল সত্যটিকে তাঁরা আড়াল করতে চান।

১৯১৮ সালে যুদ্ধের শেষ কয়েক মাসে পৃথিবীর প্রথম বাস্তব সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়ার জন্ম হয়েছে এবং লেনিনের বিশ্লেষণ মতে ধনতন্ত্রের সংকট নিরসনে চলমান বিশ্বযুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণী যে ধনতন্ত্রের দুর্বলতম সংযোগস্থলে আঘাত হেনে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভারসাম্য সর্বহারা বিপ্লবের দিশায় চালিত করতে পারে, তা হাতে-কলমে প্রমাণিত হয়েছে। সমাজতন্ত্র যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবধারিত ফল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধর বিপ্রতীপে অবস্থান করে, তার প্রমাণ মেলে যখন আমরা দেখি যে সমাজতন্ত্র কায়েম করেই শিশু সোভিয়েত রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পক্ষ হতে অস্বীকার ক'রে সমগ্র যুদ্ধটি থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে, এমনকি স্বল্পকালীন মেয়াদে শিশু রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ কিছুটা হলেও বিসর্জন দিয়েও।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে রাশিয়ার প্রত্যাহার করে নেওয়ার চুক্তি (ব্রেস্ট-লিটভস্ক) স্বাক্ষরের সময় সোভিয়েত পক্ষ থেকে উপস্থিত লিও ট্রটস্কি যা বলেছিলেন, তার থেকে যুদ্ধের চরিত্র বিশ্লেষণ অনেক সহজ হয়ে আসে: ''দুপক্ষের সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক একেবারেই পক্ষপাতহীন। এবং আমরা কোনো এক পক্ষের জন্য আমাদের সৈন্যদের রক্তপাত ঘটুক তা চাই না। আমরা আমাদের দেশ, আমাদের জনগণ এবং

আমাদের সেনাবাহিনীকে এই যুদ্ধ থেকে প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। আমাদের অনুমান যে অচিরেই সারা দুনিয়ার নিপীড়িত জনগণ তাঁদের নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করার মতো অবস্থায় পৌঁছে যাবেন— ঠিক যে ভাবে রাশিয়ার নিপীড়িত শ্রমিকরা নিজেদের হাতে ক্ষমতা তুলে নিয়েছেন। আমাদের সৈন্যরা, যারা এই সেদিন পর্যন্ত জমিতে, খামারে কৃষিকাজ করতেন, তাঁরা তাঁদের কৃষিক্ষেত্রে অবশ্যই ফিরে যাবেন, সেই সমস্ত কৃষিক্ষেত্রে যেগুলি রুশ বিপ্লব কুলাকদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করেছে, যাতে তারা আসন্ন বসন্তে নিশ্চিন্তে ফসল বুনতে পারে। যে সৈন্যরা আগে কারখানার মজুর ছিলেন, তাঁরাও তাঁদের কারখানায় ফিরে গিয়ে বিকাশের জন্য উৎপাদনে যুক্ত হবেন, বিনাশের জন্য উৎপাদন নয়। শ্রমিক এবং কৃষকের যৌথ উদ্যোগে একটি নতুন সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার জন্ম হবে।''

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ভয়াবহ 'জাতীয়তাবাদী' অবস্থান দেখে হল্যান্ডের বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী নেতা আন্তন প্যানেকোয়ে যা বলেছিলেন, তা আজও প্রাসঙ্গিক এবং এই বর্ণনাটির উপর ভিত্তি করে আমরা আধুনিক দুনিয়ার হালহকিকৎ বিচার করবো। আন্তনের কথায়, ''সংস্কারপন্থী এবং বিপ্লবীরা, যাঁরা ছোট ছোট সংস্কারের যুগে একই সংগঠনে থেকে একসঙ্গে লড়াই করতে পারতেন, কিন্তু এখন আর তাঁরা পারবেন না, এখন তাঁদের পরস্পরের বিরুদ্ধে ন্যায়নীতির জন্যই দাঁড়াতে হবে।''

মার্কিন আর্থিক সংস্থা জে পি মর্গান-এর মালিক মর্গান সাহেব বলেন যে ব্যবসার সবচেয়ে মন্দার সময় বিশ্বযুদ্ধ (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ) বেধে যাওয়ায় তাঁর আর্থিক লাভ হয়েছে প্রচুর। তিনি ব্রিটেনকে টাকা ধার দিয়েছেন বিপুল সুদে, অস্ত্র ব্যবসায়ীদের দাদনে অর্থ জুগিয়েছেন এবং এই দাদনের টাকায় উৎপাদিত অস্ত্র ১৯১৭ পর্যন্ত জার্মানিকে রপ্তানি করেছেন। যুদ্ধ শেষ হয়ে আসছে দেখে তিনি মার্কিন সরকারের মধ্যে নিজস্ব প্রভাব খাটিয়ে মার্কিন দেশকে যুদ্ধে জড়িয়ে যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা করেন। যুদ্ধে মার্কিন দেশকে জড়ানোর জন্য দুটি কারণও ছিলো। এক, কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া করতে না পারলে যুদ্ধের জিগির তোলা কঠিন। দুই, যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে গেলে জাতীয়তাবাদে উস্কানি দেওয়া যায় এবং ব্যবসাদারদের স্বার্থকে সমগ্র দেশের স্বার্থ বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। মজুরি হ্রাসের মতো শ্রমবিরোধী কাজ সহজে করা যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

আমরা এতক্ষণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে এত দীর্ঘ আলোচনা করলাম কেবলমাত্র এই কারণেই যে এই যুদ্ধের বিশ্লেষণ থেকে আমরা খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছি একটি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য গুলি কী কী।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মতো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও পররাজ্য গ্রাস, কাঁচামাল লুণ্ঠন, যুদ্ধ এবং সমরাস্ত্র উৎপাদনের দিকে সমস্ত উৎপাদন ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত করার ঝোঁক দেখা গেছে। পাশাপাশি দেখা গেছে বাজার বাড়ানোর এবং পুরনো উপনিবেশ ধরে রাখার তাগিদ। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মূল লক্ষ্য সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করছেন : ''আমি ব্রিটেনের রাজার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বৃটিশ সাম্রাজ্যের পতন ঘটাতে চাই না।'' তিনি আরও বলেন যে এই যুদ্ধে ব্রিটেনের একমাত্র স্বার্থ হলো মিশর এবং সুয়েজ খালের নিয়ন্ত্রণ যাতে ব্রিটেনের হাতছাড়া না হয় সেদিকে নজর রাখা এবং ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যাতে পতন না ঘটে সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া। যদিও ভারত আইনত বৃটেনের সহযোগী হিসেবে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলো, তৎসত্ত্বেও ১৯৪২ সালে ভারতে গণবিক্ষোভ সামাল দেওয়ার জন্য ভারতে যত ব্রিটিশ সেনা ছিলো তার সংখ্যা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ব্রিটিশ সৈন্যর চেয়ে বেশি ছিলো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়েই মার্কিন দেশ ব্রিটেনের পতনোন্মুখ অবস্থানে চলে যাওয়ায় একদিক থেকে 'বিশেষ অর্থনৈতিক সম্পর্কের' আড়ালে ঋণ-বন্ধকীতে ব্রিটেনকে বেঁধে ফেলে, অন্যদিকে মার্কিন দেশ ইউরোপ ও এশিয়ায় নিজের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের আশায় ব্রিটিশ অধীনস্থ বন্দর, বৃটেনের বিদেশের উপনিবেশগুলির বিমানবন্দর ব্যবহার করে যুদ্ধে তাদের অন্যান্য সহযোগীদের আগেই উত্তর আফ্রিকা, ইতালি এবং ফ্রান্সের একটি বড় অংশ দখল করে তার আধিপত্য কায়েম করে। মার্কিন দেশের উদ্দেশ্য ছিল, যুদ্ধের শেষে জার্মানি, ইতালি এবং জাপানের সাম্রাজ্য স্থাপনের সমস্ত যাবতীয় সামর্থ্যকে কেবল স্তব্ধ করাই নয়, অধিকন্তু সারা পৃথিবী জুড়ে ব্রিটিশ এবং কিছুটা পরিমাণে ফ্রান্সের সাম্রাজ্যকে পুরোপুরি নিজের কব্জায় নিয়ে আসা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বৃটেন এবং ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে ঠিক এই কাজটাই করেছিল। এই সময়ে ইউরোপের সরকারগুলির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ কর্মকাণ্ড ছিল যুদ্ধ পরিচালনা করা। এর ফলে অস্ত্রব্যবসায়ীবৃন্দ, ডুঁ পঁ-র মতো দস্যু সংস্থাগুলি যুক্ত হয়ে পড়ে। তারা, রাষ্ট্রের পূর্ণ মদতে, মুনাফা অর্জনের সমস্ত অন্যায্য গ্রহণ করে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক, দুই স্তরেই তারা সমস্ত প্রচেষ্টা বানচাল করে দেয় এবং যুদ্ধের উন্মাদনা জাগিয়ে রাখতে নিজেরাই গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণে মন দেয়।

১৯৩৯ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর ইয়েনানে কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মীদের একটি সভায় ভাষণ দেওয়ার সময় মাও সে-তুঙ বলেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পেছনে ক্রিয়াশীল কারণগুলির অন্যতম হলো ১৯২৭ থেকে ১৯৩৯ সারা ইউরোপ এবং মার্কিন দেশের তীব্র আর্থিক মন্দা। এই আর্থিক সংকট ঘরে-বাইরে যে ভয়াবহ রাজনৈতিক সংকটের জন্ম দেয় তাতে ইউরোপ এবং মার্কিন দেশের বুর্জোয়া একনায়কত্ব এবং ধনতন্ত্রের প্রতি সেইসব

দেশের মানুষদের ক্ষুব্ধ করে তোলে। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিদিনই এতটাই শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে তাকে আর বাইরে থেকে আক্রমণ করে পর্যুদস্ত করা বাস্তবত অসম্ভব বলে প্রতিপন্ন হয়। এই দুই অবস্থা সামাল দিতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে বড় মাত্রার একটি যুদ্ধের প্রয়োজন দেখা দেয়।

ব্রিটেন যখন বুঝতে পারে যে জার্মানি এখনি রাশিয়াকে আক্রমণ করবে না এবং ব্রিটেন যদি জার্মানী দ্বারা আক্রান্ত হয়, সে তার সাম্রাজ্য হারাবে, তখনই সে তার পুরনো হিটলার তোষণের রাস্তা পরিত্যাগ করে জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। মনে রাখা দরকার যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত জার্মানি এই ২০১০ পর্যন্ত ক্রমাগত বৃটেন এবং ফ্রান্সকে এবং পাশাপাশি মার্কিন দেশকে যুদ্ধের জন্য ক্ষতিপূরণ দিয়ে গেছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পর ইউরোপের মানচিত্র থেকে বহু দেশ বিলুপ্ত হয়ে যায়—বিজয়ী পক্ষগুলি তাদের অধীনস্থ বাজার নির্মাণ এবং রসদ লুণ্ঠনের জন্য এইসব দেশগুলির অংশ, হয় নিজেদের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে, অথবা এই দেশগুলিকে এমনভাবে ভাগ করে দেয় যে ভবিষ্যতে তাদের আর সবল সামরিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। ঠিক একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি দেখি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পর। সেই এক দেশ ভেঙে নতুন দেশ নির্মাণ— ভৌগোলিক সীমানা পুনঃচিহ্নিতকরণের প্রক্রিয়া। জার্মানি দু'ভাগ হয়— পূর্ব ইউরোপের বেশিরভাগ দেশই সোভিয়েত রাশিয়ার প্রভাব বলয়ে চলে আসে। ভারতও দুভাগ হয়। অন্যদিকে, চীনে নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব সাধিত হয়। পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ ভূখণ্ড এবং অর্ধেকের কিছু বেশি মানুষ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি এবং তাদের প্রভাব বলয়ের আওতায় বসবাস শুরু করে।

পশ্চিম ইউরোপের উপনিবেশ-কেন্দ্রিক সাম্রাজ্যগুলি আপেক্ষিকভাবে দুর্বল হয় এবং সারা পৃথিবীর ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির অবিসংবাদী নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে মার্কিন দেশ। নেতা হিসেবে মার্কিন দেশের প্রথম কাজ ছিল ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে মদত দিয়ে পুনরুজ্জীবিত করা। তাই মার্কিন দেশ, তার পূর্বতন শত্রুপক্ষ, জাপান এবং পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির পুনর্গঠনের জন্য মার্শাল পরিকল্পনা মাফিক খয়রাতি বিতরণ শুরু করে। মার্শাল পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে মার্কিন দেশ, এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকায় অবস্থিত ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের উপনিবেশগুলির মালিকানা মার্কিন দেশের হাতে তুলে দিতে বাধ্য করে— ফলে এক ধাক্কায় মার্কিন দেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত পণ্যের জন্য এক বিশাল অধীনস্থ বাজারের দরজা খুলে যায়।

সোভিয়েত রাশিয়ার উপস্থিতির জন্য সরাসরি দেশ আক্রমণ করে তাকে উপনিবেশে পরিণত করে তার বাজার দখল করা অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। একই সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়া সদ্য-স্বাধীন দেশগুলিকে সহজ শর্তে ঋণ বা অনুদান দেওয়া শুরু করলে মার্কিন একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার কাজটি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। শুরু হয় 'ঠান্ডা যুদ্ধে'-র যুগ— দ্বন্দ্ব এবং সংঘাতের স্থান পরিবর্তিত হয়ে ইউরোপ ছেড়ে পাড়ি দেয় এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার পূর্বতন উপনিবেশসমূহে। ঘটে কোরিয়া যুদ্ধ, ভিয়েতনাম, ইয়েমেন, টিমর, অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক, ফিলিপাইনস, কঙ্গো এবং অন্যান্য স্থানে তীব্র কিন্তু স্থানীয় স্তরে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ। সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে— আধিপত্য বজায় রাখার জন্য আফগানিস্থানের যুদ্ধ, পানামা, নিকারাগুয়া কিংবা তেলের জন্য দু-দুটি ইরাক যুদ্ধ, কিউবার বিরুদ্ধে হুংকার।

বাঁচার তাগিদে পুঁজিবাদ বারবার তার রূপ ও প্রকাশ পরিবর্তন করে অতি-উৎপাদন এবং কম ভোক্তার সংকট থেকে মুক্তি পেতে চায়। যার সাম্প্রতিক অবতার বিশ্বায়ন, যা কিনা একচেটিয়া আধিপত্যের মোলায়েম নাম! এই প্রক্রিয়ার শুরু লাতিন আমেরিকার চিলিতে— ১৯৭৩ সালে নির্বাচিত আলেন্দে সরকারকে প্রত্যক্ষ মার্কিন মদতে উৎখাত করার মধ্য দিয়ে যার যাত্রা শুরু। সোভিয়েত রাশিয়ার পতন, পূর্ব ইউরোপের হাওয়া বদলের পর পরই ঘটে চীনে 'বাজার-সমাজতন্ত্রের' উত্থান। দ্বি-মেরু বিশ্বের পরিবর্তে আপাতদৃষ্টিতে দৃশ্যমান হয় মার্কিন নেতৃত্বে একমেরু বিশ্ব।

এর মাঝেই আসে ২০০৮-এর নতুন মহামন্দা— নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জের ইন্দ্রপতন। প্রয়োজন পড়ে বিশ্বকে আবার দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ের মতো করে বিভক্ত করার। এই লক্ষ্যে সংঘটিত হয় আফগান যুদ্ধ, নতুন করে ইরাক আক্রমণ, আরব দেশে বসন্তের নামে রক্তপাত, লিবিয়া এবং সিরিয়ায় বোমাবর্ষণ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শক্তির উৎস ছিল কয়লা। পরে তা পরিবর্তিত হয় খনিজ তেলে— অতএব তখনকার কয়লার ডিপোর পরিবর্তে এখন তেলের ডিপো। তেলের ভাণ্ডার মধ্যপ্রাচ্যে লিবিয়া এবং ইরাক আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু।

১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ৭৫ বছর পূর্তি হয়েছে। ঐ দিন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন শীর্ষ বৈঠক ঘোষণা করে যে তারা ইউক্রেনে রাশিয়ার ভূমিকায় বিচলিত হয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা জারির সুপারিশ করছে। লিথুয়ানিয়া-এস্তোনিয়া-লাটভিয়ার মতো ইউক্রেনকেও তারা মার্কিন সামরিক জোটে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। মার্কিন তাঁবেদার লিথুয়ানিয়ার সরকারের রাষ্ট্রপতি দালিয়া গ্রাইবসবায়েত প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন যে রাশিয়া এখন ইউক্রেন সহ সারা ইউরোপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। পোল্যান্ডের প্রতিরক্ষা-মন্ত্রীর স্ত্রী ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকায় প্রকাশ্যে লিখেছেন যে ''ইউরোপে যুদ্ধ আসন্ন এমন ধারণাকে

এর পর ৮৪ পৃষ্ঠায়

নকশালবাড়ি এখন যেমন

পার্থ সারথি

যে নকশালবাড়ি আমার এবং আমার মতো সত্তর দশককে বড়ো হয়ে ওঠা বহু মানুষের যৌবনকে বদলে দিয়েছিল, আমাদের প্রজন্মের এক বড়ো অংশের মননে-স্বপনে সমাজ-বিপ্লবের বীজ বুনে দিয়েছিল, সেই নকশালবাড়ি আজকের দিনে কেমন আছে, কেমন আছেন সেখানে বর্তমান প্রজন্মের মানুষজন, তার এক ঝলক পরিচয় পেতে এবছরের গোড়ায় হাজির হয়েছিলাম ভারতবর্ষে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের এই ধাত্রীভূমিতে। গিয়েছিলাম নকশালবাড়ি ব্লকের হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতে, আরো নির্দিষ্টভাবে ওই পঞ্চায়েতের অধীন বীরসিংজোত এবং হোচাইমল্লিকজোত গ্রামে। বীরসিংজোত গ্রাম বিখ্যাত হয়েছিল নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলনের অন্যতম পীঠস্থান হিসেবে, এই গ্রামেই ১৯৬৮ সালের ৮ সেপ্টেম্বর জোতদার-বিরোধী আন্দোলন চলাকালীন পুলিশের গুলিতে শহিদ হয়েছিলেন বাবুলাল বিশ্বকর্মকার, যার নিবাস ছিল পাশের গ্রাম হোচাইমল্লিকজোতে।

হাতিঘিসা পঞ্চায়েতের আধিকারিকদের সাথে কথা বলার পর আমরা ওই দুটি গ্রামের নানান মানুষের সাথে কথা বলি, বিশেষ করে কথা বলি বাবুলালের ছেলে বিভাস বিশ্বকর্মকারের সাথে। বাবুলাল যখন শহিদ হন, তখন বিভাস মাত্র এক বছরের, আজ পরিণত বয়সে কী ভাবছেন তিনি সেই আন্দোলন এবং তার পরিণতি নিয়ে? শুরুতে এলাকার একটা পরিচিতি নেওয়া যাক।

হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েত এখন আদিবাসী বিকাশ পরিষদের দখলে, ১৩ জন সদস্যের মধ্যে ৭ জন ওই দলের, ২ জন কংগ্রেসের আর ৪ জন সিপিআই(এম) দলের। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিবাসীদের ৭০ শতাংশ আদিবাসী, বাকিদের অর্ধেক তফশিলি জাতির অন্তর্ভুক্ত, অন্যরা ওবিসি ও সাধারণ জাতির। ২০০৯ সালে শেষ পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছিল, গ্রামের লোকজন বললেন সেই সময় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের একটা হাওয়া তৈরি হয়েছিল, যদিও এখন ওই সংগঠনের আর খুব একটা অস্তিত্ব নেই। বামফ্রন্ট আমলে এখানকার গ্রামগুলোতে এবং পঞ্চায়েতের সিপিআই(এম) দলের একচেটিয়া প্রাধান্য ছিল। নতুন সরকার আসার পর অবশ্য সিপিএম-এর প্রভাব তলানিতে। গ্রামের মানুষের মধ্যে মূলত কংগ্রেস আর তৃণমূল কংগ্রেস দলের রাজনৈতিক প্রভাব রয়েছে। নকশালপন্থী কোনও দলের কার্যত অস্তিত্ব নেই, কানু সান্যাল যতদিন বেঁচেছিলেন, তাঁর একটা প্রভাব ছিল। এই পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যেই সেফেদল্লা গ্রামে তিনি থাকতেন। জঙ্গল সাঁওতালও এই এলাকার মানুষ। কিন্তু এঁদের কাজকর্ম বা রাজনীতি নিয়ে আলোচনায় সাধারণ গ্রামবাসীর খুব উৎসাহ দেখা গেল না।

বীরসিংজোত গ্রামের প্রবীন আদিবাসী চারু কোল জানালেন তিনি ভূমিহীন, এক কাঠাও জমি নেই। মজুর খেটে খান, অন্যের জমিতে কাজ করেন। বললেন, ১০০ দিনের কাজ পেলে করি। শরীর খারাপ বলে এখন আর বেশি কাজ করতে পারেন না। নকশাল আন্দোলনে আমরা সবাই ছিলাম, তারপর জঙ্গলে কাঠ আনতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়লাম, সিপিএম ছাড়িয়ে আনলো। বামফ্রন্ট আসার পর জোতদারদের কিছু জমি ভেস্ট করে বিতরণ করা হল, কিন্তু বীরসিংজোত গ্রামের কেউ জমি পায়নি, পাশে হোচাইমল্লিক-সেফেদল্লা গ্রামের লোক জমি পেয়েছে, ওখানে তো নেতারা থাকতো, সিপিএম নকশাল সব দলের। তাই ওখানকার মানুষ জমি পেয়েছে, অভিযোগের সুর তাঁর গলায়। সন্দেহ নেই, ভূমিহীনতা গ্রামবাংলার অন্য এলাকাগুলোর মতো এখানকার প্রান্তিক মানুষদেরও প্রধান সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে। দেশে কৃষি-বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা করলেও ভূমি-সংস্কারের কাজ এই নকশালবাড়িতে আজো অসমাপ্ত রয়ে গেছে। রয়ে গেছে জমি বণ্টন নিয়ে দলাদলির অভিযোগ।

হাতিঘিসা পঞ্চায়েত এলাকার ৪৬০০ পরিবারের মধ্যে ২৭৫০টি পরিবারই সরকারি তালিকায় দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থান করছে। এঁদের বেশিরভাগ ভূমিহীন। এই পঞ্চায়েতের মধ্যে পাঁচটি চা বাগান আছে। যাদের জমিজমা নেই বা সামান্য আছে, তাঁরা মূলত চা বাগানে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। কিন্তু এঁরা অধিকাংশই অস্থায়ী শ্রমিক, চা বাগানে সারা বছর কাজ পান না, ডিসেম্বর-জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি-তে চা বাগানে কাজ বন্ধ থাকে, তখন এঁরা ১০০ দিনের কাজ পেলে করেন, নতুবা কাজের সন্ধানে শিলিগুড়ি বা অন্যত্র চলে যান। চা বাগানে যখন কাজ থাকে না একমাত্র তখনই ১০০ দিনের কাজ হয়, কারণ বাগানে কাজের সময় ১০০ দিনের কাজ হোক সেটা বাগান মালিকরা চায় না। পঞ্চায়েতের সচিব প্রদীপ বিশ্বাস জানালেন, নকশালবাড়ি আন্দোলন ছিল মূলত জোতদার বিরোধী আন্দোলন। জোতদাররা ছিল রাজবংশী আর আদিবাসীরা ভূমিহীন। বড়ো জোতদাররা শিলিগুড়িতে থাকতো। নকশাল আন্দোলনের পর তারা জমি বিক্রি করে শহরেই থেকে যায়।

চারু কোল জানালেন, বাংলা ১৩৩৬ সাল নাগাদ এখানে আদিবাসীরা এসেছে, শিলিগুড়ির জমির মালিকরা আমাদের এখানে বসত করায়। এখন আদিবাসী ঘরের ছেলে-মেয়েরা পড়াশুনো করছে, তবে সাত-আট ক্লাশ পড়ার পর স্কুল ছেড়ে সবাই কাজে লেগে যায়। মূলত বাগানের কাজে। প্রতি বছর

মার্চ-এপ্রিল থেকে পুজো পর্যন্ত চা বাগানে কাজ মেলে। মজুরি ৯৫ টাকা, বছরে ৫টাকা করে বাড়ে। তবে বর্ষার সময়টা ভাদ্র মাস পর্যন্ত পাতা কাটার সিজন, তখন রোজগার বাড়ে। এক কিলো পাতা কাটলে ২.৫০-৩.০০ টাকা পাওয়া যায়, মেয়েরাই বেশি এই কাজ করে, একেকজন দিনে ৫০-৬০-৭০ কেজি অবধি পাতা কাটে। সবাই অস্থায়ী শ্রমিক, পাতা কাটা হয়, গাড়ি আসে, পাতা বোঝাই করে চলে যায়, পাতা শেষ হলে কাজও শেষ হয়ে যায়।

কিছু আদিবাসী পরিবার বন্ধকে জমি নিয়ে চাষ করে, যাদের বেশি জমি তারা নির্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে জমি বন্ধক দেয়। এছাড়া আদিবাসীদের নিজস্ব জমি, চাষবাস বা চাকরি-বাকরি কিছুই নেই। ১০০ দিনের কাজ দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জাতীয় কর্ম-সংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্পে বছরে ৩০ দিনও কাজ পায় না একেকটা পরিবার, আর মজুরি পেতে পেতে ১০০ দিন লেগে যায়। ভূমিহীন মানুষরা মজা করে বললেন, ১০০ দিন পর বেতন পাই তো, ওইজন্য এটা ১০০ দিনের কাজ। পঞ্চায়েত সচিব জানিয়েছিলেন, এই পঞ্চায়েত এলাকায় তথাকথিত গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে যেটুকু কাজ হয়েছে, তাতে মজুরি বাবদ ১৭ লক্ষ টাকা বাকি পরে গেছে। সরকার টাকা না দিলে এই মজুরি দেওয়া যাবে না।

বীরসিংজোত গ্রাম

বীরসিংজোত গ্রামের ৪২০টি পরিবারের মধ্যে ৪০ শতাংশ আদিবাসী আর ৬০ শতাংশ রাজবংশী। প্রায় ৩০০টি পরিবার ভূমিহীন, আদিবাসীরা সকলেই ভূমিহীন। এই গ্রাম থেকে নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য বিমল বর্মন কংগ্রেস দলের সাথে যুক্ত। বিমলের পরিবারের সবাই কোন না কোন রাজনীতির সাথে যুক্ত, দুই দাদা সিপিএম করেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিমলের লড়াই হয়েছিল নিজের দিদির সাথে, যিনি সিপিআই(এম)-এর প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতি কীভাবে পরিবারকে বিভক্ত করে দেয়, তা বোঝার জন্য এই পরিবারটি আমাদের বিশেষ আগ্রহ তৈরি করে। বিমল আক্ষেপ করে বললেন, জানেন আমার পরিবারের ভোট আমি পাইনি। গ্রামের লোক আমাকে দাঁড়াতে বললো দিদির মত নিয়েই আমি দাঁড়িয়েছিলাম, পরে দেখলাম সিপিএম দিদিকে আমার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিল। কিন্তু তাঁর পরিবারের বেশিরভাগ সদস্য সিপিএম হওয়া সত্ত্বেও তিনি কংগ্রেস দলের সমর্থক কেন হলেন? বিমল জানালেন, আমি প্রথম থেকেই কংগ্রেস করি, এই দলের একটা মর্যাদা আছে। শেষ পর্যন্ত ১৪ ভোটের ব্যবধানে তিনি দিদিকে হারিয়ে নির্বাচিত হন।

বিমলের মা বিমলের সাথেই থাকেন, তিনি বললেন, নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর মেয়ে কাঁদত, এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত ছেড়ে দিয়েছিল, এখন অবশ্য ভাই-বোনে ভাব হয়ে গেছে। কথায় কথায় জানালেন, আমার ঠাকুরদার অনেক জমি ছিল, বড়ো জোতদার ছিলেন। আমার স্বামী পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছিলেন, আমাদের বাড়িতে তাঁকে ঘরজামাই করে রেখেছিল সেই সময়।

নকশাল আমলের স্মৃতি তাঁর মনে আজো উজ্জ্বল। আক্ষেপ করে বললেন, তখন ওরা (বিদ্রোহী কৃষকরা) দিনের বেলায় জোতদারদের ধান লুঠ করে নিত। আমার ছোট মামাকে ওরা মেরেছিল। এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড়ো জোতদার জিতেন্দ্র নাথ রায়কেও নকশালরা কেটেছিল। জিতেন রায়ের অনেক জমি ছিল। এখনও ওদের পরিবারের হাতে ১০০ বিঘার ওপর জমি আছে। ৮ জন আধিয়ারকে ওরা অর্ধেক জমি লিখে দিয়েছে আর বাকি জমি মজুর দিয়ে চাষ করাচ্ছে। সেসময় জোতদারদের সবাই কংগ্রেস করত। পরে অনেকে সিপিএম হয়ে যায়। জিতেন রায়ের ভাইপো বরেন রায় সিপিএম-এর প্রার্থী হিসেবে মহকুমা পরিষদের সদস্য হন।

বামফ্রন্ট জমানায় সিপিএম করার স্বার্থে সম্পর্কটা স্পষ্ট হলো পঞ্চায়েত সদস্য বিমলের কথায়। বিমল বললেন, দাদা শিলিগুড়িতে অটো চালাত, তারপর সিপিএম-কে ধরে একটা স্কুলে কেরানির চাকরি পায়, সেজন্যই সিপিএম করে। দেখলাম, বিমলের ছিমছাম পাকা বাড়ি, তার মধ্যে একটা নতুন ঘর উঠছে, উনি সেই কাজের দেখাশুনো করছেন। বিমল বা তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যদের আর্থিক অবস্থা খুব ভালো না হলেও তাঁরা কিন্তু সেই জোতদার পরিবারেরই বংশোদ্ভূত, যাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এক সময় এই অঞ্চলের সীমানা ছাড়িয়ে সারা দেশে এমনকি দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিপ্লবী রাজনীতির আলোকবর্তিকা তুলে ধরেছিল। দেখা গেল, নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যাওয়া মাত্র সেই পুরনো ক্ষমতাসীন পরিবারগুলোর দাপটই ফিরে এলো সংসদীয় রাজনীতির হাত ধরে, ওই সমস্ত পরিবারের থেকেই নেতা হলেন, কেউ সিপিআই(এম)-এর কেউ বা কংগ্রেস দলের।

বর্তমানে টিএমসি-র দিকে কিছু মানুষ ঝুঁকছে। বিমল অভিযোগ করলেন, নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতি কংগ্রেসের দখলে ছিল, টাকা দিয়ে গৌতম দেব (উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের প্রধান নেতা এবং মন্ত্রী) কংগ্রেসের নির্বাচিত সদস্যদের কিনে পঞ্চায়েত সমিতির দখল নিল। বললেন, আমার মাসি কংগ্রেসের হয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সদস্য হয়েছিলেন, তাঁকে সাড়ে সাত লাখ টাকা দিয়ে গৌতম দেব কিনে নিয়েছেন। আমাকেও সাড়ে তিন লাখ টাকা অফার দিয়েছিল, আমি দল বদলাতে রাজি হই নি। আক্ষেপ করে বললেন, বামফ্রন্ট আমলে এমন টাকা দিয়ে জনপ্রতিনিধি কেনাবেচা হয়নি।

গ্রামের মানুষের প্রধান সমস্যা কাজ পাওয়ার। গ্রামে কাজ না মেলায় বেশিরভাগ মানুষ মজুর খাটতে চা বাগানে যান, নয়তো কাছাকাছি শহর এলাকায় রাজমিস্ত্রী বা যোগাড়ের কাজ

করে জীবিকার্জন করেন। মেয়েরা স্বনির্ভর গোষ্ঠী বানিয়েছেন, বিমলের স্ত্রী এমনই এক স্বনির্ভর দলের সদস্য। জানালেন, গ্রামে মোট ১২টা স্বনির্ভর দল আছে, প্রতি দলে ১০ জন করে মহিলা আছেন। তাঁরা নানান ক্ষুদ্র ব্যবসা করেন— কেউ মুড়ি ভাজেন, কেউ ফুলের চাষ করেন, এলাকার ১২ জন বৃদ্ধা-বৃদ্ধাকে সহায় প্রকল্পে খাবার রান্না করে দেবার কাজে যুক্ত কেউ কেউ। অন্যান্য দিন মজুরির কাজে পুরুষদের মজুরি যেখানে ১৫০ টাকা, মহিলারা সেখানে পান ১০০ টাকা। এর সাথে কেউ খাবার দেয়, কেউ দেয় না। যদিও আদিবাসী অধ্যুষিত এই এলাকায় মহিলারা পুরুষদের থেকে নিশ্চয় কম পরিশ্রম করেন না, কিন্তু মজুরির বেলায় নারী-পুরুষ বৈষম্য বেশ প্রকট।

বিমলের স্ত্রী এছাড়াও গ্রামের আইসিডিএস কেন্দ্রে সহায়িকার কাজ করেন, মাসে ১৮০০ টাকা মাইনে পান। বললেন, জিনিসের দাম এত বেড়ে গেছে, এই টাকায় পোষাচ্ছে না। তাঁর স্বনির্ভর দল ৫০,০০০ টাকা ঋণ পেয়েছে ব্যাঙ্ক থেকে, এই টাকা শোধ করে আরো বেশি টাকা পাবার আশা করছেন। রাষ্ট্র নানান প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে, খুঁদ-কুড়ো দিয়েও মানুষকে রাষ্ট্রের আওতায় রাখতে, রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী করে রাখতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যে স্থান থেকে একদা এই রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে ভাঙার লড়াই শুরু হয়েছিল, সেখানে এই ব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত করতে মনে হল আয়োজনের শেষ নেই। আর যারা ক্ষমতার কাছাকাছি আছেন, রাষ্ট্রীয় প্রসাদ যে তাঁর অন্যদের থেকে বেশি পাবেন, এতে আশ্চর্য কী? এদেশে সেটাই তো অলিখিত নিয়ম।

বিভাস কর্মকার

বিভাস বাবুলাল কর্মকারের ছেলে। তাঁর বাড়ি বীরসিংজোত গ্রামের পাশে, হোচাইমল্লিকজোত গ্রামে। দুই গ্রামের মাঝখানে এক ফাঁকা জায়গায় কয়েক মানুষ উঁচু এক শহিদ স্তম্ভ বাবুলাল বিশ্বকর্মকারের স্মৃতিকে ধরে রেখেছে। বিভাস বললেন, এখানে প্রতি বছর শহিদ দিবস পালন হয়। ১৯৭৮ সালে এই বেদিটা তৈরি করা হয়। সেই সময় এলাকায় অনেকেই আমাদের সমর্থক ছিলেন, এক ডাকে ১০০/১৫০ লোক বের হত। '৭৮ সাল থেকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে পরপর তিনবার এই কেন্দ্র থেকে সিপিআই(এম-এল) প্রার্থী হিসেবে হেমেন বর্মন জিতেছিলেন। ৮০-এর দশক পর্যন্ত সিপিআই(এম-এল) দলের একটা প্রভাব এলাকায় ছিল।

কাছেই কানু সান্যালের বাড়ি, বিভাস জানান, প্রথমে আমরা তাঁর সাথেই ছিলাম। তারপরে কানু সান্যাল পার্টি ছেড়ে দেওয়ায় আমরা খোকন মজুমদারের নেতৃত্বে সিপিআই(এম-এল) দলে যুক্ত হই। আশপাশের গ্রামে আমাদের সাথে বেশ কিছু লোকজন ছিল, মিটিং মিছিল করতাম। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর প্রথম দিকে আমরা কিছু আন্দোলন করেছিলাম, বাঁধ আটকে জমির টাকা আদায় করেছিলাম। কিন্তু বর্গা রেকর্ড হওয়ার পরে জমি নিয়ে আমাদের আন্দোলন স্তিমিত হয়ে গেল। সব আধিয়াররা ৫০ শতাংশ ফসলের বা জমির ভাগ পেল। কেউ কেউ ৭৫ শতাংশ অবদি ফসলের ভাগ পেয়েছেন বা এখনও পান। যেসব মালিক বাইরে থাকত, তারা নিজেদের জমি অর্ধেক বর্গাদারদের দিয়ে বাকি অর্ধেক বিক্রি করে দিল। ফলে বর্গাদাররা অনেকেই জমির মালিক হয়ে গেল।

বিভাস নিজেও বর্গা রেকর্ডের সুবিধা পেয়েছেন। তাঁর বাবা বাবুলাল ১২ বিঘা জমি আধিয়ার হিসেবে চাষ করতেন। বিভাস সেই জমির অর্ধেক অর্থাৎ ৬ বিঘার মালিকানা পান। সেই জমি প্রতি বিঘা ৩,৩০,০০০ টাকায় বিক্রি করেছেন বিভাস, অর্ধেক টাকা বোনকে দিয়েছেন, বাকি টাকায় আড়াই বিঘা জমি কিনেছেন, আর একটা টাটা ম্যাজিক গাড়ি কিনে সেটা লোক পরিবহনের কাজে লাগিয়ে জীবিকা উপার্জন করছেন। স্কুল বয়স থেকে পার্টি করেছিলেন বিভাস, যদিও অষ্টম শ্রেণী অবধি পড়ে স্কুল ছেড়ে দিতে হয়। তখন পুরোদমে রাজনীতি করেছেন, কিন্তু বয়েস বাড়ার সাথে সাথে সাংসারিক কাজের চাপ যেমন বেড়েছে, দলও ভাগাভাগি হয়ে দুর্বল হয়ে গেছে। বর্তমানে নিজের গাড়ি চালানোর পাশাপাশি আড়াই বিঘা জমি চাষাবাদ করেন।

বিভাসের মতে, পঞ্চায়েত হওয়ায় গ্রামের কিছু ভালো হয়েছে। এখানে অনেক জলের ঝরনা আছে, সেগুলোকে বাঁধ দিয়ে সেচের কাজে লাগানো হচ্ছে। এই সংসদ এলাকায় এরকম মোট ১২টা বাঁধ নির্মাণ হয়েছে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে। এছাড়া অনেক গরিব লোক পাকা বাড়ি পেয়েছেন। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বিমল সম্পর্কে বললেন, ইনি মানুষ হিসেবে ভালো, এই সংসদে যত লোককে বাড়ি পাইয়ে দিয়েছেন, সেটা একটা রেকর্ড। বোঝাই যায়, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে 'পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি' গ্রামীণ মানুষের গভীরে প্রভাব ফেলেছে। সিপিএম ক্ষমতায় আসার পর কিছু জমি ভেস্টও হয়েছে। এইভাবে সিপিএম তার প্রভাব বিস্তার করলো, আর নকশালপন্থীরা নানান দলে ভাগ হয়ে গেল। ফলে ধীরে ধীরে বেশিরভাগ নকশাল সমর্থক সিপিএম দলের সাথে চলে গেল।

বিভাসের অভিযোগ, নিজের নাম কামাবার জন্য নেতারা আলাদা আলাদা দল তৈরি করল, এখানে যাতায়াত বন্ধ করে দিল। শেষ অবধি খোকন মজুমদার আসতেন, তিনিও অশক্ত হয়ে পড়লেন, আসা-যাওয়া কমে গেল, তাই আমরাও বসে গেলাম। তবে অন্য কোন দলে যাই নি, অন্য দল করা আমার উচিত হবে না, আমি বসে থাকলেও অনেক সম্মান পাব, অন্য দলে গেলে লোকে বলবে অমুকের ছেলে দল পালটেছে।

লক্ষণীয় হলো, বিভাসের কাছে সিপিআই(এম-এল) হচ্ছে সেই পার্টি, যে পার্টির জন্য তাঁর বাবা প্রাণ দিয়েছেন, যদিও এই পার্টি হওয়ার আগেই বাবুলাল শহিদ হয়েছিলেন। তাঁর এই

মনোভাব থেকেই কানু সান্যাল পার্টি ছেড়ে দেওয়ার পর প্রতিবেশী গ্রামে বাস করা সত্ত্বেও কানুবাবুর সংস্রব তিনি ছেড়ে দেন। বললেন, কানুবাবুর গ্রামে তাঁর কিছু সমর্থক ছিল বটে, তবে এদিকের সবাই সিপিআই(এম-এল)-এর সাথেই ছিলেন।

বাবুলালের শহিদত্ব তাঁর গ্রামকে এবং বাবুলালের সন্তান হিসেবে তাঁকে যে মর্যাদা দিয়েছেন, সে সম্পর্কে সচেতন বিভাস এমন কিছু করতে চান না, যা সেই মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করবে, বিশেষত তাঁর বাবার নাম কালিমালিপ্ত করবে। গ্রামের অন্য লোকজন এখন বিভিন্ন দলের সাথে কমবেশি যুক্ত হয়েছেন, কিন্তু তিনি স্থির-প্রতিজ্ঞ অন্য দলে যাবেন না। জিজ্ঞেস করি, দলের প্রার্থীর অবর্তমানে পঞ্চায়েত নির্বাচনে তিনি কোন প্রার্থীকে সমর্থন করবেন। বিভাস জানালেন, আমি সিপিএম-কে সমর্থন করব, ওরা লাল বলেই ওদের সমর্থন দেব। এখন জাতিভিত্তিক দলাদলি বাড়ছে, যেজন্য আদিবাসী বিকাশ পরিষদ তৈরি হয়েছে। তাঁর মতে, জাতপাত-ভিত্তিক দল করা ভালো নয়।

অবশ্য জাত-পাত-ভিত্তিক দল গড়ার বিরোধী হলেও ধর্মের প্রতি তাঁর আস্থা ভালই আছে। বিভাস জমি বিক্রির টাকায় নিজের বাড়িটা পাকা করেছেন, সাথে একটা কালী মন্দিরও বানিয়েছেন। বাড়িতে ঢুকলেই সেটা নজরে পড়বে। বললেন, বাবা কালী পুজো করতেন, আমিও করি। কমিউনিস্ট পার্টি করার সাথে কালী পুজো করার কোন দ্বন্দ্ব আছে বলে তিনি মনে করেন না। ছোট বেলা থেকে পার্টি-সংসর্গে থেকেও ধর্মের বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি খুব বদলায়নি।

আসলে আমাদের দেশে কমিউনিস্ট পার্টির অনুশীলনে যতটা আর্থিক সাম্যের কথা বলা হয়েছে, সামাজিক সাম্যের কথা সেই অনুপাতে কখনই গুরুত্ব পায় নি। নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য, ধর্মে ধর্মে ভেদাভেদ, একই ধর্মের মধ্যে বর্ণ ভিত্তিক অসাম্য— এসব আলাপ-আলোচনার কেন্দ্র উঠে আসেনি। অথচ পিতৃতান্ত্রিকতা, ধর্মীয় বিশ্বাস বা বর্ণাচরণ আমাদের জন-সমাজকে ভেতরে থেকে টুকরো করে রেখেছে, সমাজের অস্থি-মজ্জায় মিশে আছে, সেজন্যই এত সহজে একটা সাম্প্রদায়িক দল দেশজুড়ে মাথাচারা দিতে পেরেছে। সেকুলার সংস্কৃতির সুদীর্ঘ ঐতিহ্য ও বাম আন্দোলনের একটা ধারাবাহিকতা থাকার দরুন পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক শক্তির প্রাদুর্ভাব আজো তেমন চোখে পড়ার মতো না হলেও, অদূর ভবিষ্যতে এই শক্তির মাথাচাড়া দেবার ক্ষেত্র ভেতরে ভেতরে তৈরি হচ্ছে বলেই মনে হয়। বিভাসের কথায় যে প্রশ্নটা মাথায় এলো তা হলো, এত নামের এত বামপন্থী সংগঠন দীর্ঘকাল ধরে এরাজ্যে কাজ করা সত্ত্বেও তাদের নিজেদের কর্মীদের মধ্যেও ধর্ম-হীন চেতনার প্রসার ঘটাতে পারেনি কেন?

এপ্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ আছে, আপাতত তা তোলা থাক। আমরা নকশালবাড়ি অঞ্চলের এই সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা শেষ করবো ঝর্ণা সিং-এর সাথে কথাবার্তা দিয়ে। এই ভদ্রমহিলা কংগ্রেসি পঞ্চায়েত সদস্য বিমলের দিদি, যিনি সিপিআই(এম) দলের হয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনে নিজের ভাই-এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। জানালেন, ৩৫ বছর ধরে সিপিএম দল করছি, তখন তো ওই দলটাই ছিল। তখন থেকে ওই দলটাকে বিশ্বাস করেছি, আর যেটা বিশ্বাস করি সেটা তো চট করে ছাড়া যায় না। সিপিএম ক্ষমতায় আসার পর বর্গা রেকর্ড হয়েছে, বর্গা জমি বিক্রি তখন বন্ধ ছিল, বর্গা জমি যাতে বিক্রি না হয়, সে নিয়ে আমাদের আন্দোলন ছিল। আর এখন টিএমসি আর কংগ্রেস মিলে বর্গা জমি সব বিক্রি করে দিচ্ছে। এর ফলে জমির দাম হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে, আর বাড়ছে ভূমিহীনতাও। বামফ্রন্ট থাকলে এমনটা ঘটত না বলে তাঁর বিশ্বাস।

ফেরার পথে নজরে এলো, বহু অনাবাদী জমিতে ছোট ছোট পিলার পুঁতে রাখা আছে, এগুলো বাইরের লোকের হাতে জমি বিক্রয়ের লক্ষণ। কারণ গ্রামের লোক জমি কিনলেও পিলার দিয়ে তা চিহ্নিত করেন না। ইদানীং শহরের উঠতি পয়সাওয়ালা লোকজন এদিকে জমি কেনা শুরু করেছে, শিলিগুড়ি বাড়তে বাড়তে নকশালবাড়িকেও গ্রাস করবে কোনদিন। এই চিহ্নগুলো সেই নগরায়ণের পূর্ব-চিহ্ন। বামফ্রন্টও তো নগরায়ণের জন্য রাজারহাট মরুভূমি করে দিয়েছে। সেকথা ঝর্ণা সিং-কে কে বোঝাবে? পার্টি তো এ রাজ্যে ধর্মীয় বিশ্বাসের মতোই গোঁড়ামি তৈরি করেছে। ঝর্ণার স্বীকারোক্তি, বিশ্বাস তো চট করে ছাড়া যায় না। রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণ মানুষের এই বিশ্বাসের ওপর ভর করে টিকে আছে। এক দল থেকে অন্য দলে গেলেও সেই বিশ্বাস অবলম্বন করেই মানুষ যাচ্ছেন।

যাই হোক, একটা বিষয় পরিষ্কার, সময়ের সাথে সাথে সবকিছু যেমন বদলাচ্ছে, নকশালবাড়িও বদলাচ্ছে। ষাঠ-সত্তর দশকের নকশালবাড়িকে, সেদিনের সেই উত্তাল আন্দোলনের নকশালবাড়িকে যেমন আজকের নকশালবাড়ি দিয়ে বোঝা যাবে না, তেমনি সেই আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আজকের নকশালবাড়িকে ধরা যাবে না, বোঝা যাবে না। যদিও যে সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নকশালবাড়ি বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়েছিল, অন্যায়-অসাম্যে ভরা সেই সমাজ-ব্যবস্থার কোন মৌলিক পরিবর্তন হয়নি, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে জন-সমাজে সমস্যার ধরনগুলো, সংকটের ধরনগুলো এবং সেই সাথে মানুষের ভাবনার ধরনগুলো বদলে যাচ্ছে। সংগঠিত শাসক দলগুলো মানুষের ভাবনা-চিন্তাকে প্রভাবিত করার জন্য হরেকরকম পসরা নিয়ে প্রত্যন্ত গ্রামে-গঞ্জে ঢুকে পড়ছে। রাষ্ট্র-কেন্দ্রিক রাজনীতি আজকের নকশালবাড়িতে সেদিনের তুলনায় অনেক গভীর আস্তানা গেড়েছে। ভবিষ্যতে কোনো বিপ্লবী ঝড় কি সংসদীয় রাজনীতির এই মহীরুহকে উৎপাটিত করতে পারবে? নকশালবাড়ি থেকে ফেরার পথে সেকথাই মনে হচ্ছিল।

নকশালবাড়ি

বজ্র-নির্ঘোষ— সেনাপতি ও পদাতিকের দৃষ্টিতে

সহদেব মন্ডল

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন নেতৃবৃন্দ পশ্চিমবঙ্গের তরাই-এর কোলে ঘটমান একটি কৃষক-আন্দোলনকে ''ভারতের বসন্তের বজ্র-নির্ঘোষ'' বলে বর্ণনা করে উত্তরবঙ্গের তদানীন্তন প্রান্তিক অঞ্চল 'নকশালবাড়ি' নামকে আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক প্রশ্নে বিতর্কের সূত্র ধরে ১৯৬৪-তে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে প্রথম বিভাজন আসে— ১৯৬৯ সালে জাতীয় স্তরে নকশালবাড়ি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ঘটে দ্বিতীয় বিভাজন। তার পর গঙ্গা-মেকং বারে বারে লালে লাল হয়েছে, আজাদ হিন্দ ফৌজ-এর আহ্বানে আপ্লুত হয়ে সৈনিক হিসেবে যুদ্ধে যোগদানের পর ১৯৪৭-উত্তর ভারতে জাত-পাত-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে নতুন স্বপ্ন নিয়ে এক বিপুল জনগোষ্ঠীর একটি আন্দোলনে প্রাণকে বাজি রেখে ঝাঁপিয়ে পড়ার বিষয়টি, আজ, ঘটনার প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে, জাতির জীবনে এক সুনিশ্চিত সমাজ-বাস্তবতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

এই আন্দোলনকে তাত্ত্বিক দিক থেকে সমালোচনা যেমন অব্যাহত, আন্দোলনটিও স্রোতের মতো বহমান, তেমনি সমগ্র বাস্তবতাটিকে তুচ্ছতায় পর্যবসিত করে, দুর্বলতাগুলিকে সাধারণ প্রবণতা হিসেবে চিহ্নিত করে কুৎসায় লিপ্ত হওয়ার দৃষ্টান্তও সুপ্রচুর। প্রতিষ্ঠিত লেখকরা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে হয় নির্লিপ্ত থেকেছেন, নয় কোমর বেঁধে নেমে পড়েছিলেন পাঁক ঘাঁটতে। আন্দোলনটি স্তিমিত হয়ে আসার পর তাঁদেরই অনেকে আবার এই আন্দোলনের দলিত নেতাদের নায়ক করে মহান উপন্যাস রচনায় হাত লাগিয়েছেন, সমাজের মানুষের এই সমস্ত কর্মী-নেতাদের প্রতি গভীর মমত্বকে নিজেদের ব্যবসায়িক পুঁজি করার উদগ্র তাগিদে।

এই প্রেক্ষিতে জরুরি ছিলো আন্দোলনের কুশীলবদের আন্দোলনটি সম্পর্কে অতিকথার ধোঁয়াশা নির্মূল করে সরল সত্যগুলিকে নির্মোহ দৃষ্টিতে জনসমক্ষে নিয়ে আসা। সুখের কথা, ইতিহাস হয়ে ওঠার দ্বারপ্রান্তে উপনীত এমন এক গুরুত্বপূর্ণ গণজাগরণের কাহিনী উন্মোচনের জন্য এগিয়ে এসেছেন সেই আন্দোলনের প্রাণপুরুষ নেতৃবৃন্দ এবং বেশ কিছু 'সক্রিয় সৈনিক'। এঁদের কাহিনী-চিত্রণে পরবর্তী প্রজন্মের মানুষরা, যাঁরা জন্মেছেন এই গণজাগরণের বিষয়টি ইতিহাস হয়ে উঠছে এমন কালপর্বে, তাঁরা ইতিহাসের কিছু প্রাথমিক উপাদান সংগ্রহ করে নিজের মতো করে আন্দোলনটির মূল্যায়ণে ব্রতী হতে পারবেন।

নকশালবাড়ি আন্দোলন গড়ে তোলা, স্থানীয় স্তরে নেতৃত্ব দেওয়া এবং সক্রিয় থেকে যাওয়া, এই তিনটি দিকের সঙ্গেই যিনি জড়িত ছিলেন, সেই খোকন মজুমদার তাঁর স্মৃতিকথা, ''বসন্তের বজ্র-নির্ঘোষ'' প্রকাশ করেছিলেন বেশ কিছু বছর আগে। উত্তরবঙ্গ থেকে প্রকাশিত এই ছোটো বইটি তার প্রয়োজনীয় প্রচার পায়নি— বর্তমানে প্রায় দুষ্প্রাপ্য বইটি স্থানীয় স্তরে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রায় আনুপূর্বিক বিবরণে, বিশেষত প্রত্যক্ষদর্শীর জবানিতে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। বইটি অবশ্য স্থানীয় স্তর অতিক্রম করে বিস্তীর্ণ প্রেক্ষিতটি তুলে ধরেনি— ফলে পাঠক এখানে বজ্র-নির্ঘোষ-এর পরিবর্তে গম্ভীর মেঘ-গর্জনের শব্দ শুনবেন— আসন্ন প্রলয়ের ইতিউতি ইঙ্গিত থাকলেও তার সংহত রূপটি চোখে পড়বে না।

দ্বিতীয় বইটি এই আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক, তাত্ত্বিক শ্রী সুনীতি কুমার ঘোষ-এর ইংরেজি পুস্তক— ''Naxalbari–Before and After : Reminiscences and Appraisal''। এই বইটির অধ্যায় বিন্যাস থেকে পাঠক নকশালবাড়ি আন্দোলনের পূর্বাপর, পরম্পরা এবং বিস্তীর্ণ প্রেক্ষিতটি পেয়ে যাবেন। নকশালবাড়ি অঞ্চলের জমির অধিকারের আইনি লড়াই-এর পরবর্তী ঘটনা কেমন ভাবে ''কৃষি বিপ্লব''-এর ডাক-এ রূপান্তরিত হলো, কেমনভাবে সারা ভারতের কমিউনিস্ট ঘরানায় দীর্ঘকাল অনুপস্থিত তাত্ত্বিক বিতর্ক আবার শুরু হলো, তার আনুপূর্বিক বিবরণ মিলবে এই বইটিতে। নকশালবাড়ি অঞ্চলের বাইরে, জাতীয় এবং রাজ্যের স্তরে কীভাবে এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে উদ্দীপনা জেগে উঠলো, কীভাবে গড়ে উঠলো সারা ভারতের বিপ্লবীদের কেন্দ্রীয় সমন্বয়, কেমনভাবে শহরে হাজির হলেন সুদূর প্রত্যন্তের স্থানীয় আন্দোলনের নায়ক এবং নায়িকাবৃন্দ, তার চিত্তাকর্ষক বিবরণ দিয়েছেন সুনীতিবাবু তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। আবার এই আন্দোলনের মধ্যেকার তাত্ত্বিক এবং বিতর্কিত প্রশ্নগুলি, সেগুলিকে ঘিরে আবর্তিত নায়ক এবং সৈনিকবৃন্দের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে বিতর্ক পরিচালনার ধারা, সর্বোপরি সুনীতিবাবুর আন্দোলনের ভেতরে থেকে আন্দোলন সম্পর্কে ইতিবাচক সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী পাঠককে ঋদ্ধ করবে, ভাবাবে এবং অন্বেষণে উদ্বুদ্ধ করবে সন্দেহ নেই।

নকশালবাড়ি-র আন্দোলনে সুনীতিবাবুর প্রত্যক্ষ কোনো যোগাযোগ ছিলো না— সেকথা সুনীতিবাবু অকুণ্ঠচিত্তে পাঠকদের জানিয়েছেন। বস্তুত নকশালবাড়ির আন্দোলন পর্বে নকশালবাড়ি সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ ছিলো ঐ অঞ্চলের প্রবেশ পথে কয়েক ঘণ্টার ঝটিকা সফর— যা

তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন এই ভাষায় : ১৯৬৯-এর এপ্রিল মাসের কোনো সময় শিলিগুড়ির প্রখ্যাত চিকিৎসক কে এন চ্যাটার্জীর গাড়িতে সুনীতিবাবু, চারুবাবু এবং ডঃ চ্যাটার্জী নকশালবাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা দেন। রাস্তায় এক স্থানে থামেন, সেখানে কয়েকজন কৃষকের সঙ্গে সদ্য জেল-মুক্ত কানু সান্যাল, সৌরেন বসু বসেছিলেন। চারু মজুমদার সেই ছোট কৃষক জমায়েত-এ বক্তব্য রাখেন— কানু সান্যাল চারুবাবুকে কিছু প্রশ্ন করেন, চারুবাবু তার জবাব দেন। শিলিগুড়ি থেকে গাড়ি ফিরে আসে, তাঁরা তিনজন শিলিগুড়িতে প্রত্যাবর্তন করেন। সুনীতিবাবু ক্ষোভের সঙ্গে লিখেছেন— "আমি চারপাশ ঘুরতে পারিনি, গ্রামের কৃষকের সঙ্গে কথাও বলতে পারিনি। আমি দিনের আলোতে নকশালবাড়ি অবলোকনে বঞ্চিত হয়েছি— আমি অঞ্চলটিকে দেখেছি নিশীথের আবরণে।" (পৃ. ১৮১)

সুনীতিবাবুর বর্ণনায় নকশালবাড়ি অঞ্চল, সেই অঞ্চলের আন্দোলনের সূত্র এবং চলমান আন্দোলন নিয়ে যাবতীয় মন্তব্য এবং আলোচনার উৎস মুখ্যত এবং প্রায় সর্বাংশে কানু সান্যালের বিভিন্ন লিখিত প্রতিবেদনগুলি। বস্তুত নকশালবাড়ি আন্দোলনের ইতিহাস বর্ণনা করে যাবতীয় বই-এর তথ্যের আকর এবং উৎসই হলেন কানু সান্যাল। সুনীতিবাবু তাঁর ইংরাজি পুস্তকের ১২৬ পৃষ্ঠায় স্পষ্ট স্বীকৃতি দিয়ে লিখেছেন : "We shall depend mainly on Kanu Sanyal to tell the story" (আমরা এই আখ্যান [নকশালবাড়ির পূর্বক্ষণ বর্ণনার] বর্ণনায় মূলত কানু সান্যালের ওপরই নির্ভর করবো।) এই ঘটনা তাই আকস্মিক নয় যে ১৯৬৯-তে যখন ভারতের তৃতীয় কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হচ্ছে কলকাতার শহিদ মিনারে, তখন চারু মজুমদার সেই মঞ্চে বক্তৃতা দিতে উঠে বলছেন নকশালবাড়ির সৃষ্টিকর্তা কানু সান্যাল!

একথা তাই সর্বজনগ্রাহ্য যে নকশালবাড়ির আন্দোলনের প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা কানু সান্যালের নিজস্ব প্রতিবেদন ব্যতীত অসম্পূর্ণ, কার্যত খণ্ডিত প্রচেষ্টায় পরিণত হতে বাধ্য। কানু সান্যাল ইতিপূর্বে কয়েকটি দলিলের মাধ্যমে নকশালবাড়ির ইতিহাস নিয়ে কিছু আলোকপাতে প্রয়াসী হয়েছিলেন, যেগুলি নিয়ে বিতর্কও কম হয়নি। সুনীতিবাবু এই সব দলিল নিয়ে তাঁর নিজস্ব সমালোচনামূলক মন্তব্য করেছেন বিশদে। দলিল ছাড়াও কানুবাবু তাঁর নিজস্ব গোষ্ঠীর মুখপত্রে বেশ কয়েকটি ধারাবাহিক ইতিহাস লিখেছেন, যার প্রচার সীমিত থেকেছে তাঁর গোষ্ঠীর কর্মীদের মধ্যে।

তরুণ সাংবাদিক বাপ্পাদিত্য পাল তাঁর First Naxal বইতে, সাংবাদিকের দৃষ্টিকোণ থেকে কানুবাবুর দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিয়ে প্রায়শই কানুবাবুর নিজস্ব জবানে কানুবাবুর বর্ণময় জীবনকে আমাদের সবাই-এর কাছে উন্মুক্ত করেছেন। শ্রী পালের বর্ণনায় বইটি কানু সান্যালের অনুমতিপ্রাপ্ত একমাত্র জীবনীগ্রন্থ। এজন্য তাঁর ধন্যবাদ প্রাপ্য। পাশাপাশি এ কথা দুঃখ এবং লজ্জার সঙ্গে উল্লেখ করতেই হয় যে নানা গোষ্ঠী, এমনকি বেশ কয়েকটি পার্টি-তে বিভক্ত সেই তৃতীয় ধারার কমিউনিস্ট আন্দোলনের উত্তরসূরীবৃন্দ, সেই আন্দোলনের জীবিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে একজোট হয়ে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনের ইতিহাস, দলিলপত্র সংরক্ষণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগই নিলেন না। আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লড়াই-এ বন্দুকের গুলির পাশাপাশি ইতিহাস অন্যতম এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। তাই সুদীর্ঘ লংমার্চ-এর সময় অষ্টম রুট বাহিনী তাদের পার্টির মহাফেজখানা বহন করতো এবং তাকে রক্ষা করার অগ্রাধিকার ছিলো পার্টির চেয়ারম্যানকে রক্ষা করার অগ্রাধিকারের চেয়েও বেশি— বেআইনীভাবে সীমান্ত পার হওয়ার সময় পলাতক লেনিন সঙ্গে বহন করতেন ইস্ক্রার ফাইল।

সাংবাদিকের চোখ দিয়ে, বিশেষত নকশালবাড়ি-আন্দোলন-উত্তর প্রজন্ম-র চোখ দিয়ে কানুবাবুর বর্ণময় জীবন এবং যোদ্ধাসুলভ জীবনচর্যা যে তার পূর্ণতা নিয়ে বাপ্পাদিত্ত-র কলমেও ধরা পড়েছে এমন বলা যায় না। শৈশব থেকে একজন সাধারণ মানুষ রসায়নের কী নিয়মে বিপ্লবীতে রূপান্তরিত হচ্ছেন, কানুবাবুর নিজের কথায় তা অসম্ভব জীবন্ত হয়ে উঠেছে। প্রতিবেশীর প্রিয় গাছ ব্যক্তিগত আক্রোশে ধ্বংস করার গ্লানি কানুবাবু সারাজীবন বহন করেছেন। চা-বাগিচা শ্রমিকদের সংগঠিত করা থেকে প্রতিটি গণআন্দোলনে তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি ক্রমে তাঁকে নেতৃত্বের স্তরে উন্নীত করবে তাতে আর সন্দেহ কী?

এই বই-এর দীর্ঘ অংশ জুড়ে রয়েছে কানু বাবুর বয়ানে চীনে পাড়ি দেওয়ার কাহিনী, সেখানে চীনে অবস্থানকালে তাঁদের অভিজ্ঞতা এবং কানুবাবুর ভবিষ্যত রাজনৈতিক জীবনে সেই অভিজ্ঞতার অভিঘাতজনিত আলোচনা। কানুবাবু তাঁর সাক্ষাৎকারে সবিস্তারে বাপ্পাদিত্ত-র নকশালবাড়ি অঞ্চলে কৃষক আন্দোলন সংগঠনের পটভূমি বর্ণনা করেছেন। আলোচনায় এসেছে গণআন্দোলন-গণসংগঠন নিয়ে চারু মজুমদারের সঙ্গে তাঁর বিতর্কের বিষয়গুলিও, সেগুলি আজ নানা সূত্র থেকে সমর্থিত। এই সাক্ষাৎকারে কানুবাবু-র আগের লেখার তুলনায় তথ্য রয়েছে বেশি— তার চেয়েও বেশি রয়েছে কৃষক আন্দোলনের পাশাপাশি অন্যান্য গণআন্দোলনের সঙ্গে কৃষক এবং চা-শ্রমিক আন্দোলনের আন্তঃসম্পর্ক। কীভাবে ছাত্র-যুব আন্দোলন থেকে ট্রেড ইউনিয়ন এবং কৃষক আন্দোলনে ধাপে ধাপে কানুবাবু অভিজ্ঞতা-সম্পৃক্ত হচ্ছেন কীভাবে তিনি আদি কর্মীদের কাছ থেকে প্রশিক্ষিত হচ্ছেন, তার বর্ণনা আমাদের সমৃদ্ধ করে। চলমান জঙ্গী আন্দোলনের বর্ণনার ফাঁকে কানুবাবু ফিরে গেছেন তাঁর পরিবার-পরিজনের কথায়, তাঁর মা-র কথা এসেছে বারে বারে। প্রকৃত ভূমিপুত্রর মতো তিনি উত্তরবঙ্গের বাগিচা আর প্রত্যন্ত প্রান্তে বিচরণ করেছেন, অশেষ কষ্ট সহ্য

করেছেন, গ্রেফতারি পরওয়ানা নিয়ে ঘুরেছেন, ঝুঁকি নিয়েছেন এবং অবশেষে পুলিশের জালে ধরা পড়েছেন। জেলে থেকে মতাদর্শগত বিতর্ক পরিচালনা করেছেন, বিখ্যাত দু'জন-এর চিঠি-র তিনি অন্যতম স্বাক্ষরকারী।

জেল থেকে ফিরে তিনি ঐক্যবদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি এবং আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে ব্যস্ত থেকেছেন, বহুবার বহু গোষ্ঠীর সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়েছেন, জোট ভেঙেছে আবার তিনি জোট গড়ার কাজে অদম্য উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। জীবন যাপনে, মননে তাঁর ছিলো নতুন মানুষে পর্যবসিত হওয়ার অনমনীয় আগ্রহ। তাঁর মাপের নেতারা আমাদের অভিজ্ঞতায় দূরের মানুষ, গাড়ি করে ঘোরেন, তাঁদের জন্য বরাদ্দ একজন সর্বক্ষণের পরিচালক। কানুবাবু থাকতেন হাতিঘিসায় একটি জীর্ণ কুঁড়ে ঘরে— নিজের সব কাজ নিজেই করতেন। খাবার আসতো একজন কমরেড-এর বাড়ি থেকে। বাড়িতে ফোন ছিলো না, ফ্যাক্স ছিলো না, ছিলো না ইন্টারনেট— থাকার মধ্যে ছিলো একটি বৈদুতিক পাখা, খানকয়েক চেয়ার আর শক্ত কাঠের বিছানা। সমাজ বিপ্লবের স্বপ্নে বিভোর স্বপ্নসন্ধানী মানুষটি এই কৃচ্ছসাধন, নাকি সাধারণ মানুষের মতো অসাধারণ জীবনযাপন চালিয়ে গেলেন আমৃত্যু, তা থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কী শিক্ষা নেবে তা নির্ভর করছে, কানুবাবু প্রদর্শিত আন্দোলনের ইতিবাচক দিকগুলি বর্তমান সমাজে কতটা শেকড় চালাতে সমর্থ হয়েছে তার ওপর। বাপ্পাদিত্যবাবুর বর্ণনায় কানুবাবুর এই দিকটি দরদী বর্ণনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। কিসের তাড়নায় কানুবাবু তাঁর এই শেষ জীবনের মর্মান্তিক পরিণতি ঘটালেন বাপ্পাদিত্তবাবুর সাক্ষাৎকারগুলি থেকে তাঁর বিন্দুমাত্র ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না। আত্মননের পূর্ব মুহূর্তে রচিত তাঁর শেষ কবিতায় মায়াকভ্স্কি লিখেছিলেন : ''এই তো সময়, কথা বলবার যুগ, ইতিহাস আর সৃষ্টির উদ্দেশে'। কানুবাবু তাঁর সমগ্র জীবন, সমগ্র অনুশীলন দিয়ে জেগে ওঠা মানুষের বার্তাবহ সৈনিকই রয়ে গেলেন।

কানু সান্যাল বা সুনীতিবাবুর মতো নেতৃবৃন্দ যে সমস্ত সৎ ''সিভিলিয়ান''দের সৈনিকে পরিণত করার ব্রত নিয়ে সারা জীবন অতিবাহিত করলেন, সেই ''পদাতিক সৈনিকবৃন্দ''-ও সম্প্রতি বুলেটের বদলে বা কখনও একই সঙ্গে কলম তুলে নিয়েছেন।

''সৈনিক''-দের আত্মকথনেও দুটি সুস্পষ্ট ছাপ নজরে আসে— স্থানীয় আন্দোলনের উপাখ্যান এবং স্থান-কাল অতিক্রম করে বৃহত্তর প্রেক্ষিতের কথকতা। শ্রীভারতজ্যোতি রায়চৌধুরী ঐতিহাসিক ''বীরভূম ষড়যন্ত্র মামলা'' (এই মামলার অন্যতম অভিযুক্ত ছিলেন ভারতজ্যোতির পিতৃদেব) থেকে ''দৌড়'' শুরু করে পৌঁছেছেন নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রভাবে বীরভূম আন্দোলন পর্বে। উঠে এসেছেন স্থানীয় সংগঠকরা, এসেছেন অমূল্য সেন এবং আরও কত নিবেদিত-প্রাণ কৃষক-শ্রমিক কমরেড। রয়েছে রোমাঞ্চকর চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপ দিয়ে পলায়ন, আবার নকশালপন্থী কর্মী বলে সগর্ব পরিচয় প্রদানে নিশ্চিন্ত আশ্রয় পাওয়ার কথাও। নকশালবাড়ি স্তিমিত হয়ে আসার পর অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে চূড়ান্ত বিদ্রোহের ঐতিহ্যবাহী— ডেবরা-গোপীবল্লভপুর। শেষ পর্যন্ত আধা-সেনা নামিয়ে সেই আন্দোলনকে দমন করে রাষ্ট্র। মূলত গ্রাম-কেন্দ্রিক এই দুই আন্দোলনের পর পশ্চিমবঙ্গে তো নিশ্চয়ই, সারা ভারতের নজর কাড়ে শহর-কেন্দ্রিক আন্দোলন- বীরভূম। বীরভূমের আন্দোলনের তীব্রতায় সেদিনের সেই তীব্র সন্ত্রাস এবং রাষ্ট্রপতির শাসনের কালেও সেনাবাহিনী নামিয়ে, মৃত্যু আর হত্যার রক্তগঙ্গা বহিয়ে দিয়ে, বেপরোয়া রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের লাগামহীন ঘোড়া ছুটিয়ে সেই আন্দোলনের আপাত যবনিকাপতন ঘটে। ভারতজ্যোতিবাবুর বই-এর শেষে শহিদের তালিকা এবং উদ্ধার হওয়া অস্ত্রশস্ত্র-র বিবরণ পড়লে আন্দোলনের গভীরতা সম্পর্কে আমাদের একটা ধারণা তৈরি হয়।

শ্রী অভিজিৎ দাস (জয়ন্ত জোয়ারদার নামে যিনি প্রচুর গল্প এবং একটি উপন্যাস লিখেছেন সত্তরের নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে) সম্প্রতি তাঁর স্মৃতিকথা প্রকাশ করেছেন— Foot-prints of Foot Soldiers– পদাতিকের পদচিহ্ন। নকশালবাড়ি আন্দোলন যে শহরের চেয়ে ভারতের, বিশেষত পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলের সংবেদনশীল ছাত্র-যুবদের বেশি নাড়া দিয়েছিলো, তা এই সমস্ত অমূল্য স্মৃতিকথা থেকে জানা যাচ্ছে। মালদা জেলার কৃতি ছাত্র অভিজিৎ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে এলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে, ষাটের দশকের মাঝামাঝি। প্রেসিডেন্সি কলেজের আন্দোলন এবং তার প্রচার থেকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এমন ধারণা হতেই পারে যে ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু বুঝি মধ্য কলকাতা। অভিজিৎবাবুর লেখা থেকে আমরা যাদবপুর এবং সংলগ্ন অঞ্চলের গণআন্দোলন গড়ে ওঠার বিস্তৃত ধারাবিবরণী পেয়ে যাই— পেয়ে যাই আন্দোলনের টুকরো থেকে গড়ে ওটা এক সম্পূর্ণ মানচিত্র। অভিজিৎ আর শহর কলকাতায় আটকে থাকেন নি, আন্দোলনের জন্য ফিরেছেন তাঁর শিকড়ে, পরবর্তীকালে বিহারে। বিবরণ আর বিশ্লেষণের জোড় কদমে এগিয়েছে কাহিনী— তুলে ধরেছে বৈচিত্র্যময় চরিত্র আর সংগ্রামের এক অনন্য ইতিকথা। চারু মজুমদারের সম্পর্কে এসে, তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ আলোচনা করার সুযোগ যাঁদের হয়েছিলো, সেই প্রজন্ম আজ দ্রুত ইতিহাস হয়ে উঠছেন। অভিজিৎবাবু সেই বিরল প্রজন্মের মানুষ, যিনি আন্দোলনের শুরুর দিকেই চারুবাবুর পরামর্শ পেয়েছিলেন, অনুশীলন করেছিলেন এবং সক্রিয়তার মাধ্যমেই সেই সমস্ত পরামর্শের তুল্যমূল্য বিচারের সুযোগ পেয়েছেন। সংগ্রামের এক বাঁকে প্রায় বন্ধুহীন অভিজিৎ লিখেছেন জনপ্রিয় চলচিত্রের কাহিনীরূপ বা প্রায় চিত্রনাট্য— যুক্ত থেকেছেন বেতারের সেই কালের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান—

'বোরোলিনের সংসার'-এর সঙ্গে। জীবনের এক অসহনীয় মুহূর্তে মায়ের ডাকে ফিরেছেন কলকাতায়, যে কলকাতা সে কালের এক লেখকের ভাষায়, ''আঁজলা আঁজলা রক্ত উগরে কুত্তার মতোন হাঁপাচ্ছে।'' তৈরি করলেন নতুন ধরনের সংগঠন, বই-এর দোকান, এর নতুন মতবাদিক প্রয়াস— 'বুকমার্ক'। প্রকাশিত হতে থাকলো অনেক জরুরি বই, পুস্তিকা, কবিতা সংগ্রহ। ''বিনা দফা''-র প্রহারে এক ঝাঁক নির্মল বাতাস। জরুরি অবস্থা— কলেজ স্ট্রীট বাজারের বুকমার্ক-এর দোকান ছেড়ে কল্পতরুর পাশে নতুন ডেরা। স্বচ্ছন্দ ইংরেজিতে, হৃদয়স্পর্শী কাহিনী শুনিয়েছেন অভিজিৎ। তাঁর ভাষাতেই বলি— এভাবেই এগোয় (তাঁর উপন্যাসের নাম)। যাদবপুরের বা সেই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত শহিদদের যে তালিকা তিনি যুক্ত করছেন, তা প্রায় সম্পূর্ণ। বোঝা যায়, কারা, কীসের তাগিদে এই আন্দোলনে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন। তিমিরবরণ সিংহ-র সঙ্গে অভিজিৎবাবুর কথোপোকথন এই বইকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে।

যাঁরা নকশালবাড়ি এবং তৎপরবর্তী ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করছেন (মূলস্রোতের গবেষণার ধারায় ইতিমধ্যে বাংলা- ইংরেজি-ফরাসী ভাষায় খান কুড়ি বই প্রকাশিত হয়ে গেছে) এতদিন তাঁদের সম্বল ছিলো প্রায় দুষ্প্রাপ্য পত্রপত্রিকা (অধিকাংশই রয়েছে ব্যক্তিগত সংগ্রহে, সযত্নে এবং অবশ্যই অযত্নে), দলিল-দস্তাবেজ (এদের অবস্থা আরও করুন, সাল-তারিখহীন, প্রকাশস্থানহীন, বহুক্ষেত্রেই হাতে লেখা কপি) এবং পুলিশের লোকেদের একপেশে স্মৃতিচারণ। আলোচ্য বইগুলি আকরগ্রন্থ হিসেবে গবেষকদের পাশাপাশি সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মীদেরও মানসিক চাহিদা পূরণ করবে। এই সমস্ত অপ্রকাশিত কাহিনী, তাদের কুশীলব, তাদের বীরত্বগাথা এবং মানসিকতা-সম্পৃক্ত জীবনচর্চা আগোচরে থাকলে ইতিহাস রচনা, তার গতিশীলতা অনুধাবনে একদেশদর্শিতা এবং অপূর্ণতার সম্ভাবনা থেকে যেতো। পরিণত বয়েসে, মোহমুক্ত পশ্চাৎদৃষ্টি মেলে নেতা থেকে পদাতিক, প্রত্যেকেই রূঢ় বাস্তবকে সঠিক প্রেক্ষিতে উপস্থাপনা করে তাকে মোকাবিলা করেছেন। আন্দোলন এবং সমাজ বিপ্লবের ক্ষেত্রে এর চেয়ে আশাপ্রদ ঘটনা কী-ই বা হতে পারে।

১। Naxalbari : Before & After, Reminiscences and Appraisal; Suniti Kumar Ghosh, New Age Publishers (P) Ltd., 2009.

২। সাতচল্লিশ থেকে সত্তর এবং আগে পরে— তিনখণ্ড, পুনশ্চ ডিসেম্বর ২০১০

৩। The First Naxal– Bappditya Pal, Sage, 2014.

৪। Foot Prints of Foot Soldiers– Abhijit Das, Setu Prakasani, 2015.

যুদ্ধ, ধনতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ এবং আজকের পৃথিবী

৭৬ পৃষ্ঠার পর

প্রলাপ বলে আর উড়িয়ে দেওয়া যায় না।'' হিটলার সুদেতনল্যান্ড দখল করার সময় প্রায় একইরকম বিবৃতি দিয়ে যুদ্ধের প্ররোচনা দেওয়ার কাজ শুরু করেছিল।

আমরা যদি ১৯৩৮ সালে ফিরে গিয়ে ইথিওপিয়া এবং স্পেনের কথা ভাবি এবং ২০১৪ সালে প্রত্যাবর্তন করে যদি ইরাক এবং সিরিয়ার ঘটনার দিকে তাকাই— তবে আমাদের একথা ভাবলে আতঙ্ক হয় যে, যেভাবে ইথিওপিয়ার বিরুদ্ধে ইতালির আক্রমণ এবং রিপাবলিকের বিরুদ্ধে ফ্রাঙ্কোর যুদ্ধ— স্থানীয় সংঘাত বিশ্বযুদ্ধে পর্যবসিত হয়— ইরাক আর সিরিয়ার স্থানীয় সংঘাত হয়ত বা বিধ্বংসী বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে দেবে। এখন বিশ্বের সাত-আটটি দেশ পরমাণু শক্তিধর—ফলে দ্রুত বিজয় নিশ্চিত করায় পরমাণু বোমার যথেচ্ছ ব্যবহারের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিবদমান ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি রাজনৈতিক সোভিয়েত রাশিয়ার উত্থান দেখে সাময়িকভাবে থমকে গিয়েছিল, কিন্তু রোজা এবং লিবনেখ্‌ট জার্মানীতে বিপ্লব সংঘটিত করতে ব্যর্থ হয়ে শহিদ হলে ধনতান্ত্রিক দুনিয়াকে আবার আগ্রাসী হয়ে ওঠার প্রেরণা জোগায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সমগ্র পূর্ব ইউরোপে পালাবদল ঘটে—বিপ্লবের ঢেউ আছড়ে পড়ে এশিয়াতে। লোকসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ দেশ চীন বিশ্ব ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার শেকল ছিঁড়ে মাথা তোলে। কিন্তু তারপর শুরু হয় সমাজতান্ত্রিক শিবিরে ভাঙন আর অনৈক্যের বাতাবরণ। ইন্দোনেশিয়ায় ঘটে বৃহৎ আকারে কমিউনিস্ট নিধন। ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন দেশ নাস্তানাবুদ হওয়ায় মার্কিন দেশ সহ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মান্যতা ধুলোয় মিশে যায়। সোভিয়েতের পতনের পর অবস্থা আপাতত ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার অনুকূলে। কিন্তু ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব— অতি উৎপাদন এবং ভোক্তার অভাব, ফলত মুনাফার ক্রমহ্রাসমান হার— এই নিয়তি ধনতন্ত্রের গলায় ফাঁস হয়ে চেপে বসছে ক্রমশ। কেইনস বা সমতুল্য দাওয়াই তামাদি হয়ে গেছে— প্রত্যক্ষ সামরিক হস্তক্ষেপ আর আগের মতো ফলদায়ী নয়। ওয়াল স্ট্রিট দখলের ডাক উঠেছে স্বয়ং সদর দপ্তরে, বিক্ষোভের প্রচণ্ডতায় শাহবাগ থেকে তাহিরির স্কোয়ার কম্পমান, তৃতীয় বিশ্বের অরণ্যে অরণ্যে গেরিলাদের পদধ্বনি। পিকেটি থেকে জর্জ সোরেশ থেকে স্টিগলিট্জ— ধনতন্ত্রের অসাম্য নিয়ে সরব। সাবেক পূর্ব-জার্মানির কাজ হারানো শ্রমিক আর প্রাগের রাস্তায় দিন-মজুরিতে কর্মরত তরুণী স্মৃতিচারণা করছেন ফেলে আসা দিনগুলির। হয় সমাজবিপ্লব যুদ্ধকে প্রতিহত করবে— নয় যুদ্ধ নতুন সমাজ বিপ্লবের জন্ম দেবে। ''দামামা ঐ বাজে/দিন বদলের পালা এলো ঝড়ো যুগের মাঝে।''